আঁধার রাতের বন্দিনী

৫

আমীরুল ইসলাম

আঁধার রাতের বন্দিনী-৫

রচনা
আমীরুল ইসলাম

সম্পাদনা
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

প্রকাশনায়
এনায়েত প্রকাশনী
০১৯১৩-৬৮০০১০
০১৯৫১-১৯৩৬১০

প্রথম প্রকাশ ❑ জানুয়ারী-২০০৭ ইং

আঁধার রাতের বন্দিনী-৫

রচনা ❑ আমীরুল ইসলাম

সম্পাদনা ❑ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

প্রকাশক ❑ মাওলানা এনায়েত উল্লাহ

মূল্য ২[illegible]া

TK250.00

উ প হা র

শ্রদ্ধেয়/স্নেহের...

....

....

....কে

আঁধার রাতের বন্দিনী

বইখানা উপহার দিলাম

উপহার দাতা

....

....

....

তাং...

প্রকাশকের কথা

হে মহান রাব্বুল আলামীন! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্য। কেননা,তুমি ছাড়া প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত আর কেউ নেই। অফুরন্ত দরুদ ও সালাম সে নবীর কদম মোবারকে, যিনি সায়্যেদুল মুরসালীন ও খাতামুননাবিয়্যিন এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন। আর তোমার রহমত প্রস্রবণ উছলে প্রবাহিত হোক সেই রাসুল (সাঃ) এর সমস্ত উম্মতের মাথার উপর দিয়ে।

সংস্কৃতিক আগ্রাসনমুক্ত রুচিশীল সাহিত্য সভ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মার খোরাক যোগায়।

যে কোন একজন পর্যটক সাহিত্যের সিড়ি বেয়ে তার পর্যটনকে অন্যের সামনে সাজিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। সুন্দর পৃথিবী অপরূপ প্রকৃতির এই দৃশ্যাবলীর বর্ণনা সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সৃজনশীল লেখকের পক্ষে কখনো অসম্ভবের কিছুই নয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সাম্প্রতিককালের কিছু সংখ্যাক স্বার্থপর কলমবাজ অপসংস্কৃতির ছোঁয়ায় আপন সত্তাকে ভুলে গিয়ে অশ্লীল নাট্য গ্রন্থ, কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ও অনৈতিক গল্প রচনা করে সমাজকে কলুষিত করে ফেলেছে। যুব সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে অশ্লীলতার গহীন অরণ্যে।

সুতরাং পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি ও অশালীনতায় ছেয়ে যাওয়া এই কলুষিত সমাজকে,ইসলামি ভাবধারাসম্পন্ন গল্প-কাহিনী,উপন্যাস ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের একটি স্বপ্ন। এই স্বপ্ন পূরণে আমাদেরকে সহযোগিতা করলেন উপন্যাস জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঔপন্যাসিক জনাব আমীরুল ইসলাম সাহেব। তিনি রচনা করেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী সামাজিক উপন্যাস। দ্বীনপ্রিয় এই লেখকের হৃদয় ভেদ করে বের হয়ে এসেছে শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়া অপসংস্কৃতির দাবানলের কাব্যগুলি। আর সেই দাবানল ইসলামের শ্বাশ্বত সুন্দর আদর্শ দিয়ে নির্বাপিত করেছেন লেখক তাঁর "আধাঁর রাতের বন্দিরী" নামের বইটিতে।

অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় কালচার অবসান হয়ে ইসলামের সোনালী আদর্শের নব জাগরণ, নব উত্থান যাদের লালিত স্বপ্ন, আঁধার রাতের বন্দিনী বইটি সেই সব পাঠক পাঠিকাদের হৃদয়ের খোরাক হবে, ইনশাআল্লাহ। বইটি বের করতে দেরী হয়ে গেল। হয়ত অনেকেই বইটি পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন যে কখন পাব আমার সেই কাংখিত কপিখানা। যা দিয়ে আমার হৃদয়ের পিপাসা নিবারন করব। অপেক্ষা জিনিসটা আসলেই কষ্টসাধ্য। সেজন্য আমিও আপনাদের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করি। কিন্তু পাঠকগন ! আমি মনে করি, অপেক্ষার চেয়ে বিদায়ের বার্তা আরও অধিক দুঃখজনক। তাই আশা করি, বইটি পাঠ করে কেমন লাগল তা অবগত করবেন এবং আপনার অভিমত তুলে ধরা হবে পূর্বের সংস্করণে। অনেক পাঠক-পাঠিকা তাদের অভিমত আমাদের কাছে পাঠিয়েছন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা তা প্রকাশ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। আপনাদের অভিমত সুন্দরভাবে স্পষ্ট ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

পাঠকদের কাছে দেরীতে হলেও বইটি পৌছে দিতে পেরে আল্লাহু তাআলার কাছে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। যথেষ্ট চেষ্টা করেছি ত্রুটিমুক্ত করার। তবুও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক।

পাঠকদের চোখে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবগত করুন, আমরা পুনঃমুদ্রণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

বিনিত
আজিজুল হক
পরিচালক, নাঈমা প্রকাশনী

আরজ গুজার

প্রিয় পাঠক পাঠিকা –

মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে অধমের লাখ কোটি শোকরিয়া এজন্য যে, আঁধার রাতের বন্দিনী পঞ্চম খন্ড(শেষ খন্ড) বিলম্বে হলেও পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। বিলম্ব হওয়ার কারনে অনেকেই অধৈর্য ও অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আশা করি অনিচ্ছাবশত বিলম্বের কারণে লেখক ও প্রকাশককে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড় না করিয়ে ক্ষমার সুন্দর নজরে দেখবেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা–

বইটি প্রকাশ করতে বিলম্ব হওয়ার পিছনে যে কারণগুলো ছিল, তার মধ্যে প্রধান হল আমার বন্দি জীবন। সরকার আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী করে দীর্ঘ আড়াই বৎসর নিষ্ঠুর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রেখেছিল। তা ছাড়া ছিল আর্থিক অচলবস্থা। এসব কারনেই বিলম্ব হয়েছে। তাই আবারও জানাই ক্ষমার আবেদন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা–

আমি জানি আপনারা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। এ ভালবাসার ঋণ কোন দিন কোন কিছু দ্বারা পরিশোধ করা যায় না। ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করা যায় শুধু ভালবাসা দ্বারা। ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ আপনাদের খেদমতে দুটি জিনিস আরজ করব। আর তা হল আমার লিখা অন্যান্য বইগুলো মন দিয়ে পাঠ করবেন। তবে বন্দি অবস্থায় মুসলিম পাঠক-পাঠিকাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবির উদ্দেশ্যে কোরআন ও হাদিসের আলোকে জিয়াউস সালেকিন (পথিকের আলো) নামক একটি কিতাব রচনা করেছি। এই বইটি পড়ে আমল করার জ বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আল্লাহ সবাইকে তাঁর খাটি গোলাম হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

=ঃ বিনিত ঃ=
লেখক।
তাং ৩১/১২/০৭ইং

এক

কপ্টার মন্থরগতিতে সাথীদের নিয়ে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলল। বিকাল ৪টায় কপ্টারটি উক্ত টিলার উপর অবতরণ করল। তা দেখে সকলের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমাকে যদিও জালেম বলসেবিক হায়েনারা কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে শৃংখলাবদ্ধ করে রেখেছে, কিন্তু তারা আমার চঞ্চল হৃদয়কে আটকাতে পারেনি। আমার মন আমাকে ফাঁকি দিয়ে তড়িৎবেগে ছুটে বেড়ায় মারবানিয়া, মারদানিয়া, মারবেলিয়া ও মাদাসিকো পাহাড়-পর্বতে। ঘুরে বেড়ায় গিরিকন্দরে আর মিশে যায় মরুভূমির মরিচিকায়। ছুটে বেড়ায় কঙ্করময় প্রান্তরে আর ঝোপ-ঝাড় ও গভীর অরণ্যে। আমার মন পাগলা ঘোড়ার মত হারিয়ে যায় মরুর দিগন্তে। আমার উদ্যাম চঞ্চল হৃদয় আশার তরী নিয়ে উজান বেয়ে চলে যায় নদীর বাঁকে-বাঁকে। কখনো ঘূর্ণিঝড় সেজে উলট-পালট করে দেয় এ সুন্দর বসুন্ধরা। আবার সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস আর হারিকেন সেজে তাওহিদি শক্তি নিয়ে আঘাত হানে জালিমের কেল্লায়। কখনো মহা সমুদ্রে ঝাপটে ধরে ঢেউ এর জুটি হারিয়ে যায় নিরুদ্দেশে। কখনো হয় খালিদের শাণিত উদ্যত অসি। কেটে সাফ করে দেয় দুনিয়ার বুক থেকে কাফির নামক আগাছা। আবার ক্লাশিনকভ সেজে ব্রাশফায়ারে রঞ্জিত করে দেয় জালিমের জনপদ। কখনো সালাহউদ্দীন আইয়ুবী সেজে হানা দেয় কর্ডোভার নাসারাদের প্রাণকেন্দ্রে। আবার সুলতান মহমুদ গজনবী সেজে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে খান-খান করে যায় ভারতের মন্দিরে মন্দিরে। আবার ছোটাছুটি করে জিহাদের খুনরাঙা পিচ্ছিল ময়দানে। আমি জিন্দানখানায় শৃংখলাবদ্ধ; কিন্তু আমার মন মুক্ত, স্বাধীন, বাধা-বন্ধনহীন।

আমি ভারক্রান্ত হৃদয়ে আমার সেলের করিডোরে বসা। এমন সময় মিস জমিলিনা ব্রন্স ও তার বান্ধবী কেনিডলী এসে আমার পার্শ্বে দাঁড়াল। আমি পদধ্বনি শুনেছি ঠিকই, কিন্তু ছিলাম অন্যমনস্ক। দৃষ্টি ছিল অদূরে

বাদাম গাছের মগডালে। শুনছিলাম কয়েকটি পাখীর কলকাকলী। পিছন থেকে কে যেন আমার দুটি চোখ চেপে ধরল। আমার সাথে এমন হেয়ালী করবে এমন সাহস কার ? এতদিন জেলখানায় কাটালাম, কিন্তু এমন তো হয়নি! তাহলে কে ? আমি শান্তমনে বসে বসে ভাবছি, কিন্তু কোন সুরাহা করতে পারিনি। আমি আস্তে করে বাম হাতটি উঁচিয়ে চিমটি কেটে বসলাম তার হাতে। উহঃ করে হাত ছেড়ে দিয়ে এক অভিনব ভঙ্গিতে দাঁড়াল আমার সামনে। ওকে দেখার সাথে সাথেই আমার সর্বাঙ্গে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। রাগে হাত-পা কাঁপছিল। চোখ দুটি হল রক্তবর্ণ। ভাবছিলাম, বাম হাতটি ব্যবহার করব তার গন্ডদ্বয়ে। কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তে গোস্বাকে হজম করে নিয়ে শুকনো ঠোঁটে কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে জিজ্ঞাসা করলাম, আপা? কখন এসেছেন, কেমন আছেন ?

ঃ এইমাত্র এসেছি। আর ভাল না থাকলে কি আসা হত ?

ঃ তা ঠিক। কেনিডলী আপা ! আপনি কেমন আছেন?

ঃ আল্লাহ আমাকে অনেক ভাল রেখেছেন। কিন্তু--- ।

ঃ কিন্তু আবার কি ?

ঃ কিন্তু মানে. সে দিন থেকে--- ।

ঃ এত ইশারায় কথা বললে বুঝব কি করে আপা ?

ঃ জিহাদ ছাড়া বুঝি অন্য আর কিছু বোঝেন না ?

ঃ ডানাকাটার আবার জিহাদ ?

উভয়ের চোখ থেকে মুক্তার দানার মত কয়েক ফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে নিচে নেমে এল এবং ওদের অন্তর দলিত-মথিত করে বেরিয়ে এল ভূবন জ্বালানো এক দীর্ঘশ্বাস। আমি বললাম, বোন, এ মায়াভরা চাহনি আর দীর্ঘশ্বাস বড়ই পীড়াদায়ক ও বেদনায় ভরা।(অহী হুতাহে জু---মনজুরে খোদা হে। আল্লাহর অভিপ্রায় যা, তা-ই হয়)। দুঃখ করে লাভ নেই। আমি আবার বললাম, আমার প্রশ্নের তো কোন মীমাংসা এখনো হয়নি। কথা চলে গেল অন্যদিকে। কি বলতে চাচ্ছিলেন তাই বলুন।

ঃ কিন্তু মানে, সেদিন থেকে, যে কথাটি বলছিলাম, তার অর্থ হল, আপনার সাথে সাক্ষাতের পর থেকে নিয়ে ক্ষণিকের তরেও আপনাকে ভুলতে পারিনি। আরো যদি বেশি বেশি সময় আপনার সাথে দিতে পারতাম, তা হলে ইসলামের খুঁটিনাটি অনেক বিষয় জানতে পারতাম। এখন আপনি আমাদের মুসলিম ভাই। আমরাও আপনার দ্বীনি বোন।

আমাদেরকে অবজ্ঞা করে তাড়িয়ে দিলে আমরা কোথায় দ্বীন শিখব ? তাই সেদিন থেকে নানা চিন্তা এসে দিলে বাসা বেঁধেছে। অনেক ঝামেলার মধ্য দিয়ে আবার এসেছি দ্বীনি কথাবার্তা শোনার জন্য এবং আপনার সাথে একটি বিষয়ে আলাপ করার জন্য। শুনবেন কি না বলুন ?

ঃ অবশ্যই শুনব। এত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, না শুনলে কি আর হয় ? বলুন কি বলতে চাচ্ছেন ?

ঃ আমার কথাগুলো জামিলিনা আপার কণ্ঠে শুনলে ভাল হয়। বলুন আপা, আপনি বলুন।

ঃ আমার কথা বলার আগে আবদুল্লাহ (খোবায়েব) ভাই এর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি বেয়াদবীর জন্য। এখনো আমা হতে ছেলেমি আর হেয়ালীভাব দূর হয়নি। আবদুল্লাহ ভাইকে অনেক আপন করে জানি। এতটুকু ফ্রি থাকার কারণেই অমন করে চোখ চেপে ধরেছিলাম। আমার মনে হয়, আমি ছাড়া অন্য কেউ হলে ৩২ টি দাঁত আপনার চপেটাঘাতে পদচুম্বন করত। ভাগ্যিস বেঁচে গেলাম।

ঃ এ ধরনের শয়তানী ইসলাম সমর্থন করে না। আমরা যে একসাথে বসে আলাপ-আলোচনা করি, তাও সম্পূর্ণ হারাম। আপনারা হলেন সুন্দরী যুবতী আর আমি একজন ডানাকাটা যুবক। মনকে পবিত্র রাখতেও অনেক সময় কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এখন থেকে আমরা সবাই ইসলামের অনুশাসন মেনে চলব। আশা করি এতে আপনাদের কোন আপত্তি থাকবে না।

ঃ আমাদেরকে আপনার মর্জির খেলাফ পাবেন না। আজকের অপরাধ ক্ষমাসুন্দর নজরে দেখবেন। আর কোনদিন এমন হবে না।

ঃ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। আল্লাহও ক্ষমা করে দিন। বলুন আপা, কি সংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছেন।

ঃ হ্যাঁ, খবর আছে সুন্দর খবর, মজার খবর।

ঃ কি খবর আপা ?

ঃ মুজাহিদদেরকে আমরা জ্বালানি দিয়ে সাহায্য করি।

ঃ ওরা কি শামাদান হাতে আপনাদের নিকট দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চায় যে, আমাদের এক কুপী তেল দাও ?

ঃ আরে না, না। ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক। আমাদের সকল নেতা-কর্মী ও ডিফেন্সের মুখ থুবড়ে গেছে এবং মাথায় হাত দিয়ে বসে গেছে।

ঃ সে আবার কেমন কথা ?

ঃ আরে সে দিন হেডকোয়ার্টারে আমাদের বন্দি পাইলট থেকে ওয়ারলেছ আসল, আমরা সব সাথীসহ মুজাহিদদের উপর হামলা করে কপ্টারসহ ফিরে আসছি। আমরা এখন কিরগিজিয়ামের আকাশে আছি। জ্বালানী শেষ হয়ে গেছে। এক্ষুনি জ্বালানী না নিতে পারলে কপ্টারসহ সব যাত্রী ধ্বংস হয়ে যাবে। এসংবাদ পেয়ে হেডকোয়ার্টার থেকে কিরগি জিয়াকে তেল দেয়ার জন্য অনুরোধ করলে ১২ হাজার গ্যালন তেল দিয়ে দেয়।

এদিকে সাফল্যের ঢেউ মস্কোর সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সব গুলো খবরমাধ্যম এসংবাদ খুব ঢালাওভাবে সম্প্রচার করছিল। বিশেষ বুলেটিনে এনে মস্কোর বেতার বারবার প্রকাশ করছিল। বি, বি,সি, সি, এন, এন, ও ভয়েস অব আমেরিকাও সংবাদটি প্রচার করছিল। এদিকে তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য কমিউনিষ্ট নেতাকর্মীরা বিমানবন্দরে এসে অভ্যর্থনার জন্য ভীড় জমাচ্ছিল। আর্মী হেডকোয়ার্টার সাজানো হয় নতুন সাজে। সবাই অপলক নেত্রে তাকিয়ে ছিল কিরগিজিয়ারা আকাশপানে। দীর্ঘ ছয় ঘন্টা অপেক্ষা করার পর জানা গেল, মুজাহিদরা তেল বোঝাই করে কপ্টারটি তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গেছে। সংবাদিকরা ৬ ঘন্টা অপেক্ষা করে চলে গেছে। পর দিন সংবাদ এল, হেডকোয়ার্টারের মিথ্যা সংবাদে জনগণ হতাশ। আরো কত সব কিছু লিখেছে। এহল সে সুসংবাদটি। উক্ত সংবাদটি শুনে আমি মনে-মনে খুব হাসলাম এবং আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। তার পর আবার প্রশ্ন করলাম, আপা, আপনি সত্যিই একটা সুন্দর সংবাদ শোনালেন, এমন আর কোন সুন্দর খবর আছে কি ?

ঃ আরো মজার একটি বার্তা আছে। তা হল, মিস কেনিডলী মুজাহিদদেরকে কিছু অনুদান দিতে চাচ্ছে। বড় অংকের অনুদান। তাছাড়া তার ৫ তলা ভবনের যে কোন একটি তলা ছেড়ে দিতে চাচ্ছে জেহাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। যারা হোটেলে বসবাস করবে,তাদের খানাপিনা হোটেল থেকেই দেয়া হবে। এসব বিষয় নিয়ে আপনার মতামত জানালে কেনিডলী খুব খুশী হবে।

ওর কথা শুনে আমি বললাম, আপনাদের ইচ্ছা কবুল হোক। আমি আপনাদের এই মুবারক ইচ্ছাকে অকৃত্রিম অভিনন্দন জানাই। তবে একটি

কথা খুব ভালভাবে জেনে রাখুন, এটা যদি হয় ফাঁদে ফেলানোর জন্য কোন কৌশল বা প্রহসন, তা হলে এর জন্য আপনাদের দিতে হবে চরম খেসারত। তা শুধু মুজাহিদদের পক্ষ থেকে হবে এমনটি ভাবা ঠিক হবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব পাবেন এর চেয়ে বহুগুণ বেশী। শুধু দুনিয়াতেই নয়-আখেরাতেও।

তাছাড়া আরো যেসব অসুবিধা আছে, আগেই ভালভাবে খতিয়ে দেখার দাবী রাখে। প্রথম অসুবিধা হল, আমি যতদিন জেলখানায় থাকব, ততদিন এ অর্থ কোন কাজে লাগতে পারব না। কেননা, জগতের সাথে রয়েছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কে কোথায় আছে না আছে তাও জানি না। এ অর্থ কার কাছে দেব এবং কে তার সদ্ব্যবহার করবে, তা জানা নেই। আর দ্বিতীয় সমস্যা হল, আপনারা যে হোটেল গার্ডেনের একটি তলা মুজাহিদদের কার্য পরিচালনার জন্য ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন, তা বেশী দিন গোপন থাকবে না। কারণ, হোটেল গার্ডেন এখন পর্যটন এলাকার রূপ নিয়েছে। এখানে প্রতিদিন থাকে হাজার জনতার ভীড়। দেশী-বিদেশী, সরকারী-বেসরকারী ধনিক, বণিক, চাকরিজীবি ও ব্যবসায়ীক লোকদের আনাগোনা খুব বেশী। কাজেই আপনার হোটেলের প্রতি সরকারের কড়া নজর রয়েছে। আপনি হয়ত জানেন না, আপনার হোটেলের ৩ জন কর্মচারী হচ্ছেন ইন্টেলিজেন্সের কর্মকর্তা। তা ছাড়া হোটেলসংলগ্ন জেনারেল ষ্টোর এর ম্যানেজার একজন গোয়েন্দা। এরা সব সময় নজর রাখছে হোটেলে দৈনিক কতজন লোক উঠে আর কতজন লোক নামে,কে কোন কামরায় থাকে, কে কি করে ইত্যাদি। কাজেই এখানে বসে কার্যক্রম চালানো খুবই বিপজ্জনক।

ঃ এত কিছু আপনি কি করে জানলেন ?

ঃ মস্কোর অলি-গলিতে ও পথে-প্রান্তে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা আমার জানা আছে। আপনার হোটেল গার্ডেনের ৩য় তলায় ২৭ নং কক্ষে আমার ৫ জন লোক ৩ মাস পর্যন্ত ছিলো। সেখানে থেকে তারা কিছু সফল অপারেশনও করেছে।

ঃ তাহলে হোটেল গার্ডেনে যে হত্যাকান্ড হয়েছিল, এরজন্য কি দায়ী আপনারা ?

ঃ তিন বৎসর আগে যে হয়েছিল সেটার কথা জিজ্ঞাসা করছেন ?

ঃ হাঁ, তা-ই তো।

ঃ সেখানে আমি নিজে ছিলাম না ঠিক, তবে আপনার নিকট যে চরম পত্রটি পাঠিয়েছিলাম তা আমারই লেখা। আমি বিশেষ সুত্রে জানতে পারি, আপনার হোটেলে অসামাজিক কার্যকালাপ হয়। মদ,বিয়ার আর নারীর জমজমাট ব্যবসা চলে। তাই আপনাকে নারী দিয়ে ব্যবসা করতে নিষেধ করেছিলাম। তারপ্রতি কর্ণপাত না করায় মুজাহিদরা সে সব দেহব্যবসায়ী নর্তকীদের হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

ঃ জামিলিনা আপা, এই তো হত্যাকান্ডের প্রধান আসমীর খোঁজ পেয়ে গেছি। এখন যদি---------।

ঃ প্রশাসন তো সব কাজ শেষ করে ফেলেনি। এখনো এক হাত আর দুপা অবশিষ্ট রয়েছে। যেটা পছন্দ হয় সেটার উপরই প্রতিশোধ নিতে পারেন। বলুন ডালি আপা কোনটি নেবেন ?

ঃ আমি নিলে শুধু হাত-পা নেব না। সবটুকু নিয়ে যাব, অর্থাৎ পুরো বডিটাই।

ঃ এ ভাঙ্গা চোরা মাল নিয়ে কি করবেন আপা ?

ঃ ঘরে বসিয়ে খাওয়াব আর দ্বীনের কথা-বার্তা শুনব ও শিখব।

ঃ না আপা, এত সব চিন্তা করবেন না। আপনারা ইসলাম কবুল করেছেন, সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, শান্তির সমীরণ গায়ে লাগছে। এটা যদি আপনাদের সরকার জানতে পারে এবং আমার সাথে দেখা সাক্ষাত করেন এর খবর যদি পায়, তাহলে আপনার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে আর আপনাকেও পৌছিয়ে দিবে আলমে বরযখে অথবা আমার সাথে। আপনার চিন্তা-ফিকির যদি যথার্যথভাবে কাজে লাগাতে চান, তাহলে অপেক্ষা করতে হবে আমার মুক্তি পর্যন্ত। আল্লাহ যদি আমাকে কোন দিন মুক্তি দান করেন, তাহলে আপনার স্বপ্ন বাস্তব হয়ে দেখা দিবে। যদি মুক্তি লাভ করি, তাহলে আমার প্রতিনিধি আপনাদের সাথে সাক্ষাত করবে। আমাকে পেতে বিলম্ব হবে। আর এখন থেকে আপনারা আমার এখানে যাতায়াত খুব কম করবেন, যেন কেউ কোন সন্দেহ করতে না পারে। আমার কথা শুনে উভয়ে খুব খুশি হয়ে চলে গেল।

দুই

মাওলান আঃ সাত্তার বলখী সমস্ত মুজাহিদদের নিয়ে এক পরামর্শ সভায় বসলেন। আলোচনার বিষয় ছিল নতুন হামলা, স্থান পরিবর্তন ও হেলিকপ্টার ব্যবহার প্রসংগে। তিনি নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে নির্দেশ দিলেন।

কমান্ডার আলায়েভ বললেন,"আমি মারবানিয়া, মারদারিয়া, মারবেনিয়া ও মাদাসিকো পর্বতমালা পরিভ্রমণ করেছি। এর মধ্যে এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আমার নজরে পড়েনি। আর একটি বড় সমস্যা হল বন মানুষ এবং জিনদের উপদ্রব। জিনদের নিকট আমি ওয়াদা করে এসেছি সেদিকে আমরা আর যাব না। আর আমিও চাই না আমাদের দ্বারা কারো ক্ষতি হোক। মাওলানা কমান্ডারের কথা শুনে বললেন, তা হলে সে সব এলাকা আমরাও ঘুরে ঘুরে আল্লাহর আশ্চর্য্য সৃষ্টি দেখব। আর বনমানুষের কথা অনেক রূপকথায় শুনেছি, কিন্তু কোন দিন দেখার নওবত হয়নি। আল্লাহ চাহেণত এবার দেখা যাবে। আচ্ছ,া বলুন তো এদের সম্পর্কে কিছু কথা।

আলায়েভ ঃ হুজুর! প্রকৃতপক্ষে এরা মানুষ নয়। এরাও একটা চতুষ্পদ জন্তু। এদের গায়ে শক্তি রয়েছে প্রচুর। দেখতে মানুষের মত। তবে পুরাটা না। কিছু কিছু দিক গিয়ে বানরের সাথে মিলে। লম্বা লম্বা পশমে শরীর ঢাকা। বেশির ভাগ চলে চার পায়ে, তবে দুপায়েও চলতে পারে কম না। জীবন ধারনের বুদ্ধি রাখে প্রচুর। এদের প্রিয় খাদ্য গোশত। অন্য প্রাণী শিকার করে খায় ওরা। দুর্বল বুড়া-বুড়ি গর্তেই থাকে বেশী সময়। এরা বার্ধক্যজনিত কারণে শিকার ধরতে পারে না। যুবকরা শিকার নিয়ে এসে তাদেরকে খাওয়ায়। বুড়া-বুড়িরা নাতি-নাতকর নিয়ে আনন্দ-ফুর্তি করে। ফলমুল, কচি পাতা ও মাছ খায়। গোশতু পেলে খুব খুশি হয়। অন্য সব প্রাণীরা এদেরকে খুব ভয় পায়। এরা দলবদ্ধ হয়ে খুব

অভিনব কায়দায় শিকার ধরে। এরা হিংস্র প্রাণী বটে, তবে ইতর প্রাণী নয়। এদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে অন্যরা তাদের সেবা করে এবং ঔষধ খাওয়ায়। এরা রোগ প্রতিরোধ বা প্রতিষেধক অনেক গাছান্ত ঔষধ জানে। এদের মধ্যে ইছার, হামর্দদী, ও ভালবাসা খুঁজে পাওয়া যায়। এহল বনমানুষ নামক খ্যাত প্রাণীটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কমান্ডারের কথা শুনে পাইলট সুরাসিকোসহ অন্যরাও এপ্রাণীদের দেখার জন্য উক্ত এলাকায় সফর করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সত্যি সত্যিই একদিন গোলা-বারুদ সঙ্গে নিয়ে ৬ সদস্যের একটি দল মাওলানার নেতৃত্বে অরণ্যভ্রমণে বের হলেন। রাহবর হিসাবে ছিলেন কমান্ডার আলয়েভ আর বাহন ছিল ৬ টি দ্রুতগামী অশ্ব। কাফেলা চড়াই-উৎড়াই টেক-টিলা, উচু-নীচু পেরিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চললো। যেতে যেতে দুপুর ১ টায় সে এলাকায় গিয়ে পৌছলেন। দেখলেন মানুষরূপী বনোদের কান্ড। আলায়েভ সবাইকে পূর্ব থেকে সতর্ক না করলে হয়ত প্রস্তরাঘাতে অনেকেই প্রাণ হারাত। এত বড় বড় পাথর ওরা নিক্ষেপ করে যা কয়েকজনের পক্ষেও ছোড়া সম্ভব নয়। সাথীরা নিজেদেরকে বড় বড় বৃক্ষের আড়ালে রেখে তাদের কান্ড অবলোকন করছিলেন।

অতঃপর সেখান থেকে অতিকষ্টে চলে গেলেন দৈত্য-দানবের এলাকায়। তখন সন্ধ্যার আর বেশী বাকি নেই। কাফেলা অদুরে অশ্বগুলো রেখে পদব্রজে একটু পায়চারি করছিলেন। মাগরিবের সময় হলে মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী, হেকিম নূরউদ্দীনকে আজান দিতে বললেন। হেকিম নূর উদ্দীন সুমধুর সুরে বুলন্দ আওয়াজে আজান দিলেন। সবাই নামজে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছু অপরিচিত মুসল্লী এসে পশ্চাতে দাড়াল। নামাজ শেষে ইমাম সাহেব অজিফা আদায় করে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। পিছনে অপরিচিত মুসল্লী দেখে বিস্মিত হলেন। এ অরণ্যে এসব লোক কোত্থেকে এল তা চিন্তা করে পেলেন না। তার পর তিনি নিজেই দাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রিয় মুসল্লী ভায়েরা, হঠাৎ করে আপনারা এবিজন বনে কোত্থেকে এলেন ? যেখানে বাড়ী নেই,ঘর নেই, নেই লোকালয় ও পথঘাট। এখানে আসার কোন কারণও দেখতে পাচ্ছি না অতএব আপনাদের সর্দারের পক্ষ থেকে আমার প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।

এক খুনখুনে বুড় দাঁড়িয়ে বললেন, হে আবু জাফর ! (মাওলানর কুনিয়ত)আমরা এ এলাকারই বাসিন্দা। আমরা থাকি লোকালয়ের বাইরে

এবং লোকচক্ষুর আড়ালে। আমরা আপনাদের স্বজাতি নই। আল্লাহ এবাদতের জন্য যে দুটি জাতিকে তৈরী করেছেন, আমরা তার একটি।

মাওলানা ঃ তাহলে কি আপনারা জিন ?

ঃ হ্যাঁ, আমরা জিন। আমরা যুগ যুগ ধরে এখানেই বসবাস করি। আমাদের উত্তরসূরিরাও এখানেই ছিলেন।

মাওলানা ঃ আপনাদের মধ্যে কোন আলেম থাকলে এখানে আসুন। তাঁর সাথে আমি দুটো কথা বলব। মাওলানার কথা শুনে উক্ত বুড়ো লোকটিই এগিয়ে এলেন এবং বললেন, হুজুর ! আমার স্বজাতি আমাকেই আলেম হিসাবে সম্মান করে থাকে।

ঃ আপনি দ্বীনি এলেম কোথায় শিক্ষা লাভ করেছেন ?

ঃ দামেস্কে।

ঃ উস্তাদদের মধ্যে কে ছিলেন ?

ঃ আমার উস্তাদ ছিলেন তাবে তাবেঈনদের মধ্যে হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম সাধক পুরুষ হযরত জায়েদ বিন আঃ মালেক উমায়দী।

ঃ আহঃ আপনি তো আমাদের সকলেরই মুরুব্বী ! আমরা আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ ! দ্বীনের ব্যাপারে আপনার নিকট সাহায্যপ্রার্থী। বলুন, আমাদেরকে কিরূপ সাহায্য করতে পারেন।

ঃ হুজুর ! সত্য কথা বলতে কি আমাদের রগ-রেশায়, রক্তের কনায় কনায় রয়েছে অবাধ্যতা ছেরকাশী, ও নাফরমানীর মাদ্দা। আমি বহু বুজুর্গের জুতা সোজা করে আমার অবাধ্য নফসকে কিছুটা আনুগত্যের পোশাক পরিয়েছি। তাকয়ার চাবুক মেরে মানার মাদ্দা পয়দা করেছি। তার পরও কোন কোন সময় অবাধ্য ঘোড়ার মত এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে চায়, কিন্তু পারে না। হুজুর, আমরা মানুষের সাথে চলাফেরা করি মানুষের রূপধরে। আমরা যখন যে রূপ ধরি, তখন সে প্রাণীর শক্তিই আমাদের গায়ে থাকে। যেমন মানুষের রুপ ধরলে মানুষের শক্তি,বাঘের রূপ ধরলে বাঘের শক্তি আর হাতির রূপ ধরলে হাতির শক্তি। আপনি যদি বলেন, মানুষের রূপ ধারণ করে আপনাদের সাথে মিশে বলসেবিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তা আমি পারব না। কারণ, আমাদের মধ্যে অবাধ্য জিনের সংখ্যা অনেক বেশী। ওরা আমাকে একাজ করতে দিবে না। অতএব আমি অক্ষম।

ঃ যদি তা সম্ভব না হয়, তবে আপনাদের এলাকায় কিছুদিন থাকতে চাই। এটাও হবে অনেক বড় উপকার।

ঃ হুজুর ! কয়েক দিন আগেও কজন মুজাহিদ এসেছিল। তাদের আগমনে এ উপত্যকার সমস্ত জিন ক্ষেপে গিয়েছিল,দূর থেকে অগ্নিবান নিক্ষেপ করত। ভয়ংকর আকৃতিতে ভয় দেখাচ্ছিল। তার পর আমি সবাইকে ডেকে অনেক বুঝিয়েছি, অত্যাচার বন্ধের জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। তখন সবাই মিলে দাবি জানাল এ এলাকা থেকে চলে যেতে। আমি কিছুতেই তাদেরকে মানাতে পারলাম না। নিরুপায় হয়ে উক্ত মুজাহিদকে এ এলাকা ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি তাঁর দলবলসহ অন্যত্র চলে গেছেন এবং জিনদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেলেন। এসব এলাকা সফর করে ও জিনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সকলেই মার্কাজে ফিরে এলেন।

পাইলট সুরাসিকো মাওলানাকে লক্ষ্য করে বললেন," হুজুর ! আমরা তো চালাকি করে জ্বালানী সংগ্রহ করেছি। বলসেবিক কর্মকর্তাগণ আমাদের চালাকি ধরে ফেলেছে। তেল ফুরিয়ে গেলে আর কোন সুরত নেই তেল সংগ্রহের। তেল বিহনে ৩০ কোটি ডলারের গানশীপ হেলিকপ্টারটি অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকলে মুসলমানদের কোন ফায়দা হবে না। আমি মনে করি, অর্ধেক তেল আপনাদের প্রশিক্ষণে খরচ করে বাকি অর্ধেক আপনারাসহ আফগানিস্তানে চলে যাই। নাদির শাহ মুসলমানদের পরম বন্ধু। তিনি অবশ্যই আমাদেকে আশ্রয় দেবেন। আপনি চিন্তা করে দেখুন তা করা যায় কি না।

মাওলানা বললেন, দেখুন। কপ্টার ছিনতাই এর ঘটনা গোপন থাকবে না। এক সময় না এক সময় প্রকাশ হয়েই যাবে। তাছাড়া রুশীদের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রাডারও ক্ষমা করবে না, ধরা পড়ে যাবে। আমার ভয় হয় সেখানে আশ্রয় নিয়ে একটি মুসলিম দেশের ক্ষতি করাই হবে তার অর্থ। আফগানে চলে গেলে বা সেখানে আশ্রয় পেলে শত বছর পর হলেও রাশিয়া তার বদলা নিতে চাইবে। কাজেই সেখানে আশ্রয় নেয়া আমি সমীচীন মনে করি না। তাছাড়া নাদির শাহের মনোভাব আগের মত নেই। তাঁকে উলটা-পালটা বুঝিয়ে মন বিগড়ে দিয়েছে।

তার যুক্তি কারো নিকট মনঃপুত হল না। সবাই আফগান ফিরে যেতে প্রস্তুত। এখানে শুধু অবস্থানই করা যাবে; কিন্তু কোন হামলা করা

যাবে না। তাই একদিন ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় ছামান কপ্টারে তুলে নিয়ে আফগানের দিকে পাড়ি জমালেন। হায় ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আফগান সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি পৌছুলে এক দ্রুতগামী জঙ্গীবিমান এসে কপ্টারে আঘাত হানে। সাথে সাথে আগুন ধরে যায়। প্যারাসুটের সাহায্যে ৫ জন সাথী নিচে নামতে সক্ষম হয় আর ৮ জন আকাশে শাহাদতবরণ করেন। বেঁচে যাওয়া ৫ জন মুজাহিদ হলেন, মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী, কমান্ডার আলায়েভ, কমান্ডার ফাগুদায়েভ এবং পাইলট সুরাসিকো ও ববিল। এরা সবাই ছিলেন সুস্থ ও অক্ষত। তারা অবতরণ করেন পাহাড়াঞ্চলের একটি বাজারের অদূরে।

তিন

হেলিকপ্টার ধ্বংস করে জঙ্গিবিমানটি দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায়। কেউ সামান্য দেখতে পেয়েছে আর কেউ শুধু শব্দ শুনেছে। আর আকাশে কপ্টারটি জ্বলতে দেখে এলাকার লোকজন ভয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। অনেকেই ভাবছিল, এই বুঝি আমাদের মাথার উপর এসে পতিত হবে। কপ্টারের পিছনের দিকে আঘাত হানার সাথে সাথেই ৫ জন প্যারাসুটের সাহায্যে নিচে নেমে আসে। দুর্ভাগ্যবশত অন্যরা বের হতে পারেনি। বেঁচে-যাওয়া-সাথীরা উসতুনসিনিয়া বাজারের পার্শবর্তী এলাকায় অবতরণ করেন। কে কোথায় নেমেছে তা একে অপরের খবর রাখে না। ৫ জনের মধ্যে দুজন পাইলট। তারা বহুবার আকাশ থেকে নেমে নেমে পরীক্ষা করেছে। আর ৩ জন তো একেবারে আনাড়ী। এরা মহাকাশ থেকে ঝাঁপ দিয়েছে ঠিকই; কিন্তু সাথে সাথেই জ্ঞান লোপ পেয়েছে। সকলের পরনে ছিল সেনাবাহিনীর উর্দী। এলাকার লোকজন দৌড়ে আসে পতিত লোকদের নিকট। পাইলট দুজন যেখানে পতিত হয়েছেন, তার পার্শ্বেই ছিল বলসেবিকদের সীমান্তচৌকি। সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০ জন। এরা এসে

পাইলটদের উঠিয়ে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। বাকি ৩ জনকে এলাকার লোকজন একেক জায়গা থেকে তুলে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় নিয়ে আসে সেনাক্যাম্পে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের জ্ঞান ফিরে আসে।

সেনা ছাউনীর জিম্মাদার হলেন হাবিলদার রিবাগান। হাবিলদার রিবাগানের সাথে পাইলট সুরাসিকোর ছিল পুরনো খাতির। ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। উক্ত ক্যাম্পে আর একজন সৈন্য ছিল নাম আমীর দৌলা। আমীর দৌলার বাড়ী আর মাওলানা আঃ সাত্তার বলখীর বাড়ী ছিল একই গ্রামে। দুজন বাল্যজীবনে একই সাথে লেখাপড়া করেছেন। আমীর দৌলা অনেক আগেই কমিউনিষ্ট ধর্ম (পার্টি) গ্রহণ করেন এবং সেনাবাহিনীতে চাকরী নেন। মাওলানার গোটা পরিবারকে সবাই কট্টর মৌলবাদী হিসাবেই জানত। আমীর দৌলা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার প্রায় দুবছর আগে মাওলানার পিতা ফারুক বলখী ও চাচা রেজা বলখীকে দিবালোকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল। মাওলানা সে সংবাদ পেয়ে মাদ্রাসা থেকে রাতের আঁধারে হিজরত করে আফগানিস্তানে চলে যান। তার পর থেকে কেউ মাওলানার খবর জানত না। আমীর দৌলা মাওলানাকে উর্দীপরিহিত দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আঃ সাত্তার ভাই, আপনাকে সৈনিক বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি ? মাওলানা কি বলবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না। কিন্তু প্রশ্নের সাথে সাথেই পাইলট সুরাসিকো জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ওনাকে চিনেন ?

আমীর দৌলা ঃ হ্যাঁ, চিনব না কেন ? তিনি তো আমাদেরই গ্রামের মানুষ। আমরা এক সাথেই প্রাইমারীতে লেখাপড়া করেছি। তিনি তো এক সময় কট্টর মৌলবাদী ছিলেন।

পাইলট ঃ এখনো কি রুহানী বলেই মনে হয় ?

ঃ না, এখন তো দেখি আমাদের পথের পথিক।

ঃ হ্যা, ঠিকই বলছেন, তিনি এখন মাওলানা নন-তিনি এখন কমরেড। বর্তমানে তিনি একজন পাইলট। ৬ মাসের শিক্ষানবিস ফাইটার বিমান ওড়াতে পারেন তিনি।

আমীর দৌলা ঃ আপনাদের বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ কি ?

পাইলট ঃ আপনারা নিশ্চয় বেতারে শুনেছন আমরা মুজাহিদদের হাতে বন্দি ছিলাম। তার পর সেখান থেকে কপ্টারসহ কয়েকজন মুজাহিদকে বন্দি করে পালিয়ে আসি। আমাদের আসার কথা ছিল দু-এক দিন আগে।

দুঃখের বিষয়, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আসতে বিলম্ব হয়েছে। ওয়ার লেছের ব্যাটারী না থাকায় বার্তা প্রেরণ করতে পারিনি। আমরা কপ্টার আকাশে উড়ালে হয়ত আমাদের পাইলটরা মনে করেছেন যে, মুজাহিদরা কপ্টার ছিনতাই করে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে, তাই ফাইটার বিমান এসে ভুলবশত আমার কপ্টারের পিছন দিক দিয়ে মেরে দিয়েছে। তাই আমাদের এ অবস্থা।

ঃ আহা ঘটনা তো বড়ই মর্মান্তিক। আমাদের কাছে ওয়ারলেস আছে ঠিক, কিন্তু তা দিয়ে মস্কো বার্তা প্রেরণ করা যাবে না। এটা দূরপাল্লার নয়। এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে বার্তা পাঠানো যায়, এর চেয়ে বেশী দূরে যায় না।

ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে আমরা সুস্থ্য হই, বিশ্রাম নিয়ে চাঙ্গা হই, তার পর সবাই মিলে পরামর্শ করে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারব। এতে আপনার অভিমত কি তা জানতে চাই।

ঃ অনেক সুন্দর কথা, তাই হোক।

পাইলটের কথা শুনে মাওলানার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, আল্লাহ আমাদেরকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তা ছাড়া পিতা ও চাচার খুনের বদলা নেয়ারও একটি রাস্তা আবিস্কার হল। তিনি নিজেকে আড়াল করে আমীর দৌলাকে লক্ষ্য করে বললেন "ভাই, আমি আগে কমিউনিজম সম্পর্কে নেহায়েত অজ্ঞ ছিলাম। এখন আমার চোখ খুলে গেছে। এখন কমিউনিজমের ব্যপারে আরো দশজনকে বোঝাতে পারব। মাওলানার কথা শুনে আমীর দৌলা বুঝতে পারলেন যে, মাওলানার চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়েছে। তিনি কমিউনিজমে বিশ্বাসী হয়েছেন। আর যে ঠেলা মৌলবাদী ও রুহানীদের উপর দিয়ে যাচ্ছে, যে ঝড়োহাওয়া মাওলানাদের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তা তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কমিউনিজম না মেনে আর উপায় কি। তাছাড়া পিতা হারাল,চাচা হারাল, বাড়ী ঘর শেষ হল। এখন তো না মানার প্রশ্নই থাকতে পারে না।

হাবিলদার রিবাগান পাইলট সুরাসিকোকে পেয়ে আনন্দে আত্নহারা। প্রাইমারী থেকে নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত এক সাথে ছিলেন তাঁরা। পরবর্তীতে কিছু সময়ের জন্য দুজনের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেলেও তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কর্মজীবনের শুরুতেই আবার দুজনে এক কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিলিত হন। অর্থাৎ উভয়েই সৈনিক। তবে পার্থক্য শুধু

এতটুকু যে, একজন আকাশে বিচরণকারী আর একজন ভূচারী। অর্থাৎ জমিনে বিচরণকারী। দীর্ঘ দিনের মিতালী আজ উভয়ের অন্তরে নতুন করে লুকোচুরি খেলতে লাগল। অতীত জীবনের স্মৃতিরা এসে ভীড় জমাচ্ছিল। আরম্ভ হল পুরনো দিনের ইতিকথার পুনরাবৃত্তি। একজন বলেন আর অন্যরা শোনেন। মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী, আলায়েভ ও ফাগুদায়েভ ছাড়া সকলের কাছেই আনন্দদায়ক লাগছিল। কারণ, তারা গর্বের সাথে কে কতজন নারীর ইজ্জত হরণ করেছিল, নারীরা কি বলে চিৎকার দিচ্ছিল, কে কত জন অবলা নারীর কাপড় খুলে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিল, কে কজনকে জবাই করে ও কুপিয়ে হত্যা করেছিল এর মধ্যে কতজন আলেম ছিল, কতজন ছিল তালেবে এলেম ও সাধারণ মুসল্লী, কে কয়টি কিতাব ও পবিত্র কুরআন শরীফ এবং মসজিদ-মাদ্রাসা জ্বালিয়ে ভস্ম করেছিল। এসব ছিল তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এর মধ্যে মাওলানার পিতা ও চাচাকে কিভাবে শহীদ করেছিল, সে আলোচনাও হচ্ছিল। তাদের কথোপকথনে মাওলানা ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অন্তরে কে যেন বিষমাখা তীর নিক্ষেপ করে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। তাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। পিতা হত্যার প্রতিশোধ নিতে অন্তর অস্থির হয়ে উঠল। কিভাবে প্রতিশোধ নেয়া যায়, সে কৌশল আবিষ্কার করতে গিয়ে চঞ্চল মন আরো চঞ্চল হয়ে উঠল। পাইলট সুরাসিকো দুশমনের সাথে এসব আলাপে অংশ নেয়ার কারণে তার প্রতি মাওলানার অনেকটা আস্থা এসে গেল। মাওলানা ভাবছিলেন পাইলট তার সাথীদের পেয়ে হয়ত ইসলাম ত্যাগ করে আবার দুশমনের চেহারা নিয়ে আমাদের উপর হিংস্র ব্যঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। এসব চিন্তা মাওলানার অন্তর কুঁরে কুঁরে খাচ্ছিল। আসন্ন বিপদাশংকায় তিনজনই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন।

এভাবে কেটে গেল দুদিন। এর মধ্যে ভেগে যাওয়ার অনেক মওকা হাতে আসছিল,কিন্তু পিতার প্রতিশোধ নেয়ার অভিলাষ তাদের ভেগে যাওয়ার সমস্ত ফটক বন্ধ করে দিল। উক্ত ছাউনির সৈন্যরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে এক ঘন্টা সময়ও পাহারা ছাড়া থাকে না। তিনজন করে পাহারা দিচ্ছে সর্বক্ষণ। আর এত কড়া নিরাপত্তার কারণ হল মুজাহিদদের আক্রমণের ভয়। কখন কোন দিক থেকে আক্রমণ আসে,তা বলা যায় না। এজন্যই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সর্বক্ষণ চৌকান্না ও বেদারির সাথে পাহারা

দিচ্ছে। তিনজনে কথা বলে একটু পরামর্শ করারও কোন সুযোগ পাচ্ছিলেন না।

একবার গোসলের সুরতে পর পর ৫ জনই জমায়েত হয়ে গেল নিকটতম লেকে। তাদের গোসলের দৃশ্য সৈন্যরা দূরে দাঁড়িয়ে অবলোকন করছিল। এসুযোগে পাইলট সুরাসিকো অন্য দিকে চেহারা ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে বললেন," ভাই সব ! "কাফিরের বাচ্চাদের কখনো বিশ্বাস করা যায় না। অতএব এখানে আর সময় নষ্ট না করে ভালয় ভালয় কেটে পরা দরকার। মাওলানা জিজ্ঞাসা করলেন, এমনিভাবে কি চলে যাওয়া উচিৎ হবে ? কোন একটি পদক্ষেপ নেয়া দরকার নয় কি ?

ঃ কি পদক্ষেপ নিতে চান আপনি ?

মাওলানা হতচকিত হয়ে জিব্বায় কামড় দিয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, পদক্ষেপ মানে আমরা কখন কিভাবে, কোন দিক দিয়ে কোথায় যাব এ পদক্ষেপের কথা বলছি। মাওলানা ভাবছিলেন, পাইলট কি আবার মনের কথা জেনে মুনাফেকি করে কি না তা কে জানে। এজন্যই তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু সুচতুর পাইলট মাওলানার মনোভাব বুঝতে মোটেই ভুল করেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, হুজুর ! আমি কিন্তু মুসলমান, আমাকে ভয় করবেন না এবং সন্দেহ করবেন না। অন্যথায় দুঃখ পাব। আপনি যে পদক্ষেপের কথা বলতে চাচ্ছিলেন সে পদক্ষেপের কথা বলুন। মাওলানা নীরব।

পাইলট আবার বললেন," আমরা শুধু জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে চাই না। আমি চাই সব কজন দুশমকে হত্যা করে তাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে। ওরা আমাদের সবগুলো অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে। রিক্তহস্তে ভীম আহবে কোন ভূমিকা রাখতে পারব না। তাই এখানের সব অস্ত্র নিয়ে যেতে হবে। এবার মাওলানার চেহারা উজ্জল হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন " তা হলে কিভাবে এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে বলুন।

পাইলট শরীর ধৌত করতে করতে অন্য দিকে চেয়ে আবার ব[illegible] লাগলেন , প্রথম প্রহরে যে তিনজন পাহারায় নিয়োজিত থাকে, তাদেরকে কমান্ডো কায়দায় গলাটিপে হত্যা করে তাদের অস্ত্র আমরা নিয়ে নেব। তারপর বাংকারের অস্ত্রগুলোও আমাদের কব্জায় এনে এদেরকে জাগিয়ে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে চলে যাব। এখানে যেসব ছামানা আছে, তা

সবগুলোই আমাদের একান্ত প্রয়োজন। যত কষ্টই হোক না কেন তা আমরা নিয়েই যাব। কমান্ডার ফাগুদায়েভ বললেন, ফায়ার করে হত্যা করা ভাল মনে করি না। কারণ এতে বিকট শব্দ হবে। অন্যসব ক্যাম্প তা জেনে ফেলবে। ওদেরকেও গলা টিপে হত্যা করলে ভাল হবে। এতে আমাদের অনেকগুলো গুলীও বেঁচে যাবে। ইচ্ছা করলে পার্শ্ববর্তী আরেক ক্যাম্পেও আমরা হানা দিয়ে এমনটি করতে পারব। এখন চিন্তা করে সিদ্ধান্ত দিন আমরা কি করব। ফাগুদায়েভের কথা শুনে সবাই বলে উঠলেন হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ,তাই করা উচিত। এমনটিই হোক। পাইলট বললেন,ফয়সালার মালিক তো আমি নই, ফয়সালা দিবেন হুজুর। হুজুর এ কথায় উপরই রায় দিয়ে দিলেন। তার পর গভীর রাতে পরিকল্পনামত তাদেরকে হত্যা করে সব অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে হামলা করেন পার্শ্বের আর এক ছাউনিতে। সেখানে ছিল ১২ জন সৈন্য। তাঁরা এই ১২ জনকেও হত্যা করে অস্ত্র, গোলাবারুদ,খাদ্য,পানীয়, ঔষধ ও যাবতীয় মালামাল নিয়ে পাহাড়ের দিকে পাড়ি জমালেন।

চার

মিস জমিলিনা তাঁর বান্ধবী কেনিডলীকে নিয়ে আমার মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করতে লাগলেন। একবার কেনিডলী একজন উকিলের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব, আমাদের জেলখানাগুলোতে হাজার হাজার মুসলমান বন্দি রয়েছে। এদের মুক্তির জন্য কি কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে? জবাবে উকিল বললেন, আইনি লড়াইয়ে তারা কোন দিন জিতবে না। তাদের মুক্তির জন্য কোন টাকা-পয়সা খরচ করা ঠিক হবে না। কারণ, তারা আর কোন দিন মুক্তি পাবে না।

তা হলে কি তারা আজীবন জেলে পঁচে-গলে শেষ হবে?

ঃ তা হবে না। কারণ, এখন তাদের কারাবরণের হায়াত ফুরিয়ে আসছে। নতুন আইন অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের ৫ মাসের বেশী

কারাগারে রাখা হবে না। তাদেরকে প্রতি দিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চিড়িয়া খানায়। এদেরকে বানানো হচ্ছে পশুদের খোরাকী। চলতি বৎসরের শেষ দিকে হয়ত মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলমানদের থেকে কারাগার খালি করা হবে। এধরনের আসামীদের পক্ষে আইনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া নতুন আইনে দন্ডনীয় অপরাধ। আপনি কেন এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন?

মিস কেনিডলী ঃ আমি মাথা ঘামাচ্ছি এজন্য যে, আমার একজন লোক মস্কোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন। তাঁর একটি হাত কেটে দিয়েছিল অনেক আগেই। মিথ্যা দোষারোপ করে নিরপরাধ লোকটিকে জেলে দিয়েছে। তাই আমি লোকটিকে মুক্ত করতে চাই। যত টাকাই লাগুক খরচ করতে রাজি আছি। দেখুন জনাব, কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা?

ঃ আপাতত আমি কোন পথ দেখছি না। তবে কোন সুরতে যদি কারাগারের ভিতর প্রবেশ করে কয়েদি ও জেলারের সাথে সাক্ষাত করতে পারতাম, তাহলে চিন্তা করে দেখতাম কোন পথ আবিস্কার করা যায় কি না।

ঃ জেলখানায় প্রবেশ করা তো কোন ব্যাপারই নয়। কারণ, প্রথম সারির অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নেত্রী তো আমাদেরই সাথে বসা। তিনি জেল কর্তৃপক্ষকে একটু বলে দিলেই হবে যে আমরা জেলপরিদর্শনে আসছি। এতটুকু বললেই কর্তৃপক্ষের খবর হয়ে যাবে। আমাদের অভ্যর্থ্যনার জন্য নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই এসে সমস্ত কর্মকর্তা ফটকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন।

ঃ তা হলে তিনিই একটি তারিখ নির্ধারণ করে দিলে ভাল হয়। অতঃপর মিস জামিলিনা জেল কর্তৃপক্ষের নিকট ফোনে যোগাযোগ করে বলেন, আমি আমার বন্ধু-বান্ধবীসহ জেলখানা পরিদর্শনে আসব আগামী ১৫ তারিখে। সে দিন আপনাকে অবশ্যই থাকতে হবে।

কর্তৃপক্ষ ঃ জী হাঁ-জ্বী হাঁ! অবশ্যই থাকব, শতবার থাকব। আমি এখন থেকে আপনাদের আগমনের অপেক্ষায় অধির আগ্রহ নিয়ে বসে গেলাম।

তার পর উক্ত তারিখে কেনিডলী মিস জামিলিনা ও পরামর্শদাতা উকিল জেলখানায় আসেন এবং জেল কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সব কিছু দেখাতে লাগলেন। আজ দুদিন যাবৎ কেন যেন সারাটা দুনিয়া আমার নিকট ওলট-পালট মনে

হচ্ছিল। অসহনীয় এক বেদনা এসে আমার অন্তররাজ্যে হানা দিয়ে বিরক্ত করে তুলছিল। অনাগত ভবিষ্যতের আরো ভয়ানক পরিস্থিতির অপেক্ষা করছিলাম। তাই ঘুম নেই দু-দিন যাবত আমার অক্ষিপল্লবে। মাহমুদা ও হেলেনার চিন্তা আমাকে খুব পীড়া দিচ্ছিল। এদুজন অবলা নারী ভিনদেশে কি অবস্থায় আছে, কে তাদের সুখে-দুঃখে, অসুখ-বিসুখে পার্শ্বে এসে দাঁড়াবে, কে নিবে অভাগিনীদের খোঁজখবর ? পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্নীয়-স্বজন কেউ নেই সেখানে। এসব চিন্তা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। হেলেনার কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমার নবজাতকের বয়স হবে ৬ বৎসর। হেলেনাই সর্বপ্রথম আমাকে সংবাদ দিয়েছিল যে, মাহমুদা আপা অন্তঃসত্তা। ছেলে বা মেয়ে হলে নাম কি রাখবে, তাও জিজ্ঞাসা করেছিল। কোন লাইনে লেখা-পড়া করাবে, তাও জিজ্ঞাসা করেছিল। গ্রেপ্তারের পর থেকে আজ পর্যন্ত ৬ টি বৎসর কেটে গেলএ জেলখানায় এসে আমার জীবনে কত উলট-পালট হতে দেখেছি। এক সময় জেলখানার সেলগুলোতে তিল ফেলানোর ঠাঁই ছিল না। ছিল মুসলিম নারী-পুরুষের ঠাঁসাঠাঁসি। আজ প্রায় সবগুলো সেল উজাড় হয়ে গেছে। প্রায় এক বৎসর যাবৎই প্রতিদিন গাড়ী ভরে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। এরা তো আর ফিরে আসেনি। অনেকেই গাড়িতে ওঠার আগে আমার মুক্তির জন্য দোয়া করত। তারা তাদের পিতামাতা সন্তান-সন্ততির কোলে ফিরে যাবে বলে খুব খুশী এজহার করত। অনেক সময় আমি তাদের সতর্ক করে বলতাম, ওহে ভাই সকল ! তোমরা স্বদেশে ফিরার খুশীতে এমন আত্নভোলা হয়ো না। আল্লাহকে ইয়াদ কর, বেশী বেশী তাওবা কর। আমি জানতাম, শত্রুরা তোমাদেরকে বাড়ী ফিরতে দেবে না। তোমাদের ভক্ষণ করতে চিড়িয়াখানার ব্যাঘ্র ও সিংহগুলোর জিব থেকে লালা ঝরছে। আমার মনে হয়, তোমাদেরকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাচ্ছে। আমার কথা শুনে কেউ কাঁদত আর কেউ পাগলের প্রলাপ আখ্যা দিয়ে হাসত। আমার জীবনে যে এমনটি ঘটবে না বা এমন মুহূর্তের সাক্ষাত হবে না তা মনে করিনি। এমন দিনটির জন্য আমি অপেক্ষায় ছিলাম। কেন যেন আমার চঞ্চল মন বারবার গাওয়া দিচ্ছিল এবং ডেকে বলছিল, হে খোবায়েব, জেলখানার দিন তোমার ফুরিয়ে আসছে। অন্য এক জগতে বসবাসের জন্য তুমি তৈরী হয়ে যাও। এগুলো কিছু ছিল কল্পনা আর কিছু ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহাম। সব কিছু মিলিয়ে আমাকে আমি উম্মাদ মনে

করতাম। কখনো কখনো চিন্তার কূলহীন পারাবারে সাঁতার কেটে লীন হয়ে যেতাম চিন্তারউর্মিমালায়। সেদিনও আমি চাতালে বসে হারিয়ে গিয়েছিলাম চিন্তাপুরে।

সেসময় একযোগে কয়েকটি পদধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। ভঙ্গ হল আমার ধ্যান। পশ্চাত দিকে চেয়ে দেখি আমার মুক্তিকামী মেহমানরা পশ্চাতে দণ্ডায়মান। আমি দাঁড়িয়ে তাদের সম্মান প্রদর্শন করলাম। তার পর আমাকে নিয়ে তারা চলে গেলেন একটি অফিসে। সেখানে আগন্তুক ৩ জন জেলার আর আমি এ ৫জন ছাড়া আর কোন লোক ছিল না। সবাই পছন্দমত আসন গ্রহণ করলেন। কক্ষে বিরাজ করছিল পিনপতন নীরবতা।

উকিল সাহেব কোন ভূমিকা না টেনে জেলারকে জিজ্ঞাসা করলেন," আমরা কি আপনার সাহায্যে (আমার দিকে ইংগীত করে) এ ছেলেটির মুক্তি পাওয়ার আশা করতে পারি ?

জেলার ঃ তা আমার পক্ষে কি করে সম্ভব বলুন ? আপনার সাথে যে দুজন মহীয়সীকে নিয়ে এসেছেন, তারা হলেন লেনিনের অতি আপন লোক। একজন তো কেন্দ্রীয় সম্মানিতা সদস্যা। অপরজন হলেন ধনকুবের কেনিডলী। লেনিনের সাথে তার রয়েছে গভীর আন্তরিকতা। তারা কোন পদক্ষেপ নিলেই তো পারেন। জেলারের কথা শুনে মিস জমিলিনা বললেন, জেলার সাহেব ! আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক কিন্তু একটু চিন্তা করলে হয়ত এধরনের কথা বলতেন না। কারণ, আমি কেন্দ্রীয় একজন সদস্য, কেন্দ্র নই। আমি যদি কোন মুসলমানের পক্ষে সুপারিশ করি, তাহলে একদিন না একদিন গোটা কেন্দ্র আমার বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াবে। তখন আমার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। । কত নিরপরাধ মানুষ তিলে তিলে ধুকেঁ ধুকেঁ কারাগারে মরছে, তা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন। বিচার ছাড়া, ফয়সালা ছাড়া এরা সাজা পাবে কেন ? তার জবাব কেউ দিতে পারবে না। কেউ যদি কারো মতাদর্শে একমত হতে না পারে ,তা হলে সে ব্যক্তি দোষী নয়। বলপ্রয়োগে তাকে মানাতে হবে এটা জুলুম ছাড়া কিছু নয়। পয়গম্বরের কথা হলে একটা বলা যেত। কমিউনিজম কোন ঐশি মতাদর্শ নয়। কেউ না মানলে সে বেঈমান হয়ে যাবে না। তা হলে কেন এত জুলুম আর বলপ্রয়োগ করা হবে ? এতসব বাড়াবাড়ি আমি কখনো পছন্দ করতাম না। এসব ব্যাপারে আমি যদি জোরগলায় কিছু বলতে চাই, তা হলে

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলসেবিক গুন্ডাদেরকে লেলিয়ে দিবে আমার পিছনে । কাজেই অন্য কোন উপায়ে মুক্ত করা যায় কি না সে রাস্তা দেখান ।

মিস কেনিডলী ঃ টাকার বিনিময়ে যদি তা সম্ভব হয়, তবে বলুন কত টাকা লাগবে তাকে ছাড়িয়ে নিতে ?

ঃ জেলার ঃ টাকার প্রশ্ন তো বড় কথা নয় ! আচ্ছা দেখি । এই বলে জেলার চলে গেলেন আলমিরার নিকট । আলমীরা খুলে এক ফর্দ কাগজ বের করে টেবিলে রেখে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,"আহঃ আর সম্ভব হল না । তার নাম তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে । আগামি কাল তাকে মুক্তি দেয়া হবে, অর্থাৎ চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে । একথা শোনার সাথে সাথে সকলের চেহারায় মলিনতার ছাপ লেগে গেল, যেন কালো মেঘ সূর্যকিরণ ঢেকে দিয়েছে । কিন্তু আমার চেহারায় আনন্দের হাসি খেলা করতে লাগল । আমার অবস্থা দেখে সবাই বিস্মিত । আমাকে এত আনন্দিত দেখে একজন প্রশ্ন করলেন, কিহে যুবক ! মস্তিস্কে বিকৃতি ঘটেনি তো ?(আমি স্মিতহাস্যে বললাম, মুসলমান কোন দিন মৃত্যুকে ভয় করে না বরং; বন্ধু মনে করে বুকে জড়িয়ে নেয়) তার ভীমআহবেও কোন দিন আপন পৃষ্ঠ অরাতিরা দেখতে পায় না । বক্ষ প্রসারী নেয় বুলেট বোমা আর খঞ্জরাঘাত । কোন ধূর্ত লোক আযরাঈলের পাঞ্জা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি আর পাবেও না । তা হলে বাঁচার জন্য এদিক-সেদিক ঘুষ দেয়ার কোন যুক্তি নেই । আর যদি পারেন আযরাঈলকে ঘুষ দিয়ে মানাতে, তা হলে চেষ্টা করুন । যদি জেলখানা থেকে মুক্তির বর্ত্ম পর্যেষণ করা যেতে পারে, তাহলে এ ব্যপারে আমি একটি পরামর্শ দিতে পারি, এর মাধ্যমে সম্ভব হলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন ।

জেলার বললেন বলুন তো আপনি কি পরামর্শ দিতে চান ? আমি বললাম, আপনারা যদি আমাকে মৃত সাজিয়ে কফিনে লুকিয়ে, এ চার দেয়ালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন, তা হলে পারবেন বলে আশা রাখি । আমার কথা শুনে জেলার একটু নীরব থেকে বললেন, তুমি যদি মৃতের ভান ধর, তাহলে ডাক্তারের একটি সার্টিফিকেটের অবশ্যই প্রয়োজন হবে । উকিল বললেন, হ্যাঁ, তা ঠিক । ডাক্তার যতক্ষণ মৃত বলে ঘোষণা না দিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কফিনে,ঢোকানো যাবে না । তবে ডাক্তারের সার্টি ফিকেটের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারব । জেলার এতে রাজি হলে জেলখানার ডাক্তারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘুষ দিয়ে আর জেলারকেও ঘুষ

দিয়ে এভাবে আমাকে জেলখানা থেকে কফিনে ঢুকিয়ে বাইরে আনা হয় । লাশবাহী গাড়ী আমাকে নিয়ে রাতের আঁধারে শহরের বাইরে নিয়ে যায় । তার পর আমাকে কফিন থেকে বের করে কফিনটি জ্বালিয়ে উক্ত ছাইগুলো নদীতে ভাসিয়ে আমাকে নিয়ে আসেন মিস জমিলিনা ব্রন্স এর বাসায় আর উকিল সাহেবকেও প্রচুর অর্থ দিয়ে বিদায় করে দেন । এ বাসার এক নিভৃত কক্ষে বসে প্রায় দুমাস পর্যন্ত এ দুমহিলাকে আমি পবিত্র কালাম ও মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়েছি । তার পর তারা আমার উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেন জার্মানে । সেখানে কর্তিত হাতটিকে কর্মঠ করার কোন প্রযুক্তি আছে কিনা তার খোঁজ নিলেন, কিন্তু পেলেন না । অবশেষে প্লাষ্টিকের একটি হাত আমার কব্জির উপরের অংশে সংযুক্ত করে দিলেন । এর দ্বারা কোন কাজ করা সম্ভব নয় । তবে এতটুকু হল যে, কেউ দেখলে এটাকে আসল হাতই মনে করবে ।

জার্মানিতে আমরা প্রায় একমাস কাটিয়ে দেশে ফিরে আসি । দেশে ফিরে মিস জামিলিনা ও কেনিডলী আমাকে অনেক অর্থকড়ি দিয়ে বললেন,"তুমি এখন তোমার গ্রামে ফিরে যাও । মুজাহিদদেরকে খুঁজে বের কর । হোটেল গার্ডেনে বসে যুদ্ধের পরিকল্পনা করা যাবে না । টাকা পয়সার অভাব হবে না । "তার পর আমি ওদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম মিকাঈলীতে– শ্বশুরালয়ে । সেখানে গিয়ে দেখি, শ্বশুরালয়ে অন্য মানুষ বাস করে । তাদের কাছে জানতে পারলাম, আমার শ্বশুর জায়গা-জমি বিক্রি করে অন্যত্র চলে গেছেন । নিরাশ হয়ে আবার মস্কোতে ফিরে এলাম জমিলিনার নিকট । তার পর সে আমাকে আফগান পাঠানোর ব্যবস্থা করল ।

পাঁচ

আমাকে মস্কো থেকে ৭০/৮০ কিলোমিটার দূরে এনে বিদায় দিলেন। আমার বিদায় মুহূর্তটা ছিল সকলের জন্যই বেদনাদায়ক। মিস জমিলিনা ব্রন্স ও তার বান্ধবী কেনিডলীর অশ্রুতে বক্ষদেশ প্লাবিত হতে লাগল। কারো মুখে সে সময় কোন ভাষা ছিল না। আমার অবস্থাও কোন অংশে কম ছিল না। আমি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বললাম, আপা! যেখানে আমার ছাহারা বলতে কেউ ছিল না। ছিলনা কোন আপন জন। কেউ করেনি আমার মুক্তির চিন্তা। এমন এক করুণ মুহূর্তে আপনারা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার অভিধানে নেই। তবে এতটুকু ওয়াদা করে যাচ্ছি, আল্লাহ যদি দয়া করে আমাকে জান্নাত দান করেন, তা হলে আপনাদের ছাড়া এক কদমও জান্নাতের দিকে অগ্রসর হব না। আমি আজীবন আপনাদের জন্য দোয়া করে যাব। কোন দিন আপনাদের অনুগ্রহের কথা ভুলব না। আমার কথা শুনে মিস জামিলিনা বলল, ভাইজান, আসলে আমরা আপনার যথাযথ মর্যাদা দিতে পারিনি। এত দিন তো আপনার নিকট থেকে দ্বীনের কথা শুনতাম। এখন তো আমাদের সেই পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আবার জীবনে সাক্ষাত হয় কি না, তা কে জানে ? দয়া করে আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা আপনাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাব।

জমিলিনার কথা শেষ হতে না হতেই মিস কেনিডলী তার মহা মূল্যবান অঙ্গুরিটি খুলে আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে বলল, স্মৃতিটুকু থাক। আমি ও তা সাদরে গ্রহণ করে নিলাম। সে আরো বলল, আমার হোটেল গার্ডেন আপনাদের জন্য ফ্রি করে দিলাম, একথাটি কিন্তু ভুলবেন না। এবলে রাহা খরচের জন্য দুজনে মিলে অর্ধ লক্ষ টাকা আমার বেগে গুঁজে দিল। তার পর সেখান থেকে প্রাইভেট কারে ভোরনেস্ক রেলওয়ে জংশনে চলে আসি। ভোরনেস্ক থেকে একটি লাইন ডন, ভলগা, স্টেপস্ক

ও কারমাইক হয়ে আজারবাইজান চলে গেছে। আজারবাইজান কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত। কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বতীরে এক দিকে কাজাকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের সীমান্ত আর দক্ষিণে ইরানের আরমেনিয়া সীমান্ত। ইরানের পূর্বে আফগানিস্তান অবস্থিত।

ভোরনেস্ক জংশন থেকে আর একটি রেলপথ মোডভি, সারাটুভ, ওরেনবুর্গ হয়ে কাজাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। সেখান থেকে উরালস্ক,আকতাইভস্ক হয়ে আরব সাগরের কোলঘেঁষে কাজালিনস্ক,কাজেল ও ওরডা হয়ে তাসকন্দ এসে পৌছেছে। তাসকন্দ থেকে টোরটকোল হয়ে বোখারা পৌছেছে। সেখান থেকে তাজিকিস্তান দুসানবে পর্যন্ত রেল চলাচলের সুব্যবস্থা রয়েছে। দুঃখের বিষয়, কাবুলে পৌছার কোন রেলপথ নেই। তাই ইরান ও তুর্কমেনিস্তান হয়ে কাবুলে ঢোকাটাই আসান ও নিরাপদ মনে করে আজারবাইজানের টিকেট ক্রয় করে ট্রেনে চেপে বসলাম। দূরের সফর। কয়েক দিন কাটাতে হবে ট্রেনে। তাই প্রথম শ্রেণীর একটি ক্যেবিনের টিকেট নিলাম। কেবিনে পেশাব-পায়খানা ও গোসলখানার খুব সুন্দর ব্যবস্থা। একটি কেবিনে ৪ জন যাত্রী খুব আরামের সাথে যেতে পারে। আমি একাই পুরো কেবিনের ভাড়া দিয়ে রিজার্ভ করে নিলাম যেন রাস্তায় কোন ঝামেলা না হয়।

ট্রেনটি সকাল ৮ টায় ভোরনেস্ক থেকে ছেড়ে এসেছে। ডন পর্যন্ত আসতে সময় লাগল ৫ দিন। আরো ৫দিন চলতে চলতে স্টেপনস্কে এসে পৌছল। স্টেপনস্ক এসে ট্রেনটি প্রায় ৬ঘন্টা বিশ্রাম নিল। এখানে এসে গাড়ী প্রায় খালী হয়ে গেল। একেক বগিতে যাত্রী ১৫/২০ জনের বেশী হবে না। আমার বগীর কেবিনগুলোও অনেকটা খালি হয়ে গেল। যাত্রী হ্রাসে বুঝতে পারলাম, আজারবাইজান আর বেশী দূরে নয়। কারণ, সীমান্তবর্তী এলাকার দিকে যতই অগ্রসর হবে, লোকজনের ভীড় ততই কমতে থাকবে। এটা আমার দ্বীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা।

শত শত মাইল ট্রেনসফরে যে সব দৃশ্যাবলী অক্ষি নামক ক্যামেরায় ভাসছিল, তা বড়ই বেদনাদায়ক। আজ প্রায় নয়টি বৎসর যাবত জেলখানায় কাটিয়েছি। নয় বৎসর আগের দুনিয়া আর সেই দুনিয়া নয়। সবই আমার নিকট উলট-পালট মনে হল। অবস্থাদৃষ্ট মনে হচ্ছে, মুসলিমশূন্য এ জনপদ। কোন মুসলমাকে ওরা জীবিত রাখেনি। সবাইকে পাইকারীহারে শহীদ করে দিয়েছে। তাছাড়া আরো একটি বিষয় আমার

নিকট এসে ধরা পড়লতা হল, সমস্ত শহর-বন্দর ও হাট-বাজারের নিয়ন্ত্রণ একচেটিয়া। ভাবে বলসেবিকদের হাতে চলে গেল। দেশটা একদম বিরান বিরান মনে হচ্ছিল। কারো মুখে হাসি নেই। এক নিরানন্দ পরিবেশ বিরাজ করছিল সর্বত্র।

বিকাল ৩টায় খবর হল, ট্রেনটি আজারবাইজান যাবে না। আমি কালমাইক স্টেশনে বসে পরবর্তী ট্রেনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। কেন ট্রেন যাবে না তার কোন উত্তর স্টেশনমাষ্টার থেকে পাওয়া গেল না। আমি ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফরমে পায়চারী করছিলাম। যাত্রীরাও হতাশ হয়ে প্লাটফরমে ঘোরাফেরা করছিল। কখন কোন ট্রেন এসে আমাদেরকে আজারবাইজান নিয়ে যাবে, তা কোন ট্রেনকর্তৃপক্ষ বলতে পারছে না। আমরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আটকে গেলাম। এত দিন তো আমি আমার রুমের দরজা বন্ধ করে নামাজ পড়ছিলাম। এখন তো নামাজ পড়া মুশকিল হয়ে গেল। আছরের সময় যায় যায়। নামাজ পড়লে আবার কোন বিপদে পড়তে হয় তা কে জানে। আমি প্লাটফর্ম ত্যাগ করে বাইরে চলে এলাম। হাটতে লাগলাম অনুমানে। অক্ষিপল্লব খুঁজে বেড়াচ্ছিল কোন মসজিদ। একটু এগিয়ে দেখি, তীর চিহ্নদেয়া একটি সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে। এতে মসজিদের সংকেত বহন করছিল। আমি কয়েক কদম গলির ভিতর এগিয়ে দেখি মসজিদটি আর জীবিত নেই। ইট-পাটকেলগুলো মুসল্লীদের রক্তে গোসল করে নীরব ভাষায় রোদন করছে। আমি ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে অশ্রুতে বক্ষ সিক্ত করে চলে এলাম। অবশেষে কয়েকটি রেললাইন পেরিয়ে একটি মালবাহী ট্রেনের খোলা ডাব্বায় নামাজ আদায় করলাম। এমনিভাবে মাগরিবও এশার নামাজও সেখানেই আদায় করলাম। ট্রেন আসবে আসবে মনে করে কোন হোটেলে উঠিনি। এভাবে সারা রাত স্টেশনে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকাল ৮টায় একটি ট্রেন এসে প্রথম লাইনে দাঁড়াল। মাইকে ঘোষণা করা হল, এট্রেনটি আজারবাইজানের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। যাত্রীরা আস্তে আস্তে নিজ নিজ আসন দখল করে ট্রেনে উঠে বসল। ট্রেনটি ৮-৩০মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও ছাড়ল ১০ টায়। আমার টিকেট ছিল প্রথম শ্রেণীর কেবিনের। দুঃখের বিষয়, এট্রেনে প্রথম শ্রেণী তো দুরের কথা, ৪র্থ শ্রেণীও নেই। নিরুপায় হয়ে লম্বা একটি সীটে কম্বল বিছিয়ে নিলাম। কালমাইক থেকে আজারবাইজানে পৌছতে

সময় লাগে ৮ ঘন্টা। দুঃখের বিষয়, ৮ ঘন্টার জায়গায় সময় লাগল ২ দিন।

আজারবাইজান এসে জানতে পারলাম, রাত ৮ টায় আজারবাইজান বন্দর থেকে একটি ষ্টিমার কাস্পিয়ান পাড়ি দিয়ে তুর্কমেনিস্তান যায়। সময় লাগে দু দিন। তুর্কমেনিস্তানের সামুদ্রিক বন্দর কারানুভডস্ক। কারানুভডস্ক থেকে ট্রেনযোগে উজবেকিস্তানের টোরটকোন ও বুখারা পৌছা যায়। তাই পূর্বের পবিকল্পনা বাদ দিয়ে ষ্টিমারে যাওয়াটাই খুব সহজ মনে হল। তাই আর কোন চিন্তা না করে কেবিনের টিকিট করে আপন কক্ষে উঠে গেলাম। ষ্টিমারটি পাহাড়সমান ঢেউয়ের ঝুটি ঝাপটে ধরে আমাদেরকে নিয়ে চলল।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় আমাদের ষ্টীমার এক দিন দুরাত হেলে দুলে খেলা করছিল। দুখের বিষয়, দ্বিতীয় রজনীর শেষ প্রহরে সমুদ্র ক্ষেপে ওঠে আমাদের সলিস সমাধি রচনা করতে। যাত্রীরা ছিল সবাই ঘুমে অচেতন। বাইরে যে ঘূর্ণিঝড় বইছিল, তা কেউ টের পায়নি। ষ্টিমার কর্তৃপক্ষ যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন, তখন মাইকে সতর্ক সংকেত দিতে লাগল। যাত্রীরা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বাইরের অবস্থা দেখে চিৎকার আরম্ভ করল। চিৎকারে কারো কথা শোনা যাচ্ছিল না। ইঞ্জিনের শব্দ, মাইকের আওয়াজ আর ক্রন্দন ধ্বনি আর উপর্যুপরি বজ্রনিনাদে এক প্রলয়ংকর, অবস্থার সৃষ্টি হল। জাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় শত মাইল উত্তরে চলে গেল এটাও কিন্তু যাত্রীরা জানত না। পরে আমরা জানতে পেরেছি, নাবিক জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র দাপটে সকলেই দেখি পাকা ঈমানদার হয়ে গেছে। আমি ৪র্থ তলার কেবিনে অবস্থান করছিলাম। অবস্থা বেগতিক দেখে করিডোরে দাঁড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে আজান দিতে লাগলাম। আমার আযান শুনে আমার আশাপাশের যাত্রীরাও আমার সুরে সুর মিলিয়ে আজান দিতে লাগল। এভাবে ক্রমান্বয়ে এক থেকে ৫ তলা পর্যন্ত আজানের আমল চালু হয়ে গেল। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ঘূর্ণিঝড়টি থেমে আকাশ সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে গেল। যাত্রীরা প্রাণভরে অবলোকন করছিল কৃষ্ণপক্ষের শশিকরের স্নিগ্ধ হাসি। অনেকেই বলাবলি করছিল যে,কমিউনিষ্ট হয়ে নামাজ,রোজা, হজ্জ-যাকাত অর্থাৎ ইসলামের সব কাজ ছেড়ে দেয়ার পর এটাই আল্লাহকে ডাকার প্রথম দিন। আমি বললাম, ভাইয়েরা, আমার আজকের এই ভয়াবহ

ঘূর্ণিঝড় ফিরাতে পারেনি লেনিন, ষ্টালিন আর কার্লমার্কস। তেমনিভাবে পরকালেও এরা আমাদের কোন উপকারে আসবে না। কাজেই আল্লাহকে ভুল না। একমাত্র আল্লাহই পরকালে আমাদের মুক্তি দিতে পারেন। আর বাকি সবই মিথ্যা।

ঝড় থেমে গেছে। ঘনঘটামুক্ত আকাশ। তিমিরাচ্ছন্ন রজনীর অবসান ঘটিয়ে সুবহে সাদিক আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হল। যদিও কূল-কিনারা দেখা যায় না, তবু তো আশার আলো ফুটেছে আমাদের মনে। আমি আজান দিয়ে নামাজে দাঁড়ালাম। চেয়ে দেখি,শত-শত লোক আমার পিছনে নামাজে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমাদের ষ্টিমার সকাল ৮টায় তুর্কমেনিস্তানের সমুদ্রবন্দর কারানুভডস্কে পৌছার কথা ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণাবর্তে পতিত হওয়ার কারণে বিকাল ৪ টায় এসে কারানুভডস্কে নোংগার ফেলল। যাত্রীরা সবাই নিজ নিজ লাগেজ-পত্র ও লোকজন নিয়ে ষ্টিমার ত্যাগ করতে লাগল। তাদের মধ্যে আমিও একজন। রেলষ্টেশনে গিয়ে দেখি, আমাদের ট্রেনটি ষ্টিমারের জন্য কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করে চলে গেছে। নিরুপায় হয়ে গেষ্ট হাউজে গিয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণ পর আসরের আজান ধ্বনিত হল। আজানের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে আনন্দে মাতিয়ে তুলল। কয়েক বৎসর পরে আজান শুনতে পেয়ে দৌড়িয়ে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করলাম। তার পর জানতে পারলাম, আমাদের ট্রেন রাত ১১ টায়। আমার বিছানাপত্র গেষ্টহাউজে রেখে শহরটি ঘুরে দেখার জন্য বের হলাম। মাগরিবের নামাজের সময় হলে একটি মসজিদে গিয়ে উঠলাম। উক্ত মসজিদটির দক্ষিণ পার্শ্বেই অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া কারানুভডস্ক। নামাজ শেষ করে মাদ্রাসা ভবনের দিকে এগিয়ে গেলাম। বিশাল মাদ্রাসা। শত-শত ছাত্র। আমি অফিসে গিয়ে উঠলাম। হুজুরদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করলাম। এমন সময় একজন হুজুর এসে আমাকে নাম ধরে ডাক দিলেন। আমি বিস্মিত হয়ে বিস্ফারিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু চিনতে পারিনি। তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন "কি হে খোবায়েব ! চিনতে মনে হয় কষ্ট হচ্ছে ?"আমি উত্তরে বললাম, জ্বী.হাঁ। চিনতে পারছি না। তিনি বললেন, আমি আতাউর রহমান খাদায়েভ।

ঃ কোন আতাউর রহমান খোদায়েভ ? আদিব সাহেবের ছেলে ?

ঃ হাঁ, আমি আদিব সাহেবের ছেলে।

ঃ হুজুরের অবস্থা কেমন ?

ঃ আলহামদু লিল্লাহ্ ! তিনি জান্নাতে আছেন।

ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি কবে শহীদ হয়েছেন ?'

ঃ প্রায় ৪ মাস ।

ঃ আপনি এখানে কি করে এলেন ?

ঃ হিজরত করেছি। আরো অনেকেই।

এদিকে মাদ্রাসার প্রতিটি তলায় তলায়, রুমে রুমে, ও কানে কানে খবর হয়ে গেল মুজাহিদ কমান্ডার খোবায়েব জাম্বুলী এসেছেন। খবরের সাথে সাথে ছাত্র-শিক্ষক তিলাওয়াত ও কিতাব মুতালা বন্ধ করে দপ্তরে ও বাইরে এসে জমায়েত হতে লাগলেন। হযরত মুহতামিম সাহেব সবাইকে হলরুমে গিয়ে বসতে বলেন । অতঃপর কয়েকজন উস্তাদ আমাকে হলরুমে নিয়ে গেলেন। তখন হলরুম কানায় কানায় ভর্তি। আমাকে দেখার জন্য চলছিল প্রতিযোগিতা,কার আগে কে দেখবে।

মোহতামিম সাহেব সবাইকে অঙ্গুলী নির্দেশে বসিয়ে দিলেন এবং চুপ হওয়ার জন্য কড়াকড়ি আদেশ দিলেন। এবার নীরবতা বিরাজ করছিল। যেন পিপিলিকার পদধ্বনিও এসে কানে বাজবে। এবার আমার উস্তাদের ছাহেবজাদা মাওলানা আতাউর রহমান খাদায়েভ দাঁড়িয়ে বললেন, " হে আমার প্রিয় বন্ধুরা ! আজ আমি অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সাথে ঘোষণা দিচ্ছি যে, আজ আমাদের মাঝে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এক খাঁটি আশেক, দ্বীনের মুহাফেজ, খালিদ বিন ওলিদ, তারেক বিন জিয়াদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম সালাহ উদ্দীন আয়ুবী, নূরউদ্দীন জঙ্গি, সুলতান মাহমুদ গজনবীর উত্তরসুরী,মুসলমানদের রাহবার বাতিলের আতংক মুজাহিদ কমান্ডার ভাই হাফেজ মাওলানা খোবায়েব জাম্বুলী আমাদের মাঝে হাজির হয়েছেন। তাঁর অনাকাংখিত শুভাগমনে জামিয় আজ ধন্য। তোমরা পত্র-পত্রিকায় আর রেডিও টিভিতে যার দুর্ধর্ষ আক্রমণের কথা শুনে আসছ, সেই মহান সালার তোমাদের মধ্যে উপস্থিত। তোমরা আজ সেই কিংবদন্তির মহানায়ককে প্রাণভরে দেখে নাও এবং তাঁর পবিত্র যবান থেকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণী, এবং অমীয় নসিহতের সুরলহরী প্রাণভরে শ্রবণ কর। আমি অনুরোধ করব আমাদেরকে নসিহত করে ধন্য করতে।

আতাউর রহমানের দীর্ঘ চাটুকারী কথা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। সামনাসামনি প্রশংসার খৈ ফুটানো অনেক আগ থেকেই ঘৃণা করতাম। এর দ্বারা দিলের মধ্যে অহংকার,গর্ব আর তাকাব্বুরী এসে বাসা বাঁধে। সম্মুখে তারিফ করতে আমাদের প্রিয় নবীও মানা করেছেন। এমনকি চাটুকারের মুখে ধুলা নিক্ষেপের হুকুমও দিয়েছেন। একজন আলেম মানুষ ভাবাবেগে এত কিছু বলে ফেলছে তাই সকলের সম্মুখে লজ্জা দেয়াটা উচিত মনে করিনি। তাই গোস্বাকে খুব কষ্ট করেই হজম করলাম।

অতঃপর দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ করে বললাম," হে আমার পরম শ্রদ্ধেয় হযরত উলামায়ে কেরাম ও ছাত্র বন্ধুরা ! আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা আতাউর রহমান খাদায়েভ মুহাজিরের পবিত্র যবান থেকে কয়েক মাইল দীর্ঘ যে প্রশংসার সুরলহরী শুনেছ,এগুলোর হকদার আমি নই। আসলেই আমি প্রশংসা পাওয়ার হকদার বা যোগ্য কোন বান্দা নই। যত ধরনের প্রশংসা আছে,সব ধরনের প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র হকদার হলেন আল্লাহ। আল্লাহ যদি আমাকে আপনাদের মত ভীরু আর কাপুরুষ বানিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখতেন বা প্রিয় জন্মভূমি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, তা হলে খোবায়েবের পক্ষে কখনো জিহাদের মত একটি কঠিন এবাদত করার সুযোগ হত না। আল্লাহ আমাকে তওফিক দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের।

হে আমার দ্বীনের ধারক, বাহক ও নবীর উত্তরসুরী বন্ধুরা। আমি আজ আপনাদের সম্মুখে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা আরজ করব। কথাগুলো শ্রুতিমধুর হবে না। অনেকের নিকটেই কথাগুলো হলাহলের মত মনে হবে। তবু না বলে পারছি না। কিছুক্ষণ পূর্বে আমি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারলাম, অত্র মাদ্রাসায় প্রায় ২শ ৫০ জন ছাত্র ও আলেম উজবেকিস্তান থেকে তুর্কমেনিস্তানে হিজরত করে এসেছেন। আপনাদেরাকে আপনারা মুহাজির নামে পরিচয় দিচ্ছেন। আর স্থানীয়রা নিজেদেরকে পরিচয় দিচ্ছেন আনসার হিসাবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আপনারা আনসার ও মুহাজির নন। এখানে এক দল হল ভীরু-কাপুরুষ, ভাগুরা। আর এক দল জালিম।

(মক্কা বিজয়ের পরে হিজরত করতে মহানবী (সাঃ) মানা করেছেন। জিহাদের আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর হিজরতের আয়াতের আমল রহিত

হয়ে গেছে। এখন আর হিজরত নেই। হয়ত জিহাদ করে দুশমনমুক্ত করে ইসলামের পতাকা উঠাও, না হয় জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে যাও। ভেগে যাওয়ার কোন বিধান শরীয়তে নেই। কাজেই যারা উজবেকিস্তান থেকে পালিয়ে তুর্কমেনিস্তানে এসেছেন তারা সবাই ভাগুরা।)

(আর যারা দয়াপরবশ হয়ে আশ্রয় দিয়েছেন, তারা হলেন জালেম। আপনারা ইসলামের উপর জুলুম করেছেন। আপনাদের উপর ফরজ ছিল এদেরকে আশ্রয় না দিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দেশে ফিরিয়ে দেয়া এবং একথা বলে দেয়া যে,তোমরা তোমাদের দেশে গিয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনে ইসলমী হুকুমত প্রতিষ্ঠা কর। আর তারা যদি কুলিয়ে উঠতে না পারে, তবে আপনাদেরও ঝাঁপিয়ে পরা উচিত ছিল। শরীয়তের বিধান এটাই। কাজেই আপনারা আনসার নন। আপনারা জালিম)

হে আমার প্রাণপ্রিয় ভাগুরা ওয়ারেছাতুল আম্বিয়াগণ ! আপনারা এখানে এসে জামাই-আদরে দিন কাটাচ্ছেন। আপনাদের কানে কি পৌছেনি মা-বোনদের আহাজারী আর শিশুদের কান্নার রোল? আপনারা দেখেননি বলসেবিকরা যে রাস্তা-ঘাটে আমার মা-বোনকে লেংটা করছে?। দেখেননি মসজিদ-মাদ্রাসা, কুরআন-কিতাব জ্বালিয়ে দিতে আর আলেম উলামাদেরকে শহীদ করতে? তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান,কাজাকিস্তান দখল করে নিয়েছে। সেখানে ইসলামের জানাজা পড়েছে। দ্বীনকে দাফন করেছে। আল্লাহ আল্লাহ বলনেঅলাকে বিদায় দিয়েছে। এখন ওরা বীর দর্পে তুর্কমেনিস্তানের দিকে আসার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করেননি। গ্যালারীর দর্শকের মত ডাগর দুটি আঁখি মেলে আমাদের ধ্বংসলীলা অবলোকন করেছিলেন আজ। আপনারা নিজ গৃহে বসে বসে সে ধ্বংসলীলা দেখতে পাবেন। সময় আর বেশী বাকি নেই। এখনই সে দৃশ্য দেখতে তৈরী হয়ে যান।

তার পর জিহাদের ময়দানের কিছু কারগুজারী শোনালাম। তাদের জুলুম-অত্যাচার ও খোদায়ী নুসরত সব কিছুই শোনালাম। আমার ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে হাত উঁচিয়ে দেখিয়ে বললাম, বলসেবিক সামরিক জান্তারা আমার এ হাতটি কেটে দিয়েছে। উপস্থিত জনতাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। কিন্তু দশজন যুবককেও জিহাদের জন্য তাশকিল করতে

পারিনি। অবশেষে তাদেরকে আল্লাহর হাওলা করে চলে আসলাম। তার পর ট্রেন আসলে সীট দখল করে বসে গেলাম। ট্রেনটি একটানা দু' দিন দৌড়িয়ে বুখারা এসে হাজির হল। বুখারা আর সে বুখারা নয়। এটা বলসেবিকদের চারণভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে। বুখারার অলি-গলি পথ-ঘাট সবই ছিল আমার পরিচিত। সবগুলো দালান-কোঠার সাথে ছিল আমার পরিচিতি। এখন সে শহরের পথ-ঘাট-চেনার কোন উপায় নেই। মনে হয় শহরটির উপর দিয়ে সাইক্লোন আর ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে প্রচন্ডবেগে। লন্ড-ভন্ড করে দিয়েছে এই সুন্দর নগরকে। শহরটি মুসলমানদের রক্তে গোসল করে মরণাপন্ন অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। এটা যেন একটা ভুতুড়ে নগরী। এখনো লাশের পঁচা গন্ধ আমার নাকে লাগছিল। এখন শুধু মানচিত্র দেখে এটাকে বুখারা বলা যাবে। তা ছাড়া এটাকে বুখারা বলা খুবই কঠিন। আমি শহরে খুব ঘোরাফেরা করেছি। কিন্তু কোন পরিচিত চেহারা আমার সামনে পড়েনি। একদিন বুখারায় অবস্থান করে তাজিকিস্তানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। তাজিকিস্তানে রেল যোগাযোগ না থাকায় বাস, টাংগা ছাড়া যাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। তাই কিছু বাসে কিছু টাংগায় এভাবে প্রায় ৭দিনে তাজিকিস্তানের রাজধানী দুসানবে এসে পৌছলাম।

দুসানবের অবস্থাও একই রকম। দুসানবের অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। মাঝে-মাধ্যে দু-একটি মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে বটে; কিন্তু এগুলোর কোনটি সেনাছাউনি,কোনটি মদ্যশালা, আবার কোনটি আস্তাবল। সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে। টুপীঅলা কোন একজন মানুষ নজরে পড়ল না। অন্যান্য শহর থেকে এটা অনেকটা ভিন্ন রকম মনে হল। কারণ, অন্য সব শহরের নিয়ন্ত্রণ বলসেবিকদের হাতে থাকলেও তাদের কার্যক্রম পরোপুরি চালু করতে পারেনি। আর এখানে তাদের কার্যক্রম পুরোদমে চালু হয়ে গেছে। ধনি-গরীব জেলে-কুমার নাপিত-ধোপা,মুটে-কুলী,মেথর চাড়াল সবাইকে এক করে দিয়েছে। কেউ ধনী আর কেউ গরীব রইল না। তাদের ভিটে-মাটি জায়গা-জমি, ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে সবাইকে করে দিল এক সমান। তারা তাদের ওয়াদা পুরণ করেছে। এখন নওয়াব-নফর, বাদশা-ফকিরের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই রাষ্ট্রের মেহমান। নারী-পুরুষ যুবক-যুবতী, বুড়াবুড়ি আর মনিব-গোলাম একসাথে মিলে-মিশে কাজ করছে। কাজের বিনিময়ে কোন

অর্থ পাচ্ছে না। সরকারী ব্যারাকে থাকে আর সরকারী হোটেলে খানা খায়। খানাগুলো রুচীমত হোক চাই না হোক, ভাল লাগুক চাই না লাগুক, এটাই খেতে হবে। গরীবরাও কোন দিন এধরনের খাবার খেত না। ধনীদের তো কোন কথাই নেই। যারা জীবনে কোন দিন মাটির কাজ করেনি, করেনি কৃষি কাজ, সেসব ভদ্র লোকেরাও আজ মজদুরবেশে রোদ-খরা আর ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। কাজ না করলে এক মুঠো অন্ন মুখে তুলতে পারবে না। তাই রাইফেলের বাঁটের গুঁতো আর বুট জুতার লাথি খেয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা কাজ করছে। আবার রাতের কিছু সময়ও কাজ করছে। এসব দেখে আমার আনন্দ লাগছিল আর মনে মনে গালি আসছিল যে,আরে গোলামের বাচ্চারা, তোমরা তো বাদশার জাতি আর বীরের বংশধর। কি করে আজ গোলামের জাতিতে পরিণত হল। তোমরাই তো এক সময় অর্ধ জাহান শাসন করেছিলে। তোমাদের ধাপটে সারা দুনিয়া থরথর করে কাঁপত। আজ কমিউনিষ্টদের লাথির ভয়ে তোমরা থরথর করে কাঁপছ। তোমরাই তো বলসেবিকদের চামচাগিরী করেছিলে। ধনীগরীব এক সমানের স্লোগান দিয়েছিলে। আজ হাড়ে হাড়ে কমিউনিজমের মজা উপভোগ কর। যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য যাও গর্ভধারিণী মা, সহোদরা বোন আর ঔরসজাত কন্যার কাছে। ছিঃ কত নোংরামী। শান্তির বিনিময়ে তারা অশান্তি ক্রয় করেছে। ঈমানের বিনিময়ে ক্রয় করেছে কুফুরী। জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত ছেড়ে দিয়ে লেনিনের এবাদতে লিপ্ত হয়েছে।

কমিউনিজমের যাঁতাকলে পতিত হয়ে জনগণ নিষ্পেষিত হতে লাগল। আগের মত এখন আর ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করতে পারছে না। আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছে,কিভাবে আছে সে খবরটুকু রাখার মওকা মিলে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে নিয়ে বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। টু শব্দটুকু করার ক্ষমতা তাদের নেই। উহঃ আহঃ শব্দ করলেই চাবুকাঘাতে জর্জরিত হতে হয়।

আমি হাঁটতে, হাঁটতে এক কৃষি খামারের পার্শ্বে এসে উপনীত হল . দেখি, প্রচন্ড রোদের মধ্যে কতগুলো বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও তরুণ-তরুণী কাজ করছে। পার্শ্বস্থিত বিটপী মূলে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অবলোকন করছিলাম। আমাকে দেখামাত্র ঐ সব ক্ষেত মজুররা ভয়ে কাঁপছিল। ওরা আমাকে বলসেবিক অফিসার মনে করে মিছামিছি ভয় পাচ্ছিল। চাবুকের ভয়ে জান

লুটিয়ে কাজ করছিল। সকলের পরনে ছিল খাকি হাফ প্যান্ট ও গায়ে সেন্ডু গেঞ্জি। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজা।

আমি ওদেরকে হাতের ইশারায় বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রামের জন্য ডাকলে ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালে আমি ওদেরকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলাম, ভায়েরা ! তোমাদের এধরনের পোশাক কেন দেয়া হল ? এক জন উত্তরে বলল "স্যার ! আমরা জানতে পেরেছি, শরীর ঢাকার মত পোশাক দিলে খরচ বেশী পড়ে,তাই এধরনের পোশাক দেয়া হয়েছে। বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা বিশ্রাম নিচ্ছেন না কেন ? আর এত খাটুনি খাটছেন কেন ? বুড়ো অশ্রুভেজা নয়নে বলল " বাবা ! আমরা যদি কাজ না করি বা অলসতা করি, তবে তোরা ধরে নিয়ে যায় এবং চিড়িয়াখানার বাঘের খোরাক বানায়। এজন্যই আমরা বাঁচার তাগিদে কাজ করি। যদিও শরীর তা করতে দেয় না।

বুড়োর কথা শুনে আমি বললাম, এটাই আপনাদের প্রতি সঠিক ইনসাফ করেছে কমিনিষ্ট। উচিৎ শিক্ষাটাই পেয়েছেন। দোয়া করি উত্তর শীরানা হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে গাধার মত কাজ করার তাফিক পান। এশাস্তি হল জিহাদ না করার শাস্তি। এর চেয়ে বেশী শাস্তি রয়েছে পরকালে। এখন থেকে অনুশীলন করে যান। তা হলে পর কালের শাস্তি সইতে পারবেন। এসব গালাগালি করে আবার হাটতে লাগলাম।

ছয়

মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী বাকি ৪জন সাথীকে নিয়ে চড়াই ,উৎরাই পেরিয়ে, বন-বাদার, মাঠ-ঘাট অতিক্রম করে ১৮ দিনে আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় শরণাথী শিবিরে এসে পৌছলেন। মাওলানার আগমনবার্তা পেয়ে শরনার্থী শিবিরের ছোট বড় ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই দলবদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। সকলেরই একটা ধারণা ছিল যে,

মাওলানা হয়ত স্বদেশে ফিরার মত একটা ব্যবস্থা করে আসছেন। জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার তীব্র আকাংখা বিরাজ করছে অন্তরে। শত শত শরনার্থী ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে মাওলানার দিকে তাকিয়ে রইল। সবাই নীরব। কারো মুখ থেকে কোন বাক্য বেরিয়ে আসছে না। এক যুবক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল," হুজুর ! আপনারা তো ৪০ জন গিয়েছিলেন অনেক দিন আগে। এখন দেখি মাত্র ৫ জন। অন্যেরা কি নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন, না নিহত হয়েছেন ? প্রথম সাক্ষাতেই এমন প্রশ্ন করবে, তা মাওলানা কল্পনাও করতে পারেননি। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরে দু ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। এক ভালর দিক আর দ্বীতিয় খারাপ দিক।

মাওলানা পরে কি হবে না হবে তা না ভেবে কুরআনের সুরে উত্তর দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ-শাহাদাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন। সংবাদের সাথে সাথে যেন বজ্র পতিত হল। শহীদ পরিবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তাদের কান্নার সুর ধরে অন্যরাও এতে অংশগ্রহণ করতে লাগল। একে অপরকে সান্ত্বনা দেয়ার জ্ঞানটুকু তাদের মধ্যে অবশিষ্ট রইল না।

প্রশ্নকারী ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, হুজুর ! ওয়াজ-নসিহত করে, দেশ স্বাধীনের কথা বলে, জান্নাতে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে ৩৯ জন যুবককে নিয়েছেন। এই ৩৯ জনের মধ্যে দুজনকে নিয়ে পালিয়েছেন আর বাকি ২৭ জনকে নিহত করে ৩জন ভেগে এসেছেন। আপনি হুজুর হয়ে কি করে এমন কাজটি করতে পারলেন ? এখন যদি আপনাকে ---?

হুজুর খুব শান্তশিষ্টভাবে বললেন," হে আমার প্রিয় সাথী ও বন্ধুরা ! আপনারা যদিও আমাদেরকে পরা জিত মনে করছেন, আসলে আমরা পরাজিত নই। মূলত আমরাই জয়ী হয়েছি। আমরা তাদের ট্যাংকবহর ধ্বংস করেছি। তাদের ৫০ জন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমান্ডোকে হত্যা করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে নিয়েছি। দুজন পাইলটসহ একটি গানশীপ হেলিকপ্টার ছিনতাই করেছি এবং তাদের জ্বালানী দিয়েই আমরা কিছু কিছু বিমান চালাতে শিখেছি। তাছাড়া ১২ জন সীমান্তরক্ষীকে হত্যা করে অস্ত্রসস্ত্র ছিনিয়ে এনেছি। আর আমাদের শহীদ হয়েছে ৪০ জন থেকে মাত্র ৩৭ জন। এটা কি আমাদের বিজয় নয় ? তিনি আরো বলেন--

হে আমার প্রিয় মুহাজির ভাই ও বোনেরা, আপনারা অনেকেই শহীদ ভাইদের সংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। আপনজন হারানোর ব্যথায়

হৃদয় কাঁদবে তা ঠিক। এর সাথে ছবরের লাগাম টেনে ধরা চাই। কেউ তো দুনিয়াতে চির দিন থাকবে না। এক সময় না এক সময় চলেই যেতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। পথে-ঘাটে,হাসপাতালের বেডে আর বিছানায় পড়ে মৃত্যুর চেয়ে শাহাদাত লাভ করা কতই না উত্তম! কতই না উত্তম ! শহীদ হওয়ার সাথে সাথে সে চির শান্তির জান্নাতে চলে যাবে। একজন শহীদ ৭০ থেকে একশজন জাহান্নামিকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এর চেয়ে চাওয়া-পাওয়া আর কি হতে পারে ? তারা তো দ্বীনকে গালেব করার জন্য, বোনের ইজ্জত রক্ষার জন্য, ভাইকে বাঁচানোর জন্য,মসজিদ মাদ্রাসা আর খানকাকে রক্ষার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়েছেন। কমিউনিজমের কবর রচনা করে খোদায়ী বিধান জারি করার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। এরাই তো আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এরাই তো নবীর প্রিয় উম্মত। এদের আমলের সাথে অন্য কারো আমলের তুলনা হতে পারে না। জিহাদের আমলের চাইতে উত্তম কোন আমল আল্লাহর নিকট নেই। আহা ! আমিও যদি তাঁদের সাথী হতে পারতাম ! তিনি আরো বললেন –

(হে আমার যুবক ভাইয়েরা ! উঠ ! ঘুম থেকে জাগ। ভাই এর রক্তের বদলা নিতে কোমড় বেধে দাঁড়াও। শাহাদাতের তামান্না নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়। দুশমনকে হত্যা করতে করতে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাও) আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মা ও বোনেরা। আপনারা আপনাদের সন্তানকে, ভাই ও স্বামীকে জিহাদের সাজে সাজিয়ে দিন। পঠিয়ে দিন রণক্ষেত্রে। আপনারা শহীদের মা, শহীদের বোন ও শহীদের স্ত্রীর মর্যাদা অর্জন করুন। আমরা ইজ্জতের সাথে বেঁচে থাকতে চাই। সুন্নত নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। আর যদি তা নাই হয় তবে শাহাদাত অর্জন করে জান্নাতে চলে যাব। তবু বাতিলের সাথে আপস করে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হব না।

মাওলানার তেজোদীপ্ত ভাষণে মাত্র ৫ জন যুবক দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল"হুজুর ! আমরা আর তাঁবুতে ফিরে যাব না। পিতা ও ভ্রাতা হত্যার বদলা না নিয়ে দুনিয়াতে মুখ দেখাতে চাই না। আমরা ৫ জনই আত্মঘাতী আক্রমণের জন্য তৈরি আছি। আল্লাহর রাস্তায় আমাদেরকে কবুল করুন। এখনই আমাদেরকে কোথায় পাঠাবেন পাঠিয়ে দিন। আমরা আর খিমায় ফিরে যাব না।

যুবকদের কথা শুনে মাওলানা এক এক করে সবাইকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন,"আপনাদেরকে জানাই মুবারকবাদ। আল্লাহ আপনাদেরকে জিহাদের জন্য কবুল করুন। এখন থেকে আপনাদেরকে কিছু কলা-কৌশল শিখতে হবে। ১০/১৫ দিন জরুরী কিছু বিষয় শিক্ষা করে তৈরী হোন। তার পর আমাদের সাথেই আপনাদেরকে নিয়ে যাব। অতঃপর তিনি তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিলেন। অন্যসব লোকজন নিজ নিজ আশ্রয়ে চলে গেলো।

সাত

স্বজন হারানোর বেদনা আমাকে আহত করে দিল। একদিকে আব্বাজানের শাহাদাত, অপর দিকে খোবায়েব খোবায়েব বলে মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ ও একাকী গৃহে মৃত্যু। অন্যদিকে আমার জীবনসঙ্গিনী মাহমুদার শাহাদাত এখন আবার অর্ধাঙ্গিনী মাহমুদা ও হেলেনাকে হারানোর বেদনা। এর মধ্যে হস্তকর্তন। সব মিলিয়ে আমি পাগলপ্রায়। ওরা কি এখনো জীবিত আছে নাকি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তা কে জানে ? না আমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে পাগল হয়ে আম্মার মত পথে পথে খুঁজে বেড়াচ্ছে তা কে বলবে ?। এসব চিন্তা বক্ষে ধারন করে কেঁদে কেঁদে পথ চলছি। ক্ষুৎ পিপাসা কে যেন হরণ করে নিয়ে গেছে। কত পাহাড়-জঙ্গল ও শাপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে ১৮ দিনে শরণার্থী শিবিরে এসে পৌছলাম। আমার একটি ধারণা ছিল, মাহমুদা ও হেলেনা হয়ত শরণার্থী শিবিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

আমার আগমনবার্তা চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়ল। নেমে এল জনতার ঢল, যেন বাঁধভাঙ্গা জোয়ার। আমি আশ্রয় নিয়ে ছিলাম মাওলানা আঃ সাত্তার বলখীর তাঁবুতে। উক্ত তাঁবুর সম্মুখেই রয়েছে বিশাল ময়দান। মাঝে-মধ্যে দু-একটি খেজুর গাছ মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন উক্ত মাঠেই জমায়েত হল। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা কেউ আর পিছিয়ে নেই।

সবাই হাজির। মায়েরা সন্তানকোলে অদূরে দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট ছোট বাচ্চারা মায়ের কোল থেকে অঙ্গুলীনির্দেশে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলছিল,"আম্মু ! আম্মু ঐ যে খোবায়েব। ঐ যে খোবায়েব। সবাই যে আমাকে এত আপন করে কাছে টেনে নিয়েছিল, হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল, তা আমি আগে ভাবতাম না, জানতাম না। আজকের সমাবেশ এটাই প্রমাণ করছিল। কয়েক বৎসরেও তারা আমাকে ভোলেনি।

আমি অদূরে দন্ডায়মান নারীদের চেহারার দিকে তাকিয়ে আমার কাঙ্খিত দুটি চেহারা খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু পেলাম না। আমার মন আরো দুর্বল হয়ে গেল। আমার অজান্তেই মুক্তোর দানার মত অশ্রুর ফোঁটা টপ টপ করে ঝরছিল। বিপদে ধৈর্য ধারন করা শরীয়তের বিধান। তাই অনেক কষ্ট করে ধৈর্যধারণ করলাম। এদিকে মাওলানা বলখী সবাইকে হাতের ইশারায় বসিয়ে দিয়ে বললেন, প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। আজ কয়েক বৎসর যাবতই তাঁর কোন খোঁজ আমরা পাচ্ছিলাম না। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তিনি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। তাই আমরা প্রাণভরে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখন তিনি আমাদেরকে তার দীর্ঘ সফরের কারগুজারী শুনিয়ে ধন্য করবেন। আপনারা নীরবতা অবলম্বন করুন এবং নিজ নিজ স্থানে বসে পড়ুন।

আমি আমার কারগুজারী শোনানোর ব্যপারে চিন্তা করলাম যে, আমার গ্রেপ্তারীর কাহিনী যদি প্রকাশ করি, তা হলে কাবুলের জামে মসজিদের খতীব ও নাদির শাহের ভুল বোঝাবুঝি প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হবে। কাজেই এসব প্রকাশ না করে গোপনে সেনাসালার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরী করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তাই আমার গ্রেপ্তারী অন্যভাবে বর্ণনা করে প্রথমে কারাবরণ ও নির্যাতনের দাস্তান শোনালাম। তার পর সাইবেরিয়ার তুষারাঞ্চলে নিক্ষেপ এবং মুক্তি তার পর আবার মস্কোর কারাগারে প্রেরণ ও নির্যাতন, হস্তকর্তন, তার পর মুক্তি ও চিকিৎসাসহ এপর্যন্ত আসা এবং মাহমুদা ও হেলেনাকে হারানোর করুণ ইতিহাস বর্ণনা করলাম। উপস্থিত লোকজন সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেলেন মাহমুদা ও হেলেনার কথা শুনে। বিশেষ করে মাহমুদা ও

হেলেনার বীরত্বগাঁথা ইতিহাস আগেই জানতেন। সবাই তাদেরকে চিনতেন। তাদের অগ্নিঝরা বক্তৃতায় মহিলারা জিহাদের বাইয়াত নিয়েছিলেন। জিহাদের জন্য বাইতুলমালে তাদের জেওর খুলে দিয়েছিলেন। তাই তারা এ বেদনা সইতে পারছিলেন না। তার পরও আমি তাদেরকে শান্ত্বনা দিয়ে দোয়া করতে উপদেশ দিলাম।

একমাস শরণার্থী শিবিরে কাটিয়ে দিয়ে আরো কজন সাথী তৈরী করলাম। তার পর মাওলানা বলখী, কমান্ডার আলায়েভ ও ফুগুদায়েভ এবং দুজন পাইলট ও নতুন ৫ জন মোট ১১ জন সাথী নিয়ে আবার মস্কোর পথে পা বাড়ালাম। এবার আমরা তাজিকিস্তান গিয়ে বোখারা হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে গেলাম উজবেকিস্তানের টোরটকোল শহরে। সেখান থেকে তুর্কমেনিস্তান হয়ে মাযাদ দিয়ে ইরানে প্রবেশ করি। তেহরান, দেজফুল আর মেনিয়া হয়ে চলে গেলাম আজারবাইজান। সেখান থেকে মস্কো।

মস্কো পৌছে আমি মাওলানা বলখীর জিম্মায় ৩ জন আর কমান্ডার আলায়েভের জিম্মায় ৩জন দিয়ে দু দলে ভাগ করে দুটি হোটেলে অবস্থান নিতে বললাম। আর আমার সাথে রাখলাম পাইলট সুরাসিকুকে। পাইলট সুরাসিকোকে বর্তমানে চেনার কোন উপায় নেই। তার এখন বুকস্পর্শ দাড়ী , বুকে ঝুলন্ত ক্রুশ আর হাতে বাইবেল। দেখলে যে কেউ উচুঁ পর্যায়ের পাদরী হিসাবেই মনে করবে। আমি পাইলট সুরাসিকোকে নিয়ে একটি রেষ্টুরেন্টে আশ্রয় নিলাম। আমাদের হোটেলগুলো অল্প ব্যবধানে থাকার কারণে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে কোন বেগ পেতে হত না। আমরা কেউ কারো হোটেলে গিয়ে আড্ডা দিতাম না। আমরা হোটেল ছেড়ে ফুটপাতে হাটতে হাটতে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করে ফেলতাম। আবার চলার গতি ঘুরিয়ে একেকজন একেক দিকে চলে যেতাম। এভাবে অপরিচিতের ভান ধরে তিন দিন কাটালাম। এর মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থান ও স্থাপনার অবস্থান জেনে নিলাম। এতে কোথায় কিভাবে কাজ করতে হবে, তার প্রাথমিক ধারণা নিয়ে নিলাম।

চতুর্থ দিন আমি পাইলট সুরাসিকুকে একটি চিঠি দিয়ে আর মিস কেনিডলীর দেয়া আংটিটি দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম মিস জামিলিনা ও কেনিডলীর বাসভবনে। আমার পত্রবাহক যথাসময়ে পত্র ও আংটি প্রাপকের হাতে পৌছিয়ে দিলেন। প্রাপকদ্বয় আমার পত্র পাওয়ার সাথে

সাথে সাক্ষাতের জন্য পেরেশান হয়ে গেলেন। কিভাবে সাক্ষাত করা যায় এনিয়ে দুজনে মিলে পরামর্শ করল। রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে জমিলিনাকে সবাই চেনে ও জানে। বহুবার বিশাল বিশাল জনসভায় লেনিনের সাথে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেছে ও ভাষণ দিয়েছে। এ হিসাবে সবাই তাকে চেনে। আবার মিস কেনিডলী হোটেল গার্ডেনের মালিক হিসাবে নাম-ধাম কম নয়। তাই দুজনই আমার হোটেলে এসে সাক্ষাত করাটা মানসম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে মনে করে বাহকের নিকট একটি পত্র পাঠিয়ে দিল। বাহক পত্র এনে আমার হাতে দিলে আমি তা যত্নসহকারে খুলে পাঠ করলাম। পত্রে লেখা ছিল—

আমাদের মাননীয় ধর্মীয় গুরু। আপনাকে জানাই সালাম ও মুবারকবাদ। আপনার শুভাগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। তাই আদায় করছি মহান রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শুকরিয়া। পর বার্তা এই যে, আমাদের উচিত ছিল সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা গিয়ে আপনাকে সসম্মানে নিয়ে আসা। দুঃখের বিষয় তা আমরা পারছি না। না পারাটার মধ্যে নিহিত রয়েছে দ্বীনের স্বার্থ। অতএব আমাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর নজরে তাকালে খুশী হব। আর বাকি সংবাদ হল,হোটেল গার্ডেনে রয়েছে ভি. আই, পি প্লাজা। এটা শুধু আমার ব্যক্তিগত অতীথিদের জন্য খাস। এখানে সরকারেরও প্রবেশের অধিকার নেই। আপনি দয়া করে আপনার সঙ্গিকে নিয়ে হোটেল গার্ডেনে চলে যান। আমি আমার ভি.আই ,পি প্লাজার ম্যানেজারকে ফোনে বলে দিচ্ছি আপনাকে একস্রেফ করার জন্য। আপনি উন্নত প্রাইভেট কারযোগে এখনই চলে আসুন। আমরা রাত এগারটায় আপনার সাথে সাক্ষাত করব।

ইতি
আপনার ধর্মীয় বোন
জমিলিনা ও কেনিডলী।

আমি পত্রখানা পাঠ করে মাওলানা বলখী ও কমান্ডার আলায়েভের নিকট সংবাদ পাঠালাম যে, আপনারা দ্বিতীয় নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করতে থাকুন। কাজের সার্থে আমি অন্যত্র চলে গেলাম। তার পর একটি প্রাইভেট কার ভাড়া করে ভি, আই.পি গেষ্ট সেজে চলে গেলাম

হোটেল গার্ডেনে। উঠলাম গিয়ে ভি,আই,পি প্লাজায়। ম্যানেজার তার কর্মচারীসহ আমাদেরকে এস্তেকবাল করতে প্রধান ফটকে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমারা গাড়ী থেকে নামার সাথে সাথে করমর্দন করে নিয়ে গেলেন ভিতরে। আহঃ কি সুন্দর ! যেমন সাদ্দাদের বেহেস্তখানা। সবগুলো কামরাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ এ,সি বসানো।

সেখানকার অবস্থা দেখে মনে পড়ল চির শান্তির আবাসন বেহেস্তের কথা। শহীদ হওয়ার সাথে সাথে বেহেস্তের হুর আর গেলমানরা রণাঙ্গন থেকে শহীদের এস্তেকবাল করে নিয়ে যাবে। তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতের সবোচ্চ মাকামে। সেখানে হুর-গেলমানরা নবাগত দুলহাকে সাদর আপ্যায়ন করবে। কার আগে কে শরবত পান করাবে, কার আগে কে পান করাবে দুধ আর মধু। কে আগে খাওয়াবে সুপক্ক ফল, তা নিয়ে চলবে তুমুল প্রতিযোগিতা। কেউই হারতে চাইবে না। তারই অতি সামান্যতম একটু নমুনা হোটেল গার্ডেনের ভি,আই,পি প্লাজাতে দেখতে পেলাম।

এখানে আপ্যায়নের দায়িত্বে রয়েছে অপূর্ব সুন্দরী কতগুলো যুবতী মেয়ে আর কিছুসংখ্যক গেলমানসদৃশ ছেলে। এমন সুশ্রী বালক-বালিকাকে কোথা থেকে যোগাড় করল তা ভাবতেও অবাগ লাগে। কোন মেহমান যাওয়ার সাথে সাথেই এরা দৌড়াদৌড়ি করে চা-নাস্তা ও টিপিনের ব্যবস্থা করে। এরা সবাই মিষ্টভাষী। ফুটন্ত কুসুমের স্নিগ্ধ হাসি তাদের ঠোঁটে লেগেই আছে। তাদের ভাষা কদাচার নয়। মধুর বচনে হৃদয় কেড়ে নেয়। তাদের মুখ থেকে যেন মধু টপ টপ করে ঝরতে থাকে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে অতুলনীয়। তাদের কথা-বার্তা ও আচার-ব্যবহারে কেউ কোন দিন খুঁত ধরতে পারবে না। সবাই মায়াদারী ও খুব মিশুক। মন কেড়ে নেয়ার অনেক কৌশল তাদের জানা আছে। এখানে কেউ একবার প্রবেশ করলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে না। আর অনেকের বেলায় এমনটিই হয়।

আমি এখানকার এই অবস্থা দেখে খুবই দুঃখিত হলাম এবং মনে মনে ভাবলাম,এটা তো জাহান্নামের একটি গহবর। এখানে অবস্থান করার অর্থ হল জাহান্নাম ক্রয় করা। এখানে ঈমান চলে যাবে। তাই পরিচালককে ডেকে এনে বললাম,ভাই আমি অনুপ্রবেশের সাথে সাথে এদেরকে দেখে পরহেজগারের পরহেজগারী চলে যাবে। নিরিবিলি থাকা আমার জন্য

উপকার। আপনি এদেরকে বলে দিন ওরা যেন আমার কক্ষে প্রবেশ না করে। প্রয়োজনে আমি তাদেরকে ডেকে পাঠাব। আমার কথা শুনে পরিচালক তাদেরকে ডেকে নিষেধ করে দিলেন। তাই মেসিয়াররা আমার কক্ষে প্রবেশ থেকে বিরত রইল।

রাত ১১ টা ৩০ মিনিটে মিস জমিলিনা ও কেনিডলী হোটেলকক্ষে চলে এল। উভয়ের পরনে রয়েছে হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি। এদেরকে দেখা মাত্রই আমার শরীরে পাবক শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। দুজনের চেহারাতেই রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ। অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। তাদের পোশাক যদি এই হয়, তাহলে কেমন লাগে ? দুজনই আমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিল। মুসলিম মহিলাদের কি ধরনের পোশাক হওয়া চাই, তা তারা ভালভাবেই জানে। তা ছাড়া আমিও তালিমের মধ্যে বারবার পর্দা সম্পর্কে জোড় তাকিদ দিয়েছি, বুঝিয়েছি। তার পর আবার আমার সামনে এধরনের পোশাক পরে আসা কতটুকু জঘন্য, তা তারা আদৌ বুঝতে পারেনি। তাদের দিকে তাকানো বা কথা বলা আমার নিকট এক অসহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমার মনোভাব বুঝতে ওদের বেগ পেতে হয়নি। তাই জমিলিনা বলে উঠল "ভাইজান ! আমাদেরকে দেখে আপনি কষ্ট পাবেন তা আমারা জানি। তার পরও কেন এ নগ্নসুরতে আসতে হল তা জানার প্রয়োজন আছে।

ঃ অতকিছু জানার প্রয়োজন হয় না। আমি এটাই বুঝি যে ৮০ বৎসরের রাম রাম দু একদিনে ভোলা যায় না। ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তার মধ্যে নিয়ে আসে বিপ্লবিক পরিবর্তন। তাকে সে ইসলামের অনুশাসন মানতে বাধ্য করে। কে কি বলবে আর করবে সে তা পরোয়া করে না। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সে তালাশ করে আমল করে ফিরে। কাজেই তোমাদের খোড়া যুক্তি আমি শুনতে চাই না।

ঃ না ভাইজান,আমাদের অভিযোগ আপনাকে শুনতেই হবে। আমরা নওমুসলিম হিসাবে আমাদের ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক আর এখন যে ভুলটি করেছি তা জেনে বুঝেই করেছি। তার কারণ হল, আমাদের চালচলনে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করছে। এসন্দেহ এক দিন আমাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমরা মাঝে-মধ্যে আমাদেরকে আড়াল করতে অতীতের দিকে ফিরে যাই। তাছাড়া এমনটি করা আমাদের হৃদয়েও আঘাত লাগে। আমরা যদি অতি সাধারণ ফ্যামেলীর সন্তান হতাম, তা

হলে কেউ আমাদের খবরও নিত না। একারণেই তাদের চোখে ফাঁকি দিতে হচ্ছে। আপনি চলে যাওয়ার পর আমরা দুজনে পরামর্শ করে মহিলা অঙ্গনে খুব সতর্কতার সাথে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। এতে আমরা অনেকটা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আরো একটি প্রধান কারণ হল বলসেবিকদের নারী নির্যাতনের করুণ চিত্র। এজিনিসটা সকলের দিলেই আঘাত হানছে যে, মুসলমান হওয়ার কারণেই পাষান্ডরা কেন এধরনের নির্যাতন করবে। এসব বিষয়ে মেয়ে মহলে বিরাট উত্তেজনা বিরাজ করছে। তাই তারা ইসলামের দিকে ক্রমান্বয়ে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর নজরে তাকান। অতিসত্বর আমরা পরিবর্তন হয়ে যাব।

তাদের কাকুতি-মনতি শুনে আমি বললাম, বার বার অন্যায় করে ক্ষমা চাওয়া ঠিক নয়। তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। আল্লাহ বান্দার সকল অপরাধ মার্জনা করে থাকেন। তার পর আমরা মূল আলোচনায় ফিরে গেলাম।

আমি বললাম, তোমাদের আমন্ত্রণে আমি দশজন মুজাহিদ নিয়ে রিক্তহস্তে মস্কো এসেছি। এখন তোমাদের সাহায্য-সহানুভূতি পেলে সামনে কাজ চালিয়ে যেতে পারব। তা না হয় আবার কোন দেশে ফিরে যেতে হবে। মিস জমিলিনা বলল,"ভাইজান ! আপনি অত বিচলিত হবেন না। আমাদের ওয়াদা আমরা অবশ্যই পূর্ণ করব। বলুন আমাদের কি করতে হবে ?

ঃ প্রথম কাজ ১১ জনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করা, অস্ত্র-গোলাবারুদ সংগ্রহ করা এবং টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করা। এগুলো হলে আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারব।

কেনিডলী ঃ ভাইজান ! আপনি সবাইকে হোটেলে নিয়ে আসুন। এখানে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। এই বলে সে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে বলল, আপনারা দু-একজন করে পৃথক পৃথক রুম ভাড়া করবেন। হোটেল কর্মচারীরা যেন বুঝতে না পারে যে, আপনারা সবাই এক বা আমার মেহমান। এসব বুঝতে দেয়া যাবে না। তার বুদ্ধি দেখে আমি খুবই খুশী হলাম এবং বললাম, সবাইকে হোটেলে রাখা ঠিক হবে না। আপনি টাকা দিলে কয়েকজনকে একটি ডেকোরেশনের দোকান করে দেব। ওরা ব্যবসা চালাবে এবং অন্যত্র থাকবে।

ঃ ডেকোরেশনের দোকান নেয়া তো কোন কঠিন কিছু না। এবাবদ আমি এক লক্ষ টাকা সকালে দিয়ে দেব। আমার প্রশ্ন হল, এ দোকানে জিহাদের কি ফায়দা হবে ? আমিই তো টাকার জিম্মা নিয়ে নিলাম। যত টাকা লাগে সবই আমি দেব।

ঃ জিহাদের বৃহৎ সার্থে ডেকোরেশনের দোকানের দরকার তার সুফল পরে বুঝতে পারবেন।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে, সকালে এক লক্ষ টাকা ব্যবসাখাতে দিয়ে দেব। বলুন আর কি দরকার ?

ঃ তিনটি হোন্ডা আর অস্ত্র-সস্ত্র ও গোলাবারুদ।

ঃ ঠিক আছে আগামীকাল বিকাল দুটায় নতুন তিনটি হোন্ডা পেয়ে যাবেন। আর অস্ত্রের জন্য কয়েকটি দিন অপেক্ষা করতে হবে, তবে অনেক বেশী সময় নয়। এসব আলাপ-আলোচনা করে ওরা চলে গেল : আমরা নামাজ পড়ে খানা খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকাল ১০ টায় একজন লোকের মারফতে একলক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিল। আমি পাইলট সুরাসিকোকে সংগে নিয়ে শহরে ঘুরতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে ষ্টেডিয়াম মার্কেটে গিয়ে ৩০ হাজার টাকা জামানত দিয়ে সুন্দর একটি দোকান ভাড়া নিয়ে নিলাম। দোকানের অবস্থান খুবই সুন্দর। সকলের নজর কেড়ে নেয়ার মত জায়গা। তার পর আমি ডেকোরেশনের যাবতীয় মালামাল খরিদ করলাম। এর মধ্যে অত্যাধুনিক দুই সেট মাইক ও আনুসঙ্গিক যাবতীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করলাম। এমন সুন্দর সেট নাকি আর মাত্র একজনের আছে। মালামাল দিয়ে ঘর সাজিয়ে বিশাল একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলাম। সাইনবোর্ডে লেখালাম–

কমরেড ডেকোরেটার ও মাইক হাউস।

এখানে বিবাহ-শাদী ও অন্যান্ন অনুষ্ঠানে গেইট তৈরী, রান্না-বান্না থেকে নিয়ে যাবতীয় কাজের অর্ডার রাখা হয়। জনসভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে সর্বাধুনিক উচ্চক্ষমতাসম্পন্য মাইক অল্প মূল্যে ভাড়া দেয়া হয়। আপনাদের সেবায় আমরা সতত নিয়োজিত। তার পর বড় বড় ব্যানার লিখে মোড়ে মোড়ে ঝুলিয়ে দিলাম এবং ৫ জনকে ডেকে এনে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিলাম। দোকানের পিছনে অতি আরামের সাথে থাকার জন্য ৫ জন সাথীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার একাজ দেখে মাওলানা বলখী খুব দুঃখিত হয়ে বললেন, হুজুর ! আমরা

তো ব্যবসার জন্য আসিনি। তাহলে এমনটি হল কেন ? আমি বললাম, চিন্তার কোন কারণ নেই। এর দ্বারা [illegible] উপকার হবে। আপনিই হলেন এই ব্যবসায়ের জিম্মাদার। তার পর তাদেরকে রেখে আমি আমার হোটেলে চলে গেলাম।

আট

দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে, দেশের অবস্থা ততই খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাচ্ছে। দ্বীনের ক্ষীণ প্রদীপটুকু কোথাও জ্বলতে দেখা যায় না। বিশেষ করে মুসলমানদের আচরণে মন-মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল। তারা একচেটিয়াভাবে কমিউনিজমের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করতে লাগল।

বারবারই আমার মনে পড়ছিল আমার আব্বাজানের নসিহতের কথা। আব্বাজান বলতেন,কোন জাতির অধঃপতনের তিনটি জিনিসের অধঃপতনে ঘটে। অর্থাৎ তিনটি জিনিস অধঃপতন না হলে জাতির অধঃপতন হয় না। সে তিনটি জিনিস হল (১) জাতির পূর্বসূরীদের ইতিহাস ভুলে যাওয়া (২) বিজাতীয় তাহজিব-তামাদ্দু ও কৃষ্টি-কালচার, আমদানী করা (৩) সমাজপতিদের চিন্তা-চেতনার বিকৃতি ঘটা। এতিন জিনিসের অধঃপতনই জাতির অধঃপতন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম সবাই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আমাদের নবী ছিলেন তলোয়ারধারী নবী। তলোয়ার ছিল মুসলমানদের গর্ভের বস্তু। মুসলিম ললনারা মুজাহিদ ছাড়া বিয়ে বসত না। সেসময় মুসলমানরা নিজের মেয়ে বা বোন বিয়ে দেয়ার পূর্বে খোঁজ নিতেন বর কয়টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে, কয় যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে আর পরাজিত হয়েছে কয় যুদ্ধে। পরাজিত হওয়ার কারণ কি ছিল ? কি কি অস্ত্র চালাতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধসংক্রান্ত খুঁটিনাটি অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতেন। তার পর সেই দুলহার নিকট নিজের মেয়ে বা নিজের বোনকে বিবাহ দিতেন। এ ইতিহাস মুসলমান একেবারেই ভুলে গেছে।

(বর্তমানে মেয়েপক্ষ জানতে চায়, পাত্রের পিতা-মাতা ভাই-বোন, বাড়ী ঘর আছে কিনা, লেখা-পড়া কোন পযর্ন্ত করেছে। এস,এস,সিতে রেজাল্ট কি ছিল ? বি,এ, এমএ তে রেজাল্ট কি বা কত নম্বর পেয়েছে ? পাত্র চাকুরী করে না ব্যবসা। চাকুরী করলে বেতন কত পায়। উপরি পায় কত ? আর ব্যবসা করলে মাসিক আয় কত ? এসব বায়োডাটা তালাশ করে বিবাহ দেয়।)

(এসব ছাড়াও মুসলমানদের ঘরে ঘরে চলছে সিনেমার র্চচা। কোন চ্যানেল থেকে কখন কোন ছবি আসছে, তা ছোট ছোট বাচ্চারা খবর রাখে। সমস্ত পূজার উপকরণ আর মূর্তির আইটেম এখন মুসলমানদের সোকেস ভর্তি। সাত গ্রাম তালাশ করলেও মুসমানদের ঘরে একটি পিস্তলও পাওয়া যাবে না। সাগনের মাষ্টার আর বাদ্যবাদকরা সকাল-সন্ধ্যায় এসে বাচ্চাদেরকে গান-বাজনা আর নৃত্য শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে।)

(সেকালের মুসলমান সন্তানরা এলমে দ্বীন শিক্ষার সাথে সাথে নিয়মিত ঘোড়দৌড়, তলোয়ার চালানো, তীর আর নেজা নিক্ষেপের অনুশীলন করত। আজ মুসলমান সন্তানরা বল, হকি, ক্রিকেট, দাবা তাশ, লুডু খেলার চর্চা করে নিয়মিত। হায়রে মুসলমান, হায়রে তোদের কুশিক্ষা ,কুকালচার।)

(ইসলামের ধারক-বাহক উলামায়ে কেরামগণ এলমে ফেকাই, এলমে তাফসীর, এলমে হাদীস, এলমে মানতেক ,এলমে ফাসাহাত অ বালাগাত, এলমে আদব,এলমে ফালাসিফার চর্চায় খুব বেশী মন দিয়েছেন, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যার প্রতি মনোযোগী নন। যুদ্ধের প্রতি যুবকদেরকে উৎসাহিত পর্যন্ত করছেন না। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। জিহাদের দিকে মুসলমান যুবকরা এগিয়ে আসছে না)। দু-চার, দশজনে জিহাদ করে কি করা যাবে তা ভেবে পাচ্ছি না। এজাতিকে মনে হয় আর উদ্ধার করা যাবে না। এসব চিন্তা করে আমি খুবই দুর্বল হয়ে গেলাম। মনের দিক থেকেও ভেঙ্গে পড়লাম।(একজন মুজাহিদের মন ভেঙ্গে গেলে তার জন্য পুরস্কার মিলে পরাজয়ের গ্লানি)। আমার ভগ্যেও হয়ত পরাজয় লেখা রয়েছে। তাই আল্লাহর নিকট বেশী বেশী তাওবা, ইসতিগফার করতে লাগলাম।

এমন সময় মিস জমিলিনা ও কেনিডলী এসে বলল,ভাইজান ! অস্ত্র ও গোলাবারুদের সন্ধান পেয়েছি। সেখান থেকে আনা তো খুবই রিস্কের

ব্যাপার। রয়েছে সীমান্ত ও ছোট বড় অনেকগুলো চেকপোষ্ট। এগুলো ফাঁকি দিয়ে এপর্যন্ত পৌছানো তো খুবই কঠিন। কিভাবে করা যায় ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন দেশের সাথে লাইন করছেন? বলল, চিন্তা করে দেখি।(সে বলল ইউ,ক্রেনের মোলদাভিয়া থেকে আনা যাবে। সেখানের এক প্রভাবশালী অস্ত্র ব্যবসায়ীর সাথে চুক্তি হয়েছে।)

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, মোলদাভিয়া থেকে অস্ত্রসংগ্রহ কোন ব্যপারই নয়। সহি-সালামতে মস্কো পর্যন্ত পৌছে যাবে।

ঃ তা কি করে হয় ? জিজ্ঞাসাা করল ডলী। মস্কোর সাথে ইউক্রেন ও মোলদাভিয়ার রয়েছে রেলযোগাযোগ। রেলে বুকিং দিলে হেসে-খেলে মাল মস্কো ষ্টেশনে এসে পৌছে যাবে। আশা করি রাস্তায় কোন চেকও হবে না।

ঃ এটা কি করে সম্ভব ?

(ঃ মোলদাভিয়া থেকে হোটেল গার্ডেনের জন্য দুটি ফ্রিজ খরিদ করবেন। ফ্রিজের ভিতরের সবকিছু খুলে ফেলে এর ভিতর অস্ত্র ও গোলাবারুদ ঢুকিয়ে সুন্দর করে প্যাকেট করে বুকিং দিতে হবে। তার পর রেল কর্মকর্মারা সযত্নে মস্কো পৌছে দিবে। এখানে একটি বিষয় খুব ভালভাবে স্মরণ রাখতে হবে। তা হল ফ্রিজের ভিতরের যে অংশ খুলে রাখা হবে, সে অংশের ওজনে মাল ঢোকাতে হবে। এর চেয়ে এক ছটাক বেশী বা কম যেন না হয়। কম বেশী হলে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে।)

ঃ ভালই বুদ্ধি এঁটেছেন। এভাবে আশা করি কোন ধরনের অসুবিধা হবে না। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।

অতঃপর আমার নিকট অস্ত্রসস্ত্র ও গোলাবারুদ, ও বোমার একটি তালিকা চাইল। আমি আমার প্রয়োজনীয় ছামানার একটি লিষ্ট তার হতে দিয়ে বললাম, এসবগুলোরই দরকার তবে কেমিক্যাল জাতীয় মালামালের চাহিদা খুবই বেশী। আর গ্রেনেড, ডিনামাইট এগুলোর । বাদবাকি অস্ত্রগুলো যদি আনতে পারেন, তবে ভাল হয়। অতঃপর আমার কাছে একজন লোক চাইলেন। আমি পাইলট সুরাসিকুকে ডলীর সাথে দিয়ে দিলাম। পর দিন ওরা মোলদাভিয়া চলে গেল। আমার পরামর্শ অনুযায়ী লিষ্টি ভুক্ত মালামাল সংগ্রহ করল। কিন্তু এ.ঘ.এ.ও.ক.ঈ.খ.ঙ/ ৩ বারুদ পর্যাপ্ত পরিমাণ পেল না। যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছে, সবগুলো ফ্রিজের খোসার ভিতর ভরে রেলষ্টেশনে বুকিং দিয়ে উভয়ে চলে এল। আমি

তাদের সাহসিকতা দেখে অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলাম ।

৫ দিন পর মস্কো ষ্টেশন থেকে টেলিফোন আসল ফ্রিজ বুঝে নেয়ার জন্য । কেনিডলী তার পিকাপ পাঠিয়ে দিল । ষ্টেশনের গোডাউন থেকে মাল খালাস করে হোটেলে নিয়ে এল । গভীর রজনীতে আমি সুরাসিকুকে নিয়ে সব মাল বের করে দেখলাম । সেখানে দুই তরুণীও ছিল । পাইলট আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, খোবায়েব ভাই, কেমিক্যালগুলো দ্বারা কি করবেন ? এগুলোর ফাংশন বোঝেন বলে মনে হয় ? উত্তরে বললাম, তেমন বুঝি না, তবে ঠেকায় কাজ চালাতে পারি । তিনি বললেন, ঠিক আছে আপনার প্রযুক্তি আপনি কাজে লাগান । আমারও কিছু প্রযুক্তি আছে আমি তা কাজে লাগাব । আমি তার কথা শুনে খুবই বিস্মিত হলাম । ভাবলাম, আরো একটি শক্তি আমাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে । এখন থেকে আমরা পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর জন্য গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলাম ।

এক সপ্তাহ পর মাইকিং হচ্ছে, মস্কো ষ্টেডিয়ামে কমিউনিষ্টদের জাতীয় জনসভা । উক্ত জনসভায় লেনিনসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করবেন । পুরো মস্কো নগরী প্রচার অভিযানে মুখরিত । কার পাতা ছিল মুশকিল । শহরে যতগুলো মাইক চলছিল, সবগুলোই আমাদের কমরেড মাইক সার্ভিসের মাইক । উক্ত জনসভা চালানোর জন্য আমাদের মাইকই ভাড়া করেছিলেন কমরেড নেতাজিরা ।

১০ নভেম্বরের জাতীয় বিশাল জনসভার কামিয়াবীর জন্য কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন আহবান করা হল মাওসেতুং হলে । তাদের এসব প্রোগ্রামের খবর পেয়ে আমি মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী, কমান্ডার আলায়েভ ও ফাগুদায়েভকে ডেকে পঠালাম আমার নির্জন কুটিরে । সাথে রাখলাম, পাইলট সুরাসিকু, জমিলিনা ও কেনিডলিকে ।

গভীর রাত । সারা দুনিয়া ঘুমের কোলে ডলে পড়েছে । নীরব নিথর রজনী । আমরা রুদ্ধদ্বারে বসে গেলাম পরামর্শে । ১০ ই নভেম্বরের জনসভা ও কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনকে পন্ড করার জন্য পরামর্শ চাইলাম । মাওলানা বললেন "কর্মী সম্মেলনে আত্মঘাতী হামলা করা যেতে পারে । ৫ জন সাথী একেবারে বেচইন হয়ে গেছে । এদেরকে কাজ না দিলে ওরা চলে যাবে । এত দিন বসে বসে থাকার কারণে আমাদের প্রতি অনীহা ভাব এসে

গেছে । তারা আত্মঘাতী আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত । এখন এদের ব্যাপারে আগে ফায়সালা করুন, তার পর অন্য বিষয়ের আলোচনা ।
জিজ্ঞাসা করল,কর্মী সম্মেলনে কতজন লোক লাগবে, তার একটা সংখ্যা আমাকে দিলে আমি কিছু পরামর্শ দিতে পারব । কমান্ডার ফাগুদায়েভ জিজ্ঞাসা করলেন, হলরুমটি কত বড় হবে তা জানতে পারলে কতজন লোক লাগবে তা বলা যাবে । জমিলিনা বললো, উক্ত হলে আমরা প্রায় দুশ লোক নিয়ে মিটিং করেছি । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি দুশ লোক হবে ?

জমিলিনা ঃ না দুশ লোক হবে না-উর্দ্ধে একশজন হতে পারে । ১০ তারিখের সভার কামিয়াবীর জন্য এমিটিং । এখানে কেন্দ্রীয় দু-তিনজন নেতা থাকবেন । বাকি সাথীরা শুধু মহানগরীর ।

ঃ যদি একশ লোক হয়, তবে একজনই যথেষ্ট, তবে প্রোগ্রাম যেন একশ একশ কামিয়াব হয়, সে জন্য আমার ইচ্ছা দুজনকে পাঠাব ।

মাওলানা ঃ হ্যাঁ, আমারও খেয়াল এমনই । দুজন হলে প্রোগ্রাম মিস হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।

তার পর আমি বললাম, যে দুজনকে পাঠানো হবে, তারা কাস্তে-হাতুড়ী মার্কা নিশান হোন্ডায় উড়াবে, গায়েও পরবে কাস্তে-হাতুড়ী মার্কা গেঞ্জি । প্রত্যেকের সাথে থাকবে হ্যান্ডবেগ । ওরা হলে প্রবেশ করে বিপরীত দিকে অর্থাৎ দুজন দুদিকে বসবে । মিটিং আরম্ভ হওয়ার সামান্য পরে দুজন একসাথে গ্রেনেড চার্চ করবে । নেতারা বক্তৃতার পর পর যখন হাততালি বাজিয়ে মঞ্চ গরম করে তোলে এরই ফাঁকে ওরা কাজ শেষ করবে । আমার পরামর্শে সবাই একাত্মতা প্রকাশ করলেন । মাওলানা দুজনের নাম পেশ করলে আমি তাদেরকেই নির্বাচন করলাম ।

মিস জমিলিনা ঃ আত্মঘাতির জন্য যদি আপনাদের ৫ জন থেকে থাকেন, তা হলে সম্মেলনে যাবেন দুজন আর বাকি থাকবেন তিনজন । এ তিনজনকে তিন জায়গায় পাঠাতে পারেন । যদি আপনারা বলেন, তা হলে তার ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারব ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে প্রোগ্রাম কি ধরনের তা যদি বলতে পারেন, তা হলে বিবেচনা করে দেখব দেয়া যায় কিনা । উত্তরে সে বলল, আমি তিনজন নেতার বাসায় তিনজনকে পাঠাব । এ তিনজনই হলেন লেনিনের বন্ধু, কমিউনিজমের উচুঁ পর্যায়ের নেতা । আমি তাদেরকে

টেলিফোনে বলব, আগামী কাল সকাল ৯ টায় আপনার বাসায় আসব। জরুরী পরামর্শ আছে। তখন সবাই ৯ টায় নিজ নিজ বাসায় অপেক্ষা করবেন। কারণ, আমার প্রতি সবাই খুব আস্থাশীল। আমাকে ওরা অন্য নজরে দেখেন। আমাকে তারা কেন্দ্রীয় মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকার দায়িত্ব দিতে চেয়েছেন। আমি তা বারবারই প্রত্যাখ্যান করেছি। যদিও দায়িত্ব নেইনি, কিন্তু তাদের সাথে সমানতালেই রাজনীতি করে যাচ্ছি। তাই তাঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

আমি চিন্তা করে দেখলাম, প্রস্তাবটা খুবই সুন্দর। অন্যরাও তা সমর্থন করলেন। কমান্ডার আলায়েভ বললেন, তাহলে তো আরো দুটি হোন্ডা প্রয়োজন হবে। কেনিডলি বলল, তা দেয়া যাবে। সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে জমিলিনা বলল " এতিনজন কেউ কর্মী সম্মেলনে যাবেন না। কর্মী সম্মেল বসবে বিকাল ৮ টায়। সম্মেলন চলবে দু থেকে তিন ঘন্টা। সবাই যদি ৯ টায় কাজ করে, তবে এক সাথেই ৪ জায়গায় কাজ হয়ে যাবে। এতে সারা দেশে বিরাট আতংক ছড়িয়ে পড়বে।

আমরা সবাই এপরামর্শে একমত হয়ে গেলাম। তার পর ৫ জন মুজাহিদ সাথীকে ডেকে এনে তাদের কাজ খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলাম এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দিলাম। অতঃপর মিটিং-এর দিন সকালে সবাই গোসল করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করলাম। তার পর সাথীদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। আমরা তাদেরকে বিদায় জানিয়ে সেজদায় পড়ে রইলাম। ঠিক নয়টার সময় একযোগে ৪ জায়গায় বিস্ফোরণ হয়ে গেল। সকাল ১০ টায় রেডিও মস্কো থেকে খবরে বলা হল এমর্মান্তিক হামলার কথা। সারা দেশে হৈ চৈ পড়ে গেল। মিটিং এ নিহত হল ১শ ৫জন। কেউ বাঁচতে পারেনি। আর তিন বাসায় নিহত হল ৩ জন নেতা সহ ৮ জন। আমরা আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করলাম।

নয়

এত দিন পরে আবারও হামলা ! আবার ও সংঘাত ! বলসেবিকদের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত ! এমন সময় আক্রমণ আসল, যখন সারাদেশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে, সারা দেশে আমাদেরই বিজয় নিশান তোরণে-তোরণে, আকাশে-বাতাসে পতপত করে উড়ছিল। যখন মুজাহিদদের যাবতীয় তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছিল। তাহলে এবর্বরোচিত হামলা কাদের পক্ষ থেকে ? কে করল এ আক্রমণ ? এপ্রশ্নগুলো ছিল কমিউনিষ্ট স্রষ্টা স্বয়ং লেনিনের। লেনিন বর্তমানে পাগলপ্রায়। আর মাত্র ৫ দিন বাকি জাতীয় সম্মেলনের। যে সম্মেলনে চূড়ান্ত বিজয়ের ঘোষণা দেয়া হবে তারই ৫ দিন আগে এই হত্যাকান্ড। তাহলে কি ঘাতক আমাদের ভিতরে ঢুকে পড়েছে ? ঘাতক কি আমাদের কেউ ? আর কত চিন্তা লেনিনের মাথায় হাজির হয়ে কুরে কুরে মগজ খাচ্ছিল, তার ইয়ত্তা নেই। লেনিনের ঘুম, আরাম-আয়েশ, খাওয়া-দাওয়া সবই হারাম হয়ে গেল। তার প্রশ্নের উত্তর কোথাও পাচ্ছিল না একজন উম্মাদের মত দিন কাটাতে লাগল লেনিন। এখন সে আপনজনদেরেও বিশ্বাস করতে পারছে না। সর্বত্র দেখা দিল অন্তর্দ্বন্ধ। লেনিন মনে করলেন, ১০ তারিখের জাতিয় কনফারেন্স বাতিল করার জন্যই এহামলা চালিয়েছে। তাই যে কোন মূল্যে সম্মেলন করতে হবে। সম্মেল করতে না পারলে সারা দেশে বদ আসর পড়বে। এ হামলার কারণে প্রচারাভিযান অনেকটা দুর্বল বা সিথিল হয়ে গেছে। এটাকে অবশ্যই জোরদার করতে হবে। হত্যাকান্ডে মর্মাহত মানুষের দৃষ্টি সম্মেলন মুখিকরে দিতে পারলে সব গন্ডগোলের অবসান ঘটবে।

এসব ভেবে-চিন্তে প্রচারাভিযানকে জোরদার করার জন্য প্রতিটি শহরে শহরে, হাটে-বাজারে, গ্রাম-গঞ্জে ব্যান্ড পার্টি নামিয়ে দিলেন। বাদ্যের তালে তালে দুলতে থাকল সারাটি দেশ। সে প্রচারাভিযানের স্লোগান ছিল–

ঃ-দুনিয়ার মজদুর –এক হও !
ঃ-কেউ খাবে তো কেউ খাবে না–তা হবে না, তা হবে না ।
ঃ-১০ তারিখের জনসভায় –যোগ দিন-যোগ দিন ।
ঃ-লেনিনের জনসভায় যোগ-দিন যোগ দিন ।
ঃ-সবার মুখে একই বাত–লেনিন বাদ লেনিন বাদ ।
ঃ-আমরা সবাই লেনিনসেনা–ভয় করি না বুলেট বোমা ।
ঃ-কমিউনিজম দিচ্ছে ডাক–মৌলবাদ নিপাত যাক ।

১০ তারিখের সম্মেলনের প্রচার হাজার গুণ বেশী বৃদ্ধি করলেন এবং রাত ৮ টায় লেনিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন । তিনি বললেন ।

(প্রিয় দেশবাসী ! আমরা যখন সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছি, বিজয় যখন আমাদের পদচুম্বন করেছে, সারা দেশে যখন আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, দেশবাসী যখন সাদরে কমিউনিজম মেনে নিয়েছে, ঠিক সে সময় এক কুচক্রী মহল আমাদের বিজয়কে অর্থাৎ জানগণের বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য এইঘৃণ্য তৎপরতা চালাচ্ছে । এরা জনগণের বন্ধু নয় । এরা দেশের ও জনগণের শত্রু । এদের ব্যপারে জনগণকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয়া গেল ।)

আজ যারা আমাদের মাঝে নেই, তাদের পারিবার-পরিজনকে ধৈর্যধারণ করে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া গেল। শোকার্ত পরিবারকে আমার সরকারের পক্ষ থেকে এক লক্ষ করে টাকা প্রদান করা হবে । তিনি আরো বলেন–

(প্রিয় দেশবাসী ! আমি জাতির সম্মুখে ওয়াদা করছি, যে ঘাতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। খুনের প্রতিশোধ নেয়া হবে। খুনীরা হয়ত আমাদের মাঝেই লুকিয়ে আছে। তা বের করতে হবে। কুচক্রী মহলের যাবতীয় দুরভিসন্ধি ধূলিসাৎ করে দেয়া হবে। প্রিয় দেশবাসী ! আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন, রুহানী বা মৌলবাদীদের দৌরাত্ব কতটুকু পৌছে গিয়েছিল, তা কিভাবে ঠান্ডা করা হয়েছে । তাদের পরিণাম আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন । মুজাহিদদের পরিণামও নিজ চোখে দেখেছেন । এসব কুচক্রী মহলের পরিণামও হবে অভিন্ন । প্রিয় দেশবাসী ! আগামী ১০ই নভেম্বর জনসভায় আপনারা দলে দলে যোগদানের মধ্য দিয়ে দুনিয়াবাসিকে জানিয়ে দিন আমরা কমিউনিষ্ট বিপ্লবের মধ্যদিয়ে বিজয় অর্জন করেছি। সারা দুনিয়ায় আমরা কমিউনিষ্ট বিপ্লবের

ঝড়োহাওয়া বইয়ে দিব। আমাদের অগ্রযাত্রা কেউ রোধ করতে পারবে না ।) লেনিনের ২০ মিনিটের বক্তব্যে রাজনীতি মহলোচাপা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অনেক নেতা, কর্মিরা ভাবছিলেন যে, লেনিন এর জন্য আমাদেরকেই সন্দেহ করছেন। যদি তাই হয়, তবে ঘাতক সাজতে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে সনদপত্র নেয়া লাগবে না। উস্তাদ লেনিনই এপাঠ পড়িয়েছেন । যদি সন্দেহই করেন, তাহলে আমরা সেপথই বেছে নেব ।

এদিকে মিঃ লেনিন বারবার জনসভায় অংশ গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তার দাওয়াত গ্রহণ না করাটা ছিল আমার জন্য শক্ত বেয়াদবী । কারণ, কমিউনিষ্ট পার্টির জন্মদাতা ও বিশ্বখ্যাত একজন নেতার আহবান লঙ্ঘন করা আমার মত নাগন্যের জন্য জায়েজ নয় । তাই সভায় অংশ গ্রহণের জন্য তৈরি নিতে লাগলাম ।

লেনিন চাচার জন সভায় খালি হাতে অংশ নেয়া ঠিক হবে না । তাই ৩০ ভোল্টে দুটি মাইকের ব্যটারী নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম । সেজন্য পাইলটকে ৩০ বোল্টের ব্যটারীর দুটি কাবার আনতে বললাম। কভার আনার সময় কোন মানুষ যেন নাদেখে সে নির্দেশ দিয়ে ছিলাম। পাইলট জানতে চাইলেন, ব্যটারীর কভার দ্বারা কি হবে ? আমি উত্তরে বললাম, লেনিন চাচা বক্তিমা (বক্তৃতা) দিতে গিয়ে যদি ফিউজ হয়ে যায় ব্যটারীর সাহায্যে চর্জ করা হবে । তাই আমরা খালি হাতে না গিয়ে ব্যাটারী নিয়ে যাব ।

১০ তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছিল ,নিরাপত্তা ততই জোরদার হচ্ছিল । প্রতিটি ষ্টেশনে ষ্টেশনে, সেনা মোতায়েন করা হয়েছে, যেন রেলপথে কোন অবৈধ অস্ত্র বহন করতে না পারে। তেমনি ভাবে নদী বন্ধরে ও বাসটারমিনালে,মোড়ে মোড়ে ও বিশেষ স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে ।

ইন্টেলিজেন্সের সদস্যরা অর্থাৎ গোয়েন্দারা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য নির্ণয়কযন্ত্র নিয়ে সর্বত্র টহল দিচ্ছে। এদিকে ঘোষণা দেয়া হল যাত্রীরা কোন ধরনের ব্যাগ বা লাগেজ বহন না করে। এ আইন ১২ তারিখ পযর্ন্ত বলবৎ থাকবে। তার পর স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে যাবে। তাদের নিরাপত্তা দেখে এমন মনে হচ্ছিল যে, স্বয়ং আজরাঈলও (আঃ) লেনিনের দেশে বিনা অনুমতিতে

ঢুকতে পারবে না। যদি ঢোকে, তাহলে গোয়েন্দা বা সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়বে। এমনই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন।

৮ তারিখ রাত ১১ টায় আমার ৫ জন সহযোগী মুজাহিদ ভাইকে হোটেল গার্ডেনে ডেকে আনলাম পরামর্শের জন্য। ১০ তারিখের সভা কামিয়াবীর জন্য সকলের কাছে পরামর্শ দিলেন। আমি বললাম, আত্মঘাতী হামলা করে যদি আমরা সবাই শহীদ হয়ে যাই, তা হলে পরবর্তীতে কে এগিয়ে আসবে জিহাদী পরচম হাতে নেয়ার জন্য?

মাওলানা বলখী ঃ আমি মনে করি আপনি থাকলেই পরবর্তীতে জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেন। আপনার একটি হাত শহীদ হয়েছে। আপনি মাজুর। আল্লাহর নিকট হাজির হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তখন আপনার হাতই সাক্ষ্য দেবে যে, আপনার পথে এহাতটি শহীদ হয়েছে । আমাদের এমন কোন চিহ্ন নেই। কাজেই আত্মঘাতি হামলার জন্য আমি এজাজত চাই। তাছাড়া এপ্রোগ্রাম কামিয়াব করতে হলে আত্মঘাতী হামলা ছাড়া আর বিকল্প নেই। এখন চিন্তা করে যে সিদ্ধান্ত দেবেন ,তাই আমরা মেনে নেব।

পাইলট সুরাসিকো ও ববিলড আত্মঘাতী হামলার কথা শুনে ঘাবড়িয়ে গেলেন। এটা কি করে সম্ভব হয়। তাই সুরাসিকো জিজ্ঞাসা করলেন যে, হুজুর ! আমরা তো ওয়াজ-নসিহতে শুনেছি আত্মহত্যাকারী জাহান্নামী। তাহলে আত্মঘাতী হামলাকি আত্মহত্যা নয় ? সুরাসিকোর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললাম, আপনার প্রশ্ন ঠিক। আত্মঘাতী হামলার সুরত আত্মহত্যার মতই। তবে আত্মঘাতী আর আত্মহত্যা দুটি এক জিনিস নয়। আত্মহত্যা আর আত্মঘাতির নিয়ত, কারণ ধরণ এক নয়। এর মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যবধান। আমি একটু খুলে বললেই তা আপনার কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে। তার পর বললাম

দেখুন পাইলট সাহেব ! আত্মহত্যার মধ্যে নিচের কারণ গুলো খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন (১) প্রেমে ব্যর্থ হয়ে (২) প্রিয় জন থেকে আঘাত পেলে (৩) ব্যবসা-বাণিজ্যে ধরা খেলে (৪) রোগ, ব্যাধিতেতে কষ্ট করলে। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু কারণে তা করতে পারে। বালা-মছিবতে ধৈর্য্য ধরতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে সে ধৈর্যহারা হয়ে সীমালঙ্গন করেছে। আল্লাহ তাআলা সমস্ত অসুবিধা দূর করতে পারেন তা

ভুলে গিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। অর্থাৎ ঈমানহারা হওয়ার পর সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। একারণেই সে জাহান্নামী।

আর আত্মঘাতি হামলা এমনটি নয়। এখানে আল্লাহর দুশমনকে হত্যা করা, শাহাদাত লাভ করা এবং আল্লাহর যমিনে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা এগুলো থাকে তার নিয়ত। কাজেই আত্মহত্যা আর আত্মঘাতিকে এক নজরে দেখলে অবিচার হবে। ঠিক হবে না। তাছাড়া মুতার অভিযানকেও দলিল হিসাবে পেশ করা যেতে পারে। যেমন ,আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) তৎকালীন পৃথিবীর পরাশক্তি রোম সম্রাটের ৪ লক্ষ সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেরায় ৩ হাজার মুজাহিদকে প্রেরণ করেছিলেন। এখানে দেখার বিষয় হল, অস্ত্রবল, জনবল ও কলাকৌশল কোনটিরই সমস্যা ছিলনা। এ বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র তিনহাজার সৈন্য প্রেরণ থেকে বিরত থাকেননি। মুতার অভিযান সংগঠিত হয়েছিল হুজুর (সাঃ) এর দূতকে হত্যা করার কারণে। একজন মুসলমান হত্যার বদলা নিতে গিয়ে হযরত জায়েদ বিন হারিছা (রাঃ) হযরত জাফর (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাসহ অনেক জলিলুল কদর সাহাবা প্রাণ দিয়েছেন। আর শহীদ হলে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া যায়। তাই সবাই আত্মঘাতী হামলাকে বেছে নিয়ে ছে। এব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি তা জানতে চাই। আমার প্রশ্নের উত্তরে পাইলট ববিলড বললেন, " আমার খেয়াল হল বেঁচে থেকে আরো জিহাদ করা। একথায় সুরসিকোও একমত পোষণ করলেন।

আমি দুজনকে বাদ রেখে ৩ জন দ্বারা একটি গ্রুপ রচনা করে বললাম, প্রিয়বন্ধুরা ! মাইকের ব্যাটারীর খোসা দুটি মাইক নেয়ার সময় সাথে করে নিয়ে যাবে। তার পর রাখবে মঞ্চের নিচে। এতে কেউ এটাকে বোমা বলে ধরণা করবে না। এর মধ্যে এমন বস্তু রয়েছে, যার দ্বারা কোন বিষ্ফোরক নির্ণয় যন্ত্রও তা ধরতে পারবে না। দুজনে দুটি বোমা অন্য ব্যাটারীর সাথে সংযোগ দিয়ে কাটাবে। একজন গ্রেনেড নিয়ে দু-তিনশ মিটার দুরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার কাছ দিয়ে কোন গোয়েন্দা গেলেই বুঝতে পারবে তোমার নিকট গ্রেনেড আছে। তখন তুমি একটু চিল্লা করলে আরো গোয়েন্দা ও আর্মীরা তোমার নিট ছুটে আসবে। তখনই তুমি তা ব্রাষ্ট করে দিবে। এতে যে কয় জন খতম হয় সে কয়জনই শেষ হবে। এভাবে সব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তাদেরকে বিদায় দিলাম। ওরা চলে গেল।

পাইলটদ্বয় মিনতি সহকারে বললেন," হুজুর ! জিহাদী কার্যক্রম আপাতত বন্ধ হয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, আপনার হাতে আর কোন মুজাহিদ নেই। সবাই জান্নাতে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। অতএব আমাদেরকেও একটি দায়িত্ব দেন যেন আমরাও শাহাদাতের মর্যাদা পেতে পারি। তারা কি করবেন, তা জানতে চাইলে বললেন লেনিনের গাড়ীর নিচে বোমসহ পড়ে যাব। দীর্ঘ আলোচনা পর এদায়িত্ব দু জনকে দেয়া হল।

দশ তারিখের ভোর হতেই চলছে সভার আরো আয়োজন। ব্যাটারী মঞ্চের নিচে ফিট করা হল। ছাও নেতা ও পাতি নেতারা ভাষণ দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ষ্টেডিয়াম জনসমুদ্রে পরিণত হল। তিল রাখার জায়গা টুকু নেই। নিচের দিক থেকে আরম্ভ করে আস্তে আস্তে উপরের বক্তাদের দিকে যেতে লাগল। লেনিন এখনো এসে পৌছাননি।

পাইলট দুজন বোম নিয়ে লেনিন আসার পথে দাঁড়ানো ছিলেন। লেনিনের গাড়ী বহর আস্তে আস্তে আসতে লাগল। কোন গাড়ীটি লেনিনের, তারা অনেক পূর্ব থেকেই জানত। আজ গাড়ী পরিবর্তন করে আসছে। তাই একটি গাড়ীর নিচে বোমসহ পড়ে গেল। আস্ত গাড়ীটি উড়ে গেল বটে, কিন্তু লেনিন সামান্য আহত হয়ে হাসপাতালে চলে গেলেন চিকিৎসার জন্য। এসংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে সভা পন্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল।। তখন তিনজন এক সাথে সব কয়টি বোমা ফাটিয়ে দিল। সাথে সাথে মঞ্চটি উড়ে গেল। মঞ্চে ও আশপাশের লোকজনের কোন চিহ্ন রইল না। এতে কেন্দ্রীয় ৮/১০ জন নেতাসহ প্রায় ৬৮ জন নেতা নিহত হল। আহত হল প্রায় দুশ। এদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। এ আক্রমণে বলসেবিকদের মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙ্গে গিয়েছিল। সার দেশে আতংক বিরাজ করছিল। কড়া নিরাপত্তার ভিতর দিয়ে লেনিনের চিকিৎসা চলতে লাগল।

দশ

হোটেল গার্ডেনের ভি,আই, পি, প্লাজার পরিচালক ব্রাহীম লুসী ছিলেন গোয়েন্দ দের সোর্স। হোটেল গার্ডেনে কারা যাওয়া আসা করে, কত দিন থাকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে গোয়েন্দাদের নিকট পাচার করতেন। গোয়েন্দারা তাবে দিত মোটা অংকের ভাতা। এটা হোটেল মালিক কেনিডলী জানতেন। আমি হোটেলে উঠার পরই আমার প্রতি নজরদারী করতে লাগল। তাছাড়া আরো একটি সন্দেহ তার অন্তরে দানা বেঁধে ছিল যে, হোটেল গার্ডেনের সমস্ত হুর-গেলমানদের নিষেধ ছিল আমার এখানে যাওয়া। এখানে মেহমানরা আসতই এসব খাদিম-খাদিমাদেরকে পাওয়ার জন্য। আমাকে পেল তার ব্যতিক্রম। তাই ম্যানেজার সাহেব আমাকে রুহানী হিসাবে মনে করতে লাগল।

এদিকে পাইলট যখন ব্যাটারী নিয়ে আসছিল, তখন তিনি দেখে জিজ্ঞাসা করছিলেন ব্যাটারী দিয়ে কি করা হবে ? আমি ও তার চাহনী দেখেই অনুমান করছিলাম যে সে একজন চর।

আমার এখানে যতবারই লোকজন আসছে, তিনি ততবারই খবর রাখতেন। আমার সাথে মাঝে-মধ্যে আলাপও হয়েছে তাঁর। আমার সাথে আলাপ করার সময় তিনি আমার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করতেন গোয়েন্দাদের যে সব ছিফাত থাকে, তার সব কিছুই তাঁর মধ্যে পেয়েছি। তিনি যেমন আমার গতিবিধি লক্ষ্য করতেন, আমিও তাঁকে ছেড়ে দেইনি। ১০ তারিখের প্রোগ্রামের দুদিন আগে অতিরিক্ত মালামাল জনিলিনার তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তা তিনি জানতেন না। ফ্রিজের কভার দুটিও এখান থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ১০ তারিখের ভোরে আমি হোটেল ত্যাগ করে শহরের অপর প্রান্তে এক সাধারণ হোটেলে চলে গিয়েছিলাম। এটা মিস জমিলিনা ও কেনিডলীও জানত না। পরে টেলি ফোনে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার এখানে যে কোন মুহূর্তে তল্লাশী হতে

পারে। চরম মুহূর্ত আসার পূর্বেই আমাকে আমি হেফাজত করেছি। আপনারাও খুব সতর্ক থাকবেন। আপনার ম্যানেজারের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু তেমন ভাল নয়। মনে হয় তিনি গোয়েন্দাদের উচ্চপর্যায়ের সোর্স। ১২ তারিখে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে।

১০ তারিখের প্রোগ্রাম সাকসেস হওয়ার পর গোয়েন্দারা পাগল হয়ে গেল। এ আক্রমণ কে বা কারা করেছে, কোত্থেকে এ আক্রমণ আসল, তা নিয়ে চলছে খোঁজাখুঁজি। পাইকারীহারে নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তারের বাকি রাখেনি। সমস্ত আবাসিক হোটেলগুলোতে এক সপ্তাহ যাবত কারা ছিল, সে সব ডাটা সংগ্রহ করতে লাগলেন। আমি তা জানতে পেরে এই হোটেলও ত্যাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। অযথা ঘোরাফেরা করা নিরাপদ মনে না করে সান প্রোডাকসের কিছু সামগ্রী খরিদ করে ফেরি করতে লাগলাম। এর মধ্যে ছিল বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বিভিন্ন দেশের ছিনারী,মানচিত্র, পকেট ডাইরী ইত্যাদি। মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বিক্রি করি, আবার বাসায় বাসায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করি। এক লোক তিনবার তিন জায়গা থেকে আমার নিকট থেকে সওদা খরিদ করেছিল। তখনই আমি বুঝতে পারলাম, আমার পিছনে লোক লেগে গেছে। এশহরে থাকা আমার জন্য নিরাপদ নয়। তাই অন্য অঞ্চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। জামিলিনা ও কেনিডলীর সাথে সাক্ষাত করা ছিল খুবই জরুরী। পথে-ঘাটে সাক্ষাত করা তো যাবেই না। তা হলে কি করা যায়।

আমি তাদের ঠিকানামত বিকাল বেলায় বাসায় চলে গেলাম। দ্বার রক্ষী আমাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। দুতলা থেকে জমিলিনা আমাকে দেখে চিনে ফেলল। সে লোক পাঠিয়ে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। খবর পেয়ে কেনিডলীও চলে আসল। সব হাল-হকিকত তাদের নিকট থেকে জানতে চাইলে জমিলিনা বলল " ভাইজান ! আপনি হোটেল গার্ডেন ত্যাগ করে আসা খুবই উপকার হয়েছে। সেখানে ভি,আই,পি, প্লাজা তন্নতন্ন করে তালাশ করেছে। আজ আবার কমরেড মাইক সার্ভিসের দোকানে পুলিশ তালা লাগিয়েছে। সে কয়জনকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সভামঞ্চ এখন পুলিশি বেষ্টনিতে রয়েছে। অনেক আলামত উদ্ধার করেছে। সে আরো বলল,এই নাজুক পরিস্থিতিতে মস্কোতে অবস্থান করা আপনার জন্য নিরাপদ মনে করি না। এখানে থেকে আর

কোন অপারেশনও করতে পারবেন না। কারণ, আপনার হাতে যারা ছিল, তারা সবাই শহীদ হয়ে গিয়েছে। কখন কি দাঁড়ায় কিছুই বলা যায় না। কাজেই আপনাকে এখানে রেখে বিপদে ফেলতে চাই না। দু-এক দিনের মধ্যেই আপনাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি কোথায় যাবেন, তা আগে ঠিক করুন, তার পর আমরা কিভাবে আপনাকে নিরাপদে পৌছাব, তা নিয়ে পরামর্শ করব। আমি বললাম, আমাকে কাজাকিস্তানে পাঠিয়ে দাও। আমার জন্মভূমিতে গিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করব।

ঃ একি বললেন ভাইজান ! বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছেন ? একজন মুজাহিদ এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লে হয় ? আপনার চিন্তা ত্যাগ করুন।

ঃ কি করব বোন বল ? আমার একটি হাত নেই, অস্ত্র চালাতে পারি না। সঙ্গি-সাথী যারা ছিল, সবাই এক এক করে শাহাদাতের আমীয় সুধা পান করে জান্নাতে চলে গেছেন। এখন কাকে নিয়ে জিহাদ করব ? জিহাদ যদি না-ই করতে পারি, তবে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয় মনে করি।

ঃ আপনি নিরাশ হবেন না। শেষ পর্যন্ত আপনার চেষ্টা চালিয়ে যান। দেখেন, আরো কিছু লোক জোগাড় করতে পারেন কি না। যদি পারেন, তবে আবার এধরনের হামলা করবেন। বলসেবিকদেরকে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে থাকতে দিবেন না। টাকা-পয়সার জন্য মোটেই চিন্তা করবে না। আমরা শহীদ পরিবারকেও গোপনে নিয়মিত ভাতা দিয়ে যাব। আপনি সামনে অগ্রসর হোন।

সে আমাকে এধরনের অভয় দিয়ে বলল, মিষ্টার লেনিন বর্তমানে হাসপাতালে আছেন। গতকল্য তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। গুরুতর জখমি না হলেও ১৫ দিনের আগে হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারবেন না। আমি আপনাকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে যাব। সেখানে আমি আপনাকে আমার বয়ফ্রেন্ড হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেব। আপনি লেনিনকে দেখে তার হাতে ও কপালে চুমো খাবেন। বড় কোন নেতার সাথে সাক্ষাত হলে এমনটি করতে হয়। আপনার বিবেক এতে বাধা দিবে তা আমি জানি। কিন্তু দ্বীনের বৃহৎ সার্থে তা করতে কসুর করবেন না। লেনিনের পার্শ্বে দেখবেন অনেক নেতা-নেত্রীরা ভীড় করে আছেন। আপনিও হবেন এমন একজন সদস্য। এসব নেতা-নেত্রীর সাথে যদি আপনার ছবি থাকে,

তাহলে কোন বিপদই আসতে পারবে না। যদিও আসে, তখন ছবিগুলো দেখাবেন যে এই দেখুন আমি একজন কমিউনিষ্ট নেতা। লেনিন সাথে ও কেন্দ্রীয় নেতা কর্মীদের সাথে আমার উঠাবসা। তখন কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না। আমি চিন্তা করে দেখলাম, সে মূল্যবান উপদেশই দিয়েছে, তাই আর কথা সামনে না বাড়িয়ে মেনে নিলাম।

কেনিডলীর পেটে পেটে ছিল শয়তানী বুদ্ধি। সে হাসতে হাসতে বলল ,আরে হকার ভাই, তোমার পসারী তো লুট হয়ে যাবে ! তোমার কাছে কি তাবিজ-কবজও আছে, না শুধু ক্যালেন্ডারই বিক্রি কর ? আমি বললাম তাবিজ-কবজ না থাকলেও ঝাড়ফুঁক দিতে পারি, বলুন কি সমস্যা আপনার ?

ঃ পোষা পাখী খাঁচা ভেঙ্গে পালিয়ে গেলে তাকে খাঁচায় আনার উপায় কি ?

ঃ পাখা বিশিষ্ট থাকলে আনা যাবে,নচেৎ না।

ঃ তুমি বড্ড চালাক আদমী।

ঃ চালাক ছাড়া কি কবিরাজী করা যায় ?

ঃ ভাই তোমাকে রাখা যাবে না তা জানি । তবে মাঝে-মধ্যে , খোজখবর নিও। আমাদের সাধ্যানুযায়ী তোমাকে সাহায্য করব আমাদের সাধ্যানুযায়ী।

এই বলে কেনিডলী ওঘর থেকে কমরেডী পোশাক এনে আমাকে পরতে দিল। আমি সাধারণ পোশাক খুলে সেই পোশাক পরে নিলাম। তার পর একই গাড়ীতে চড়ে হাসপাতালে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি নিরাপত্তার অভাব নেই। কত সাংবাদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত নেতা খেতারা ভীড় জমিয়ে আছে। আমাদের গাড়ী দেখে কেউ আটকাল না, রাস্তা ছেড়ে দিল। আমরা সরাসরি লেনিনের কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে আরো তিনজন উচ্চপদস্থ নেতা ছিলেন। আমরা পরিকল্পিতভাবে সম্মান প্রদর্শন করলাম। জমিলিনা ও কেনিডলী যে লেনিনের এত কাছের লোক তা আগে এতটুকু বুঝতে পারিনি। এদুজনকে পেয়ে লেনিনের রোগ যেন অর্ধেক ভাল হয়ে গেল। তিনি নিজ হাতে আমাদেরকে ফল খেতে দিলেন। আমরা খেতে লাগলাম। ডলী ও জমিলিনা নিজেও খাচ্ছে আবার লেনিনের মুখেও তুলে দিচ্ছে। আমিও তা করলাম। এসব কর্মকান্ড ক্যামেরাবন্দি করা হচ্ছিল।

তাদের এত মাখামাখি ও কর্মকান্ডে তাদের চরিত্রের প্রতি আমার সন্দেহ সৃষ্টি হল। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খুবসম্ভব তাদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। তা না হয় এত মাখামাখি আর জানাজানি হল কিভাবে ! আল্লাহ হেদায়েতের মালিক। তাই আল্লাহর কাছে হেদায়েত চাইলাম।

দেখা-সাক্ষাতের পর আমরা চলে এলাম জমিলিনার বাসায়। এখানেই রাত্রিযাপন করলাম। ভোরে কেনিডলী ১০ লক্ষ টাকা এনে বলল " ভাইজান আমার এবিশাল সম্পদ অতিসত্বর নিয়ে যাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। জনগণের নিকট কোন সম্পদ থাকবে না। সব যদি রাষ্ট্র নিয়ে যায়, তবে আমার কিছুই করার থাকবে না। কাজেই দশ লক্ষ টাকা আপনাকে দেয় হল। আপনি তা দিয়ে আপনার এবং অন্যান্য সাথীদের জরুরত পুরা করবেন এবং জিহাদে খরচ করবেন। অথবা আপনি যা ভাল মনে করেন, তা-ই করবেন। আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কষ্ট না দিয়ে টাকাগুলো গ্রহণ করলাম। তার পর নাস্তা সেরে আমাকে নিয়ে গাড়ীতে চেপে বসল। গাড়ী আমাকে নিয়ে পাগলের মত চলল কাজাকিস্তানের দিকে। তারা ভোরনেস্ক, মোডভি, বলগোগ্রাদ, ওরালস্ক, আক তাইভস্ক, কাজালিনস্ক, কাজেল ও উরডা হয়ে ৩ দিনে কাজিকিস্তানের রাজধানী আলমাআতায় পৌছে দিয়ে চলে গেল। রাস্তায় বহুবার চেক হয়েছে, কিন্তু ছবিগুলো দেখে তারা সসম্মানে ছেড়ে দেয়।

আমি আমার জন্মভূমিতে প্রায় একমাস ঘোরাফেরা করি, কিন্তু কোন পরিচিত লোকের সন্ধান পাইনি। ৮/১০ বৎসরে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার পর আলমাআতা থেকে তাসকন্দ ও দুসানবে হয়ে আবার আফগানিস্তান চলে আসি। প্রথমে শরণার্থী শিবিরে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, নাদির শাহ তাদের নামে জমি বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। তারা বাড়ী-ঘর তৈরী করে চাষাবাদ করে সংসার চালাতে লাগল। আমাকে দেখে সবাই খুশী হলেন এবং সব হালাত জানতে চাইলেন। আমি আমার কারগুজারী বললে কেউ খুব খুশী হলেন আর কেউ খুব রোদন করলেন। আমি ৫ লক্ষ টাকা শহীদ পরিবারের মধ্যে বন্টন করে দিলাম।

তার পর আবার জিহাদের জন্য লোক তাশকিল করতে লাগলাম। কয়েক দিন চেষ্টা করে একজনকেও রাজি করাতে পারিনি। বরং ওরা তিরস্কার করে বলে "এপর্যন্ত যত লোক নিয়েছ, তাদের মধ্যে থেকে একজনকেও ফিরিয়ে আননি। মনে হয় তুমি একজন বলসেবিক এজেন্ট।

মুসলিম যুবকদেরকে জিহাদের কথা বলে নিয়ে যাও আর তাদেরকে হত্যা করো মুসলিম যুবকদের নিপাত করার মিশন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছ। কাজেই তোমকে আর বিশ্বাস করা যাবে না। তুমি অন্য চিন্তা কর। আর কত শত ভৎসনা, টিটকারী আর অভিসম্পাত শুনে সেখানে আর ঠিক থাকতে পারলাম না। তাই মাহমুদা ও হেলেনার খোঁজে আবার কাবুলের পথে পা বাড়ালাম।

এগার

বুকভরা ইষ্টাপত্তির আশা-আকাংখা নিয়ে কাবুলে প্রবেশ করলাম। আনন্দরা আমার হৃদয় সরোবরে সাঁতার কাটছিল। খুশির ঝড়োহাওয়ায় অন্তর রাজ্যের সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিল। স্নিগ্ধ সমীরণের মৃদুকম্পনে খুশীরা নাচছিল। কারণ, বহুকাল পরে রেখে যাওয়া প্রাণাধিকা কান্তাদ্বয়ের সাথে মিলিত হব। এত দিনে হয়ত ওরা আমার জন্য কান্নাকাটি করে ছবর দুদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়ত মনে করেছে, আমি শহীদ হয়ে গেছি। তাই আমার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

আবার আরো একটি বিষয় দিলে বার-বার উঁকি-ঝুঁকি মারছিল তাহল ,আমি যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসি, তখন মাহমুদা ছিল অন্তসত্তা। আল্লাহ যদি সন্তান দান করে থাকেন, তা হলে এত দিনে হয়ত বেশ বড় হয়ে গেছে। খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ি করে। হয়ত সুন্দর পায়জামা-পাঞ্জাবী ও টুপি পরে, ছোট পাদুকা পায়ে দিয়ে মহল্লার মক্তবে আসা-যাওয়া করে। পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধভাবে মধুর সুরে তিলাওয়াত করতে শিখেছে। ছেলে হলে নিশ্চয় নাম রেখেছে মুহাম্মদ বিন খোবায়েব। মুহাম্মদকে পেয়ে মাহমুদার অন্তর্জ্বালা অনেকটা লাঘব হয়েছে। মুহাম্মদকে আমার কোলে দিয়ে মাহমুদা আনন্দ উপভোগ করবে। আমি তাকে চুমো দেব।

মুহাম্মদ হয়ত সস্নেহে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ছোট্র ছোট্র ভাষায় মাকে সুধায়"আম্মু ! আম্মু ! আমার আব্বু কোথায় ? করিম, রহিম ও

সলিমদের তো আব্বু আছে। আমার আব্বু কি নেই ? তখন হয়ত মাহমুদা উড়নাঞ্চলে চেহারা ঢেকে অতিকষ্টে কান্না সংবরণ করে আদরের দুলালকে মিছামিছি বুঝ দেয়ার চেষ্টা করে। না হয় বলবে" বাবা ! তোমার আব্বু মুজাহিদ, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছেন। এদুনিয়াতে তোমার আব্বুকে আর পাবে না। তোমার আব্বুর সাথে দেখা হবে জান্নাতের পুষ্প কাননে, না হয় নির্ঝরিণীর অববাহিকায়। তুমিও বড় হয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হবে। এসব বলে মুহাম্মদের কচি মনে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এধরনের হাজারো চিন্তা আর হাজারো ভাবনা আমার হৃদয়াঙ্গিনায় ভীড় জমাতে লাগল। আশা আর নিরাশার দ্বন্ধ চলছে সমান তালে ।

কখনো নিরাশার কাদম্বিনী ঘনীভূত হয়ে আমার হৃদয়াকাশ হয়ে যায় ঘনান্ধকার। আবার আশার সাইমুম প্রবলবেগে বয়ে গিয়ে দূরীভূত করে দেয় সকল ঘনঘটা। তখন আনন্দতড়িৎ খেলে যায় চোখ ঝলসিয়ে।

আবার কখনো কখনো মনে পড়ে যে, আমি যখন বেশ্মাদারে উপনীত হয়ে বিধৃত কণ্ঠে ডাকব মাহমুদা ! অ-------মাহমুদা ! তোমার পলাতক তোমার সমীপে ফিরে এসেছে!ও গো হেলেনা ! তোমরা আখি মেলো ,দ্বার খুলো। চেয়ে দেখ কে এসেছে ! তখন ওরা চেনাচেনা সুর শুনে একে অপরকে সুধাবে কি গো ? এটা কার কণ্ঠস্বর ? অমন মধুমাখা সুরে এত দিন পর কে ডাকছে মাহমুদা আর হেলেনার নাম ধরে ? সত্যি কি তা হলে খোবায়েব এসেছে ? তখন ওরা দৌড়িয়ে এসে দ্বার উম্মুক্ত করে আমার দিকে বিস্ফারিত লোচনে তাকিয়ে থাকবে। তখন ওরা সবিস্ময়ে ও সমাসক্তে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলবে। হৃষিত হৃদয়ে আনন্দ হিল্লোলে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। আমি তখন প্রেমের উচ্ছ্বাসে উৎকণ্ঠিত হয়ে জড়িয়ে ধরব। তখন পুঞ্জিভূত বেদনাভান্ডে ঘটবে এক বিস্ফোরণ। হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে আমাকে জানাবে স্বাগতম। আহঃ তখন কি মজাটাই না হবে। তখন আনন্দের মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে জমাটবাঁধা সব বেদনা। আমাদের ভাগ্যাকাশে উদিত হবে এক নতুন চাঁদ। ইস্ ! কি মজা ! কি আনন্দ !

এসব হাজারো ভাবনা ভেবে, বুকভরা সাক্ষাতের অভিলাষ নিয়ে কাবুল নগরীতে প্রবেশ করলাম। শহরে ঢুকেই একটি টাংগা নিলাম, যেন দ্রুত গাড়ী পৌছা যায়। টাংগায় চেপে বসতেই উর্দ্ধশ্বাসে আমাকে নিয়ে চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টাংগা আমার বাড়ীর দক্ষিণের মোড়ে এসে দাঁড়াল। আমার গৃহাঙ্গিনায় টাংগা যেতে পারে না। তাই এখানেই নামতে হল। আমি টাংগার ভাড়া পরিশোধ করে গৃহাভিমুখে হাঁটতে লাগলাম। মাত্র কয়েকটি বাড়ী পার হলেই আমার দহলিজ। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখি, এ এলাকার বাড়ীঘরের কোন চিহ্ন নেই। বাইপাস সড়ক কেড়ে নিয়ে গেছে সব বাড়ী-ঘর। আশ-পাশের বাড়ীঘরগুলো নিজ নিজ ঐতিহ্য নিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। আর যে দিক দিয়ে সড়ক নির্মাণ করেছে, সে বাড়ীগুলো নেই। তার মধ্যে আমার বাড়ীও পড়েছে। পুরো আবাসিক এলাকা ঘুরে ঘুরে তাদের খোঁজ নিতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও পেলাম না। অবশেষে একজনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন " রাস্তায় যাদের বাড়ী পড়েছে তাদেরকে সরকার জায়গা-জমি ও বাড়ী-ঘরের মূল্য দিয়ে বিদায় করে দিয়েছেন। ওরা যার যার সুবিধামত জায়গা খরিদ করে বাড়ী-ঘর তৈরী করে সেখানে বসবাস করছেন। কেউ কেউ কাবুলেই রয়ে গেছেন, আবার কেউ কেউ অন্যান্য শহরে চলে গেছেন। কে কোথায় গিয়েছে, তা আমরা বলতে পারি না।

লোকটির কথা শুনে আমার চেতনা বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম। কি করব না করব তা ভেবে পাচ্ছি না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলাম। যেখানেই কোন ললনাকে বোরকা পরিহিতা অবস্থায় দেখি, সেখানে গিয়ে আনমনে হাঁটাচলা করি। দেখি প্রিয়তমা মাহমুদা ও হেলোনা কি না। বোরকা পরিহিতা অবস্থায় আমি না চিনলেও ওরা তো আমাকে চিনবে এবং কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে। এজন্যই ছিল আমার এ প্রয়াস। কিন্তু কোন মহিলাই আমাকে সুধায়নি।

প্রিয়জন হারানোর বেদনা বক্ষে বহন করে উন্মাদের মত অনুব্রত পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে ঘুরছিলাম। অথান্তরে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম। প্রথম ও দ্বিতীয় ছায়েমার শাহাদাতের শোক মুছতে না মুছতেই আবার মাহমুদা ও হেলেনার শোকে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। বিরহ অনলে যারা দগ্ধিভূত হয়নি, তারা ছাড়া কেউ এই মর্মযাতনা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। অভিসারের অভিলাষে অবিরত অধীর হয়ে তালাশ করছিলাম। কিন্তু কোথাও সন্ধান মিলেনি। অসঙ্গ জীবনের দিনগুলো আমার নিকট অলতসম মনে হচ্ছিল। আদ্যোপান্ত আমি বিরহ অনলে

দগ্ধিভুত হয়ে জীবন প্রদীপের যবনিকা টানব তা আমি কোন দিন ভাবতেও প্রস্তুত ছিলাম না।

অবলা দুটি সুন্দরী তরুণী। ওদের নেই আপনজন, নেই পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্নীয়-স্বজন। ওরা কি করে কোথায় থাকবে। প্রবাসী হিসাবে কে দেবে তাদেরকে একটু আশ্রয় শোকে দুঃখে কে দাঁড়াবে তাদের পাশে, তা ভেবে পাচ্ছি না। ওরাও কি আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, না কোথাও আশ্রয় নিয়েছে, এখনো বেঁচে আছে না ছায়েমার সাথী হয়ে গেছে তা কে জানে ? যে কোন একটি সংবাদ পেলে তো অবুঝ হৃদয়কে প্রবোধ মানানো যেত। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। নৈরাশ্যের পারাবারে হাবুডুবু খেয়ে খেয়ে দিনরাত খুঁজে বেড়াচ্ছি আর মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি।

প্রায় পনের দিন কাবুলে অবস্থান করার পর কাবুলের পথ-ঘাট আর দর-দালান আমার নিকট বিষাক্ত মনে হচ্ছিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে কাবুলকে আলবিদা জানিয়ে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমানোর পাক্কা এরাদা করলাম। কিন্তু কোথায় যাব এ প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আমার দিলি রুজহান ছিল পাকতিয়া শহরে যাওয়ার। কারণ, অনেকেই নাকি বাড়িঘরহারা হয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে যদি তাদের দেখা পাই। পরদিন কাবুলকে আলবিদা জানাবো এ সিদ্ধান্ত নিলাম। রাত যাপনের জন্য হোটেল খোদাদাদে গিয়ে উঠলাম। হোটেল খোদাদাদের ২য় তলায় ৩০নং কক্ষে আশ্রয় নিলাম।

এশার নামায সমাপন করে খানাপিনা সেরে অলিন্দে স্থাপিত ইজি চেয়ারে বসে আখবারে জং নামক পাক্ষিক পত্রিকা দেখছিলাম। পার্শ্বস্থিত ৩১ নং কক্ষের করিডোরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখি, একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে কি যেন ভাবছেন। মুখে বুক স্পর্শ দাড়ি। স্কন্ধপ্রলম্বিত ঝাকরা বাবরী। উন্নত ললাট ও সুঠাম দেহের অধিকারী। দেখতে অত্যন্ত সুন্দর সুপুরুষ। লোকটি আমার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন কিন্তু কিছুই বলছেন না।

খানিক পর আমি আমার আসন ত্যাগ করে কয়েক কদম এগিয়ে সালাম দিতেই তিনি উত্তর দিতে দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মুসাফাহা মুয়ানাকা করে পার্শ্বের চেয়ারে বসতে দিলেন। আমি তার হাল পুরুস্তি করে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই আপনার নাম কি? কি করেন? লোকটি আমার

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো আমাকে প্রশ্ন করল, আপনার পরিচয়টা আগে দিন।

ঃ আমার নাম আব্দুল্লাহ।

ঃ বাহ চমৎকার নামতো বাড়ি কোথায়?

ঃ আলমাআতার অন্তর্গত জাম্বুলে।

জাম্বুলের কথা শুনে লোকটি চমকে গেল। যেন তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল তার সর্বাঙ্গে। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে সন্ধানি আঁখি মেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। খানিক পর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আহা, জাম্বুলের এক গর্বীতা মাতার বীর সন্তান ছিলেন খোবায়েব জাম্বুলি। তিনি রাশিয়ায় দ্বীন প্রতিষ্ঠানের লক্ষে জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তাদানের উদ্দেশ্যে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কয়েক বৎসর যাবত জিহাদ পরিচালনা করে আসছিলেন। তার অভিযানে বলসেবিকগণ নাকানিচুবানি খেয়েছে যথেষ্ঠ। আজ অনেকদিন যাবত কোন হামলার সংবাদ পাচ্ছি না। জানি না আল্লাহ পাক তাকে শাহাদাতে উজমা দান করেছেন কিনা।

ভদ্রলোকটির আপসোস মিশ্রিত বাক্যালাপ শুনে তার পরিচয় জানতে আমার অন্তর আরো ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সুধালাম, হুজুর আপনি কি খোবায়েব জাম্বুলিকে দেখেছেন?

ঃ না তাকে দেখার মত সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি।

ঃ তাহলে তার জন্য এত পরিতাপ প্রকাশ করছেন যে।

তিনি ছিলেন অবিসাংবাদিত অক্লিব দুর্দান্ত নির্ভীক সিপাহসালার। তার সুনিপুণ ও সুনিশ্চিত অভিযান গুলো ছিল অব্যর্থ। তাঁর সুনাম বা সুখ্যাতি শুধু রাশিয়াই নয়,সমগ্র মুসলিম জাহানই অবগত। ইমাম শামেল ও আনোয়ার পাশার নাম উচ্চারণের পর পরই খুবায়েবের নাম উচ্চারণ করতে হয়। আজ দীর্ঘ দিন যাবত তাঁর অভিযানের কোন সংবাদ আমার কর্ন কুহরে প্রবেশ করেনি। দৈনিক আখবারের লোমহর্ষক বিস্ময়কর কাহিনী এখন আর শোনা যায় না। তাই মনে হয় তিনি আর বেঁচে নেই।

ভদ্রলোকটির কথা শুনে আমাকে আমি প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলাম কিন্তু বিবেক তাতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। কারণ, সে যদি একজন গোয়েন্দা হয়ে থাকে, তাহলে তো রক্ষা নেই। অগত্যা প্রকাশ হওয়ার তীব্র আগ্রহের ব্রেইক টেনে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলাম এবং জানতে চাইলাম, তিনি কে? তঁর পরিচয় জানার জন্য নিজেই গুপ্তচর সেজে গেলাম। আমি

অত্যন্ত সুললিত ও মার্জিত ভাষায় বললাম, জনাব! আমিও তারঁ কথা জনমুখে বহুবার শ্রবণ করেছি, কিন্তু সাক্ষাত হয়নি। তবে আমার ধারণামতে তিনি দেশ ও জাতির চরম ক্ষতিসাধন করেছেন।

সে আবার কেমন কথা? জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বললাম, খুবায়েব সাহেব অনেক আক্রমণ করেছেন তা ঠিক, কিন্তু এতে জনগণ তেমন সন্তুষ্ট ছিল না এবং উলামায়ে কেরামও সমর্থন করেননি। অতএব এটাকে আমরা জিহাদ বলতে পারি না আর যারা নিহত হয়েছেন, তাদেরকে শহীদ বলতে পারি না।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক অগ্নিশর্মা ধারণ করে বললেন ে, "আপনাকে আমি একজন মুসলমান হিসাবে মনে করেছিলাম। এখন দেখি আমার ধারণা ভূল। কারণ, যারা মসজিদ মাদরাসা ধ্বংস করেছে, মা বোনদের ইজ্জত হরণ করেছে, উলামা কেরামদের পাইকারিভাবে জবাই করেছে, দ্বীনদার মানুষদের কয়েদখানায় বন্দি করে রেখেছে, মুসলমানদের দোকানপাট লুট করেছে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করেছে, জোরপুর্বক কমিনিউজ মতবাদ চাপিয়ে দিচ্ছে তাদের সাথে লড়াই করা সকল মুসলমানের উপর ফরজ ও ঈমানি দায়িত্ব। কেউ মুজাহিদদের সমর্থন করুক চাই না করুক। এদের পক্ষে ফতোয়া দিক চাই না দিক। তারা ঈমানি দায়িত্ব পালন করছেন। আমিও এক সময় তাদের কাজ-কর্মকে সন্ত্রাস বলে বেড়াতাম, তাদেরকে গালমন্দ করতাম। তারপর যখন দেখলাম, বলসেবিকদের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করে নিরীহ আলেমদের উপর আসতে লাগল, তখনই আমার বুঝে আসল ওরা কোন দ্বীনদারকে ক্ষমা করবে না। আনোয়ার পাশা ও খুবায়েব জাম্বুলির জিহাদ আসল জিহাদ এতে কোন সন্দেহ নেই। অবশেষে আলেমগণ তাকে সত্যিকার অর্থে জিহাদ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেন–

আমাদের মাননীয় কমান্ডার যদি এখনও বেঁচে থাকতেন আর জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা পেতেন, তাহলে কমিউনিউজের কবর রচনা করে ইসলামের শাসন চালু করতেন এবং রাশিয়ার প্রতিটি ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেন, কিন্তু জনগণের সহযোগিতা না থাকার কারণে আল্লাহ তা চাননি। তিনি তাকে শহীদ করে নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন। তারপর তার উছিলায় খোবায়েবের দ্বারা হয়ত বাকিটা সমাধি হবে। কিন্তু দঃখের

বিষয়, তিনিও হয়ত শহীদ হয়ে গেছেন। কেননা, এখন আর কোন অভিযানের কথা শুনিনি।

ভদ্রলোকটির কথা থেকে আমি অনায়াসে বুঝতে পারলাম যে, তিনি একজন পাক্কা ঈমানদারকোন কপটতা বা বক্রতার লেশ মাত্র নেই। আমি আমার সুর পাল্টিয়ে বললাম, জনাব আপনি আমার নিকট অকপটে সব কথা বলে ফেললেন, আমি যদি গুপ্তচর হয়ে থাকি আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বললেন, আপনি কে যদিও তা না জানি; কিন্তু আপনার ললাটে সেজদার চিহ্ন প্রস্ফুটিত। একজন মুসলমান হওয়ার জন্য বাহ্যিক আলামত যা থাকার প্রয়োজন, তা আপনার মাঝে যথেষ্ঠ রয়েছে। তাই এসব বলতে দ্বিধাবোধ করিনি। অতঃপর বিনা দ্বিধায় তার নিকট আমার পরিচয় তুলে ধরলাম। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে আমার কথা গুলো শ্রবণ করলেন এবং মাঝে মাঝে আরো প্রশ্ন করে নিশ্চিত হলেন। আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন–

আমি জালাল দামালা গৌরানি। বুখারার অন্তর্গত গৌরানে আমার নিবাস। আমি ছিলাম হযরত আনোয়ার পাশার রাহঃ এর অনুগত সালার। তার অনেক সৈন্য নিহত করেছি। সর্বশেষ লড়াইয়ে আমার বেশ কজন মুজাহিদ শাহাদতবরণ করেন এবং ১২ জন মুজাহিদকে বন্দি করে নিয়ে যায়। আমি প্রাণের রক্ষা পেয়ে কোনরকম আফগানিস্স্তানে পালিয়ে আসি। ভেবেছিলাম, রিপুজি কলোনী থেকে কিছু যুবক সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তুলব এবং নতুন করে অভিযান চালিয়ে শত্রুদের হাত থেকে সাথীদের রক্ষা করব। দুঃখের বিষয়, আমার এ মিশন সফল হয়নি। কয়েক মাস চেষ্টা করেও কোন লোক জোগাড় করতে পারিনি। এখন কি করব না করব তা চিন্তা করে পাচ্ছি না। "উক্ত কথা গুলো বলার সময় তাঁর ভাবে আঁখিযুগল থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

আমি তাকে শান্তনা দেয়ার জন্য আমার হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম,দেখুন! হায়েনারা আমার হাতটিকে শহীদ করে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে। আমার দুজন স্ত্রীকে রেখে অভিযানে বেরিয়ে ছিলাম। এতে কেটে গেল বহু দিন। ফিরে এসে দেখি আমার বাসার উপর দিয়ে সরকার বাইপাশ রোড নির্মাণ করেছেণ। শুনেছি, যারা বাড়ীঘর, হারা হয়েছে–তারা নাকি অনেকেই পাকতিয়ার জায়গা-জমি খরিদ করে বাসস্থান তৈরী করেছে। তাই আমি আগামী কল্য প্রত্যুষেই পাকতিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

হয়ে যাব স্বজনদের খোঁজে। তা না হয় আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। ওদের চিন্তায় এখন আর স্থির থাকতে পারছি না।

আমার কথা শুনে জালাল দামলা গৌরানী বললেন "আপনার বেদনা মিশ্রিত জীবনকাহিনী সত্যিই বড় মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। আপনারাই সত্যিকার অর্থে নবী (সাঃ)এর খাঁটি উম্মত ও সাচ্চা মুজাহিদ। বর্তমান জামানায় এধরনের মানুষ,খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনাদের মত মানুষ আছে বিধায় এখনো সূর্য কিরণ বিলাচ্ছে, অগণিত তারকারা সুদূর অন্ত রিক্ষে মিটমিট করে জ্বলছে। পাখীরা সুমধুর সুরে গান গাইছে, নদীরা কল কল তানে বয়ে যাচ্ছে। এক কথায় সারা জাহান স্থির রয়েছে। তা না হয় অনেক আগেই মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়ে যেন। তবে আপনারা দ্বীনের জন্য কুরবানী পেশ করেছেন। আজীবন এধরনের কুরবানী পেশ করতেই হবে। তবে আমার আকুল আবেদন, আপনি আমাকে কিছু যুবকের ব্যবস্থা করে দিন। আমি তাদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সাথীদেরকে জালিমের নিষ্ঠুর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে ছিনিয়ে আনি।"

তার কথা শুনে আমার অন্তর ঘুরে গেল। আমি বললাম, আচ্ছা! আজ তো রাত অনেক হয়ে গেছে, এখন বিশ্রাম নিন। বাকি আলাপ আগামীকাল হবে এবং চুড়ান্ত সিদ্ধান্তও আগামী কল্য নেয়া হবে। এ বলে আমি আমার কক্ষে চলে গেলাম। তিনি অশ্রুসজল নয়নে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। অতঃপর রুমে এসে কিছুক্ষণ নামায পড়ে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করলাম যে, প্রভূ হে! তুমি আমার স্বজনদের হেফাজত কর। আর তুমিই একমাত্র হেফাযতকারী। এই পরদেশে তুমি ছাড়া আমাদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই। অতএব তুমিই আমাদেরকে সাহায্য কর। আর আমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা যদি দ্বীন ও জাতির জন্য কল্যাণকর হয়, তবে তা পালন করতে চোখের পানিতে জায়নামায সিক্ত করে বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম। গভীর রজনী। শুক্লাপক্ষের দ্বাদশী চাঁদ অস্ত গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। আঁধারে ডুবে আছে দশ দিক। তামাম জাহান কালো চাদরে ঢাকা। তুষ্ণীক বিরাজ করছে চার দিকে। আমি অঘুম নয়েনে শয্যাপরি এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি করছি। এক দিকে স্বজনহারা বেদনা, অপর দিকে নতুন আক্রমণের তীব্র বাসনা।

অন্তরে চলছে স্বজনহারা বেদনা আর নতুন আক্রমণের নেশার মারামারি। কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারছে না। কেউ পরাজিত করে জয় লাভ করল।

পরদিন প্রত্যুষ্যে গাত্রোত্থান করে ফজরের নামায আদায় করে, তিলাওয়াতে কালামে পাক শেষ করে সামান্য নাস্তা সেরে জনাব জালাল দামালা গৌরানী সাহেবের নিকট গিয়ে দেখি তিনি চবুতরায় এক কেদারায় উপবেশন অবস্থায় তিলাওয়াত করছেন। আমাকে দেখার সাথে সাথে কুরআন শরীফখানা যথাস্থানে রেখে সালাম-মুসাফাহা করে পার্শ্বের কেদারায় বসতে দিলেন। আমি আসন গ্রহণ করলে বললেন" কি ভাই খুবায়েব জাম্বুলী! আমার মিশনের কি চিন্তা করে এসেছেন?

ঃ চিন্তা করতে গেলে অন্তরে চিন্তার মেলা বসে যায়।

ঃ আমার অবস্থা এর চেয়ে ভিন্ন নয়। নাস্তা করেছেন তো?

ঃ হ্যাঁ, নাস্তা সেরে এসেছি।

ঃ আমি আপনাকে নিয়ে নাস্তা করব বলে এখনো খাইনি।

ঃ আহাঃ অনেক কষ্ট করেছেন। যান জলদি খেয়ে নিন।

ঃ চলুন এক সাথে মিলে নাস্তা করি।

ঃ না জনাব! আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়।

ঃ আপনি কিন্তু ফাঁকি দিলেন।

ঃ ফাঁকির কিছু নেই। আল্লাহ চাহেন ত এক সাথে থাকা-খাওয়ার অনেক সুযোগ পাব।

আমার কথা শুনে তিনি কয়েকবার উচ্চরবে আলহামুদু লিল্লাহ বলে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং বললেন "তা হলে আপনি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছেন তাই না খুবায়েব ভাই?

ঃ হ্যাঁ অনেকটা এমনই। আগে নাস্তা সেরে নিন তার পর বাকি আলাপ হবে।

অতঃপর জালাল দামালা গৌরানীকে বললাম, আশা করি কিছু যুবক পাওয়া যাবে কিন্তু তাদের রসদপত্রের ব্যবস্থা হবে কি ভাবে? অস্ত্র-সস্ত্র, গোলা-বারুদ, খাদ্য-ঔষধসহ অন্যান্য ছামানা যোগাড় কিভাবে হবে? প্রচুর অর্থ কোথায় পাব?

তিনি বললেন, ফান্ডে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আছে। এদিয়ে কাজ আরম্ভ করলে কিছু না কিছু গনিমত অবশ্যই হাতে আসবে। তা ছাড়া কোন উপায়

নেই। আমি বললাম, এঅর্থ দিয়ে এক সপ্তাহও লড়াই করা যাবে না। তবে আল্লাহর কালামের ভাষ্য অনুযায়ী তা দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। চলুন আমরা আগে লোক সংগ্রহ করি। তাদেরকে প্রশিক্ষণে লাগিয়ে দিয়ে অস্ত্রের ব্যবস্থা করি। পরামর্শ শেষে দুজন শরণার্থী শিবিরগুলোতে গিয়ে যুবকদেরকে বোঝাতে লাগলাম। প্রায় ১৫ দিন পর্যন্ত ওয়াজ-বক্তৃতা আর বয়ানের পর ২০ জন যুবক সংগহ করলাম।

এদেরকে আমি প্রথমে ১০/১৫ দিন শুধু মগজ ধোলাই করে তাদের অন্তরে জিহাদের আগ্রহ বা জযবা পয়দা করলাম। পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে জিহাদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, ও ফাজায়েল সম্পর্কে জ্ঞান দান করলাম। তার পর জালাল সাহেবকে লাগিয়ে দিলাম শারীরিক প্রশিক্ষণের জন্য। তিনি তাদেরকে পাহাড়ের পাদদেশে ট্রেনিং করাতে লাগলেন। আমি টাকা-পয়সা নিয়ে চলে গেলাম ছামানা সংগ্রহের জন্য।

আমি প্রথমেই চলে গেলাম আফগান অধিপতি জনাব নাদির শাহের নিকট। তাঁকে আমার নতুন পরিকল্পনার কথা জানালাম। তিনি খুটিয়ে খুটিয়ে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করে জানলেন। তার পর আমাদেরকে ২২টি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দ্রুতগামী অশ্ব দান করার ওয়াদা করলেন। আমি অশ্বগুলো নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরে পৌছে দিলাম। । পর্যাপ্ত গোলাবারুদ না থাকায় তা দিতে অস্বীকার করেন। আমি করজোড় নিবেদন করলাম যে, আপনি রাষ্ট্রীয় ভাবে গোলাবারুদ সংগ্রহ করে দেন। বর্তমান সময়ে এগুলো সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের ফান্ডে যে অর্থ জমা আছে, তা দিয়ে যা খরিদ করতে পারেন তাই ব্যবস্থা করে দিন। এ বলে ৩০ লক্ষ টাকার গাঠরীটা তার নিকট হস্তান্তর করলাম। তিনি তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে দিলেন।

দুদিন পর কাবুল শাহ্ সেনাপ্রধানকে রাজদরবারে তলব করে এনে বললেন "আপনাকে বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোতে সফর করে কিছু গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা সংগ্রহ করুন। সিপাহসালার শাহের কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন " আলমপানাহ! আশু আক্রমণের কোন ইংগিত পেয়েছেন কি?

ঃ কাবুলে আক্রমণ করার দুঃসাহস আপাতত দেখছি না। রাশিয়ার ছোট বড় রাজ্যগুলো বলসেবিকরা কব্জা করে নিয়েছে। (কামাল পাশাকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে পবিত্র জিহাদ থেকে ফিরিয়ে এনেছে)। (কামাল এখন

তুর্কমেনিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছে)। জার নিকুলাইকে পরাজিত করে বলসেবিকরা গোটা রাশিয়া দখল করে নিয়েছে। কাবুল বলসেবিকদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদেরকে সাহায্য দিয়েছে। তা তাদের অজানা নয়। এ হিসাবে ওরা প্রতিশোধ নিতে পারে। তাই আমাদের সতর্ক অবস্থায় থাকতে হবে। এজন্যই গোলাবারুদ এনে মজুদ রাখতে হবে। আপনি ইরান ও ইরাকে সফর করুন। ওদের সাথে সামরিক চুক্তি করুন এবং যুদ্ধের সরাঞ্জামাদি যোগাড় করুন।

নাদির শাহের নির্দেশে প্রধান সেনাপতি সরকারি সফরে বেরিয়ে গেলেন। সৌদি আরব,ইরাকসহ কয়েকটি রাষ্ট্র সফর করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি এসে বললেন, ইরান শাহের পক্ষ থেকে অস্ত্রসস্ত্র তিন মাসের মধ্যে নৌপথে আফগানিস্তানে এসে পৌছবে। সৌদি থেকে সামান্য আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গেছে। কিন্তু কখন এবং কি পরিমাণ দিবেন, তা স্পষ্ট নয়। দুত মারফত দু মাসের মধ্যে জানাবেন।

বার

অস্ত্র ও গোলাবারুদ তিন মাসের মধ্যে হাতে এসে পৌছবে বলে আশা করা যায়। অস্ত্র আসলেই যে হামলা করা যাবে এমন নয়। এর আগে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং মুজাহিদদেরকে কোন কারাগারে বন্দি করে রেখেছে, তার নির্ভুল তথ্য জানতে হবে। তাই আমরা সকল সাথীকে নিয়ে জরুরী পরামর্শে বসলাম।

আমি সবাইকে লক্ষ্য করে বললাম, "ভাইসব! আপনারা হলেন দ্বীনের মুজাহিদ, আল্লাহর সৈনিক। আমাদের আমীর সাহেব যখন যে নির্দেশ দেন তখন সে নির্দেশই মানতে হবে। এখন থেকে জালাল দামালা গৌরানীর নের্তৃত্ব মেনে নিতে কারো কোন আপত্তি আছে কি? না শব্দে গুঞ্জরিত হল সভাকক্ষ। অতঃপর বললাম, ভাইয়েরা আমার! তোমাদের মধ্য থেকে দুজন যুবকের প্রয়োজন। যারা তুর্কমেনিস্তনের অলি-গলি, পথ-ঘাট ভালভাবে চেনে। তারা সেখানে গিয়ে বন্দিদের খোঁজ নিবে। তাদেরকে কোন কারাগারে কিভাবে রেখেছে নাকি অন্য কোন বন্দি শিবিরে আটক রেখেছে, না মেরে ফেলেছে এসব তথ্য সংগ্রহ করে আনতে হবে। তার পর চলবে আমাদের অভিযান।

আমার কথা শুনে জনাব জালাল দামলা গৌরানী বললেন "মালুমাতের (জরিপ) দায়িত্ব অনেকের দ্বারাই সম্ভব হবে না। আমার মতে দুজন সাথী নিয়ে আপনি নিজেই এ কাজটি করুন। আপনার হাত নেই, পঙ্গু। কখনো মুসাফির বেশে আবার কখনো ভিক্ষুক বেশে সারা দেশ সফর করতে পারবেন। আশা করি কোন অসুবিধা হবে না। আমি বললাম, ভাইজান! আপনি যা বলেছেন, তা কিন্তু এভাবে হবে না। কারণ, আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ। সোজা পথ পরিহার করে যেতে হবে বক্র পথে। প্রথমে তাজিকিস্তান হয়ে ঢুকতে হবে উজবেকিস্তানে। সে খান থেকে যেতে হবে তুর্কমেনিস্তানে। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তুর্কমেনিস্তানের খিবা নামক এক বন্দি শিবিরে অনেক মুসলামন মুজাহিদ ও আলেম-উলামাদেরকে বন্দি করে রেখেছে। আমার ধারণা হয়, আপনার সাথীদেরকেও সেখানে রেখেছে। কামাল পাশার চৌকস সৈন্যরা কড়া পাহারাদারীতে রাখছে। কিছু কিছু আসামীদেরকে লোহার বেড়ী পরিয়ে বাইরের বাগানে ও কৃষি ভূয়ে কাজ করাচ্ছে। এদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা এত সহজ নয়। আর আপনি যে বলছেন ভিক্ষুক সেজে ঘোরাফেরা করতে, এটা কক্ষনো সম্ভব নয়। এর চেয়ে আত্নহননের পথ বেছে নেয়া শ্রেয়। তিনি তার কারণ জানতে চাইলে বললাম–

বলসেবিক শাসিত এলাকায় কোন দুরারোগ্য রোগী, কর্মক্ষন বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। যে সব লোক কোন কাজ-কাম করতে পারে না, তাদেরকে সমাজের ও রাষ্ট্রে বোঝা মনে করে। তাই কর্মক্ষম লোকদেরকে ধরে ধরে চিড়িয়াখানার জ্যান্ত হিংস্র পশুপালের মধ্যে ছেড়ে দেয়। পশুরা তাদেরকে ছিড়ে-ফেড়ে খেয়ে ফেলে। তাই বলছি, ভিক্ষুকের বেশে সেসব এলাকায় প্রবেশ করলে জীবিত ফেরত আসা যাবে না। চিড়িয়াখানার বাঘের খোরাক হতে হবে। আমাকেই যদি যেতে হয়, তবে অন্য কোন উপায় বের করতে হবে। আমার সাথে দুইজন সহকারী

লাগবে, যারা পথঘাট ভালভাবে চেনে। আমার কথা শুনে জালাল সাহেব বললেন–

এখান থেকে দুজন লোক দেয়া যাবে না। একজন এখান থেকে নিতে হবে আর একজন পাবেন তুর্কমেনিস্তান। তিনি আমাদেরই সাথী এবং গ্রামুজান শহরের বাসিন্দা। নাম আওলাদ জান বর্তমানে তিনি একজন প্রসিদ্ধ কাপড় ব্যবসায়ী। আপনারা তার কাছে গেলে অনেক সুন্দর সুন্দর দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাবেন। থাকা-খাওয়ারও কোন সমস্যা হবে না। আর একটি কথা মনে রাখবেন, যে তিনি একজন উঁচু মানের আলেম। বুখারার মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন একসময়। তার পর মাদ্রাসা ধ্বংস হয়ে গেলে তিনি দীর্ঘ দিন আনোয়ার পাশা (রহঃ) এর সাথে জিহাদ করেন। তাঁর শাহাদাতের পর আমরা কয়েকটি অভিযান চালিয়েছিলাম। তার পর আমার বেশ কয়েকজন সাথী বন্ধি হলে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। দীর্ঘ দিন পর পরামর্শ করে আওলাদ জানকে তুর্কমেনিস্তান পাঠিয়ে দেই বন্দি সাথীদেরকে মুক্ত করার কোন উপায় বের করা যায় কিনা। আজ দু বৎসর হয় কোন ব্যবস্থা হয়নি। এখনো তিনি এই ফিকির নিয়ে সেখানে অবস্থান করছেন।

তাঁর কথা শুনে আমি অনেকটা আশান্বিত হলাম এবং বললাম, ভাইজান! আমি কোন দিন তুর্কমেনিস্তান যাইনি এবং তুর্কী ভাষাও জানি না। কি ভাবে কাজ উদ্ধার করব পরামর্শ দিন। অতঃপর তিনি বললেন, আপনার সাথে যাকে পাঠাব সে তুর্কে মেনিস্তানেরই অধিবাসী। ভাষা জানার জন্য এত পেরেশান হবেন না। কিছু চেষ্টা করলেই আয়ত্ব করতে পারবেন। চলতে-ফিরতে তার কাছ থেকে শিখে নিবেন। ছেলেটিকে দেখতে চাইলে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি ছেলেটিকে দেখেই অনুমান করে নিলাম যে, সে দূর্দান্ত সাহসী। বডি-স্বাস্থ্য মানানসই। চেহারা খুবই সুন্দর। বয়স ২৫ কি ২৬ হবে। আমি তাকে সস্নেহে কাছে টেনে এনে বসিয়ে নাম জানতে চাইলে সে বলল," আমার নাম ইজদান কাওড়ী। বাড়ী কিবা শহরে কাওড়ী এলাকায়।

ঃ তুমি কি পথঘাট সব চেন?

ঃ বেশীর ভাগই চিনি। অচেনা এলাকায়ও চলতে অসুবিধা হবে না।

ঃ আচ্ছা! তুমি কি কি অস্ত্র চালাতে পার?

ঃ বর্তমানে যে সব অস্ত্র ব্যবহার হয়, প্রায় সবগুলোই চালাতে পারি।

ঃ ঘোড়া দৌড়াতে পার?

ঃ ঘোড়া চালানো আমাদের বংশগত অভ্যাস।

ঃ ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা দু-এক দিনের মধ্যেই রওয়ানা হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। তুমি খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু গুছিয়ে তৈরী হও। এসব পরামর্শের পর সবাইকে বিদায় দিয়ে আমি চলে গেলাম নাদির শাহের নিকট পরামর্শ করতে। আমি আমাদের পরামর্শের বিষয়বস্তু জানালে তিনি সন্তুষ্ট মনে দোয়া দিয়ে বিদায় দিলেন।

যাওয়ার ব্যবস্থা সবই সুসম্পন্ন। এখন নাদির শাহ থেকে আখেরী দোয়া ও এজাজতের অপেক্ষায় আছি। তাঁর ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার সাথে সাথেই আমরা ঘোটকারোহণে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমাব। রাত গভীর। ঘুম নেই আঁখি পাতে। এক দিকে স্বদেশ ও জাতির চিন্তা, অপর দিকে স্বজন হারানোর বেদনা। সব মিলিয়ে আমার সময়টা কাটছিল অস্বস্তিকর মধ্য দিয়ে।

আমার দুই দুইটি নবযৌবনা স্ত্রী। তাদের সাথে নেই কোন আপনজন নেই কোন পুরুষ লোক। কোথায় গিয়েছে কে একটু আশ্রয় দিয়ে, না এখনো আমার খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা কে জানে? একটিবার যদি পাকতিয়া গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতাম, তবে মনে একটু শান্তনা পেতাম। জীবন অতিবাহিত হচ্ছে এক রণাঙ্গন থেকে অন্য রণাঙ্গনে। এক বন্দিশালা থেকে অন্য বন্দিশালায়। শুধু কাঁটার আঁচড় খেয়ে রক্তাক্ত হলাম। ফুল হাতে নিতে পারিনি। শুধু বারুদের গন্ধই শুকে গেলাম, আতরের ঘ্রাণ পাইনি। পরাধীনতার আঁধারে সাঁতার কাটলাম। স্বাধীনতার শিশু রবিটির দেখা পাইনি। জালেম হায়েনারা আমার হাতটি কেটে দিয়েছে তাই গুলি ছুঁড়ে তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করে মনের জ্বালা মিটাব, সে সুযোগও রইল না। এখন আবার গোয়েন্দা সেজে যাচ্ছি। জানি না কতটুকু কামিয়াব হবো? এধরনের হাজার চিন্তা এসে রাতের ঘুমটুকু কেড়ে নিল।

রাত পোহাল। ভোর হলো। পাখীরা গান ধরলো। শিশু রবি কিরণ বিলাচ্ছে। আমি ফজরের নামায সমাপন করে তিলাওয়াত করছি। ঠিক এমন সময় এক শাহসওয়ার এসে নাদির শাহের বার্তা দিয়ে গেল। আমি পত্রটি খুলে পড়লাম। এটাই আমাদের ক্লিয়ারেন্স। আমি কমান্ডার জালাল দামলাকে ডেকে সব খুলে বললাম। তার পর সকল সাথীকে একত্রিত করে আলাপ-আলোচনা করে বিদায় ও দোয়া নিয়ে কাবুল ত্যাগ করলাম।

আমরা কাবুল থেকে কোসকা হয়ে তাজিকিস্তানের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে দোসানবে পৌঁছুতে প্রায় এক সপ্তাহ লেগেছে। এপথটুকু পাড়ি দিতে কোন বেগ পেতে হয়নি। কারণ, যদিও দুর্গম পাহাড়ী এলাকা, কিন্তু শত্রু আক্রমণের কোন ভয় ছিল না। ভয় ছিল না পথ ভুলে যাওয়ার। যেখানেই রাত, সেখানে কোন সরাইখানায় অথবা কোন মানুষের বাংলোয় রাত যাপন করতাম। খানাপিনারও কোন কষ্ট হয়নি।

আমরা দোসানবে পরিচিত এক বন্ধুর বাড়ীতে দুদিন অবস্থান করি। সেখান থেকে আমরা প্রয়োজনীয় রসদপত্র সংগ্রহ করে নিলাম। আমার বন্ধু পরামর্শ দিলেন, আপনারা ঘোড়া নিয়ে সফর করতে পারবেন না। কারণ, বেশীর ভাগ মুজাহিদই ঘোড়া ব্যবহার করে। তাই আপনাদেরকে মুজাহিদই মনে করে হত্যা করবে বা বন্দি করে ফেলবে। বলসেবিক হায়েনারা সামান্য সন্দেহের কারণে একটি জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়। আমার পরামর্শ হল, আপনারা আমার এখানে অশ্ব দুটি রেখে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সোজা চলে যান টোরটকোল। টোরটকোল উজবেকিস্তানের একটি প্রাদেশিক শহর। টোরটকোল থেকে সন্ধ্যায় ও ভোরে দুটি ট্রেন মারি হয়ে কারানুভডস্ক অর্থাৎ কাস্পিয়ান সাগর তীর পযর্ন্ত যায়। আপনারা রেলপথে সফর করলে নিরাপদে করতে পারবেন। কারানুভডস্ক থেকে নৌপথে বা বাসে যেতে পরবেন আমুজান ও খিবায়। এখন চিন্তা করে দেখুন কোন পথে যাবেন। রেলপথে গেলে আমার জিম্মাদারিতে টোরটকোল ষ্টেশনে পৌছে দিতে পারব।

আমার সঙ্গী ইজদান কাওড়ী বললো,খোবায়েব ভাই! ঘোটক নিয়ে জীবনের ঝুঁকি মাথায় তুলে নেয়া আদৌ উচিত হবে না। আপনার বন্ধু ছাঈদ খান যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেভাবে গেলেই নিরাপদ মনে করি। ইজাদান কাওড়ীর কথা শুনে বললাম, কারানুভডস্ব এবং খিবায় গিয়ে বসে থাকব তা নয়। শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহরে আবার শহরে ঘুরে বেড়াতে হবে। তখন তো পায় হেঁটে ওসব পথ চলা যাবে না। আর সব জায়গায় টাংগা বা বাস পাওয়া যাবে না। তাহলে কিভাবে চলাফেরা করবো? আমার প্রশ্নের উত্তরে ইজদান বললে, সেখানে অনেক ঘোড়া কেরায়া পাওয়া যায়। প্রয়োজনে ওদের থেকে কেরায়া নিয়ে নেব।

ইজদানের পরামর্শ আমার খুব ভাল লাগল। তাই রেলপথে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম। সাঈদ খান আমাদের সাথে টোরটকোল পর্যন্ত এগিয়ে

দিয়ে যাবেন। ঘোটক দুটি সাঈদ খানের বাসায়ই পোষবেন। পরবর্তী সময়ে তা দিয়ে দিবেন। রাত্রেই আমাদের খাবার, পানি ও ঔষধ পত্র গুছিয়ে নিলাম। তারপর খানাপিনা সেরে এশার নামায সমাপন করে শয্যা গ্রহণ করলাম।

গভীর রাত। বিশ্ব প্রকৃতি রাতের কালো সামিয়ানার নিচে গভীর নিদ্রায় অচেতন। এরই মধ্যে উত্তরাকাশে শোনা গেল মেঘ গর্জনের শব্দ। অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। মুহুর্মুহু কানফাটা বজ্রনিনাদে অন্তরাত্মা দুরু দুরু কাঁপছে। তড়িৎ চমকাচ্ছে। চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম। এরই মধ্যে আরম্ভ হল শিলাবৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়। সেকি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। আকাশচুম্বি বিটপিগুলো সমুলে উপড়ে নিয়ে গেল বহুদূর। কাঁচাপাকা ঘরগুলো মৃত্তিকাবক্ষে নুইয়ে দিল। দেয়াল চাপা পড়ে অনেক লোক মারা গেল। তা বুঝতে পারিনি। আমাদের ঘরটি ছিল বাঁশ ও কাঠের তৈরি চারচালা। কখন যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল তা বুঝতে পারিনি। আমার ঘরেই তিনজন দেয়ালে চাপা পড়ে মারা যায়। মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিটে ঝড়েই সব লন্ডভন্ড করে দিল। বিশাল এলাকা। আমি অন্ধকারে বাঁচার জন্য ছোটাছুটি করছি, কিন্তু কোথাও দাড়াঁনোর জায়গা পেলাম না। ভোর হলে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখি বন্ধু সাঈদ খান ও সাথী ইজদান আহতাবস্থায় পড়ে আছে। তারপর তাদের চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালে নিয়ে যাই। মানুষের চলাফেরার রাস্তা গাছ পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় আর আমাদের যাওয়া হল না। এখানে সাথীদের সুস্থ্যতার জন্য আরো দু সপ্তাহ অবস্থান করতে হল। এর মধ্যে বন্ধু সাঈদ আমাদেরকে নিয়ে যেতে অপারগতা প্রকাশ করল আসলে যাবেই বা কি করে? বাড়িঘর মেরামত করতেও তো অনেক সময়ের প্রয়োজন। আমি দু হাজার টাকা বন্ধুকে দিয়ে বলি, ভাই আপনি বাড়ি-ঘরের কাজ সম্পাদন করুন। আমরা আগামী কাল চলে যাব। এতে তিনি রাজি হলেন।

তের

সুবহে সাদিকের আগমনে তিমির রজনীর বিদায়ঘন্টা বেজে উঠল। শাখে শাখে গায়ক পাখিরা ভোরের গান ধরেছে। মুয়াজ্জিন উচ্চ মিনারে সুমুধুর কণ্ঠে আযান দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন ঘুম হতে নামায ভাল। আমরা তাহাজ্জুরে মুসল্লা ত্যাগ করে ফজরের নামায আদায় করতে চলছি মসজিদ পানে। আমার সাথী ইজদান ও সাঈদ খানকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা আযান দেওয়া তো বন্ধ করে দিয়েছিল কমিউনিষ্ট হায়েনারা। এখন কি নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়েছে? তিনি বললেন, নিষেধাজ্ঞা এখনও বাকি আছে। তবে সীমান্ত এলাকার তেমন বাড়াবাড়ি করে না। এসব আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে মসজিদে এসে হাজির হলাম। নামায সমাপন করে সাঈদ সাহেবের বাসায় গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আমাদের জন্য নাস্তা অপেক্ষা করছে। আমরা নাস্তা সেরে টোরটকলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

আমরা দোসানবে থেকে বাসে চড়ে যাচ্ছি। রাস্তার দু-ধারে রয়েছে শত শত চেকপোষ্ট। বাস দাঁড় করিয়ে যাত্রীদের লাগেজপত্র মালামাল ও বডি চেক করে। আবার কারো প্রতি সামান্য সন্দেহ হলে বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়। আহা, এ সড়কটি যেন বিপদে ঘেরা। একবার মনে মনে ভাবছিলাম, এ রাস্তা ত্যাগ করে অন্য রাস্তা দিয়ে যাই। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে ইজদান বলল, অন্য কোন পথ নেই এ পথ ছাড়া। তবে গ্রাম্য মেটোপথ দিয়ে পদব্রজে যেতে পারব। তবে কষ্ট হবে প্রচুর। এক ঘন্টার পথ চলতে সময় লাগবে সাত-আট দিন। তারপরও নিরাপদে যাওয়া যায় কিনা তা বলা মুশকিল।

আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলাম, বাসে যাওয়া মোটেই নিরাপদ হবে না। জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ। কষ্ট যতই হোক, পায়ে হেঁটে যাওয়াই উত্তম। সময় যায় যাক তবু নিরাপদে যেতে পারব। আমার

কথায় ইজদান সায় দিলেন। অতঃপর আমরা দুরাখিল শহরে গিয়ে বাস থেকে নেমে পড়লাম। আমাদের টিকেট ছিল সুদূর কারানুভডস্কের। আমরা যাত্রাবিরতির কথা জানিয়ে দিয়ে কিছু ভাড়া ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করলাম। চালক বারবার যাত্রাবিরতির কথা জানতে চাইলে আমরা বললাম, দুরাখিলে আমাদের অনেক কাজ আছে। কাজগুলো সারতে হয়ত আরো দু-একদিন সময় লাগবে। ভেবেছিলাম, কারানুভডস্কের কাজ সেরে ফেরার পথে দুরাখিলের কাজ সারব। এখন দেখি, এটাই আগে সারতে হবে। কাজেই যে পর্যন্ত এসেছি এ পর্যন্ত ভাড়া রেখে বাকি ভাড়া দিয়ে দিলে ভাল হয়।

আমার কথা শুনে গাড়িচালক বললেন, ভাইজান আপনাদেরকে এ এলাকার লোক বলে মনে হচ্ছে না। জানি না শহরে আপনাদের কোন পরিচিত লোক আছে কিনা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে কিনা, যদি থাকে। তাহলে ভাল। আর যদি না থাকে, তাহলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। দুরাখিল ছিল একটা ব্যাস্ত তম শহর। আজ তিন মাস যাবৎ দুরাখিলে চলছে সাঁড়াশি অভিযান। মুজাহিদরা কমিউনিষ্টি দপ্তরে আক্রমণ চালিয়ে অনেক নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। তারপর থেকে নিরাপত্তা জোরদার করেছে। আবাসিক হোটেলগুলোতে তল্লাশি করে বিদেশিদেরকে ধরে নিয়ে যায়। তিন মাসে শহরের অবস্থা খুবই অবনতি হয়েছে। দুরাখিল এখন জনশূন্য ভুতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়েছে। আর যদি চলেই যান, তাহলে যে ভাড়া পান তা ফেরত পাবেন। এখনও সময় আছে চিন্তা করে বলুন। বাস এখানে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করবে। তারপর জ্বালানি নিয়ে আবার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

ড্রাইভারের কথা শুনে ভড়কে গেলাম। কি করব না করব ভেবে স্থির করতে পারছিলাম না। ইজদানের কাছে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো এখন যদি চলে যাই, তাহলে প্রশ্ন উঠবে এত জরুরি কাজ রেখে চলে যাচ্ছি কেন। ড্রাইভার যদি কমিউনিউষ্টিদের কেউ হয়ে থাকে,তবে তারা সন্দেহ করে ধরিয়ে দিতে পারে। এখন নেমে দু-এক ঘন্টা দেরি করে পরবর্তী গাড়িতে সামনে চলতে থাকি। পরবর্তী ইচ্ছা আল্লাহর। ইজদানের পরামর্শ আমার মনঃপুত হল। তাই ড্রাইভারকে বললাম, ভাই আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন। থাকতেই হবে। তবে সব কাজ সারতে না পারলে এক ব্যক্তির নিকট দেখা করে দু-চার ঘন্টার মধ্যেই চলে যাব। ড্রাইভার বলল,

আজকের দিনের ভিতর যদি কাজ সারতে পারেন, তাহলে টাকা ফিরত নেয়ার দরকার নেই। আমাদের পরিবহনের যে কোন গাড়ি দিয়েই যেতে পারবেন। চালকের কথা শুনে আমরা নেমে রইলাম।

আমরা যদি কাউন্টারে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি, তাহলে অনেকেই সন্দেহ করবে। তাই কাউন্টার ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে ঘুরতে লাগলাম। বাস কাউন্টার ছিল শহরতলীতে। আমরা শহরে প্রবেশ না করে দুপুরে আহার করতে একটি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে যোহরের নামায আদায় করার জন্য মসজিদ খুঁজতে লাগলাম। বেশ কিছুদুর গিয়ে একটি মসজিদ নজরে পড়ল বটে কিন্তু নামায পড়ার মত পরিবেশ নেই। মসজিদের প্রধান ফটকের মধ্যে দুজন মুসল্লির লাশ ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রেখেছে। মসজিদের অভ্যন্তরে বেশ কটি লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। পঁচা দুর্গন্ধে কাছে ঘেঁষা যায় না। এ অবস্থা দেখে সেখানে অবস্থান করা সমীচিন মনে করলাম না। তাই হাউসে অযু করে চলে গেলাম দূরে। সেখানে একটি আপেল বাগানে দু রাকাত নামায আদায় করে চলে আসি কাউন্টারে। বাসের খোঁজ নিয়ে দেখি, এখনও প্রায় ৪০ মিনিট বাকি। এতক্ষণ সেখানেই বসে রইলাম। বাস আসলে আমরা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করে ছাড়ার অপেক্ষায় রইলাম।

বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট। বাস আমাদেরকে নিয়ে কারানুভডস্কের দিকে এগিয়ে চলল। কত মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় পাহাড়-পর্বত হাট-বাজার পেরিয়ে চলছে, তার হিসাব রাখে কে। বাস ৭০/৮০ মাইল পথ অতিক্রম করে ৩০ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে চলেছে। চার দিনে আমাদেরকে কারানুভডস্কে নামিয়ে দিল। তখন রাত প্রায় শেষ। আমরা বাকি রাতটুকু কাউন্টারেই কাটিয়ে দিলাম। ফজরের নামায আদায় করে নাস্তা সেরে শহরে বের হলাম।

বিশাল শহর। আকাশচুম্বী এমারত। প্রশস্ত রাজপথ। দু ধারে সারি সারি মেহগনি,ইউকিলিপ্টাস ও দেবদারু গাছ। নিজ নিজ বলয়ে গাড়ি ঘোড়া চলছে। মাঝে মাঝে নাস্তিক কামাল পাশার সৈন্যরা ভ্যানে চড়ে পাহারা দিচ্ছে। যেদিকে চোখ যায় শুধু মহিলা আর মহিলা। "লেডিস শহর" নামকরণ করলে মোটেই ভুল হবে না। পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। মনে হয় পথ ভুলে দু-চারজন পুরুষ শহরে প্রবেশ করেছে।

আমরা বিকাল বেলায় হোটেল হেভেনে গিয়ে উঠলাম। হোটেলে মাগরিবের নামায আদায় করে আবার শহরে ঘুরতে বের হলাম। প্রতিটি মার্কেট ও বিপণিগুলোতে শুধু মহিলা আর মহিলা। তাদের গায়ে বোরকা উড়না ও চাদরের কোন বালাই নেই। বেশির ভাগ মহিলাই স্কার্ট পরিহিতা। সেলোয়ার-কামিজ তেমন একটা চোখে পড়ে না। দু-তিনঘন্টা ঘোরাফেরা করে বুঝতে পারলাম, এটা পাপের এক লীলাভূমি। রাত নয়টায় ফিরে এলাম হোটেল হেভেনে। এ এক বিশাল রাষ্ট্র। হোটেল হেভেনে পাঁচ হাজার লোক থাকতে পারে। বিশাল এলাকা দখল করে আছে হোটেলটি।

হোটেলটিতে রয়েছে কয়েকটি ভবন। এক পার্শে রয়েছে পার্ক। মাঝে মধ্যে রয়েছে পানির ফোয়ারা। এখানে বিদেশীদের আনাগোনা খুব বেশি। বিদেশীদের মধ্যে ইউরোপিয়ানরা বেশি। এখানে বিদেশীদের এত ভীড় কেন তা বুঝতে পারিনি। আমরা যখন রাতে ভ্রমণ শেষে হোটেলে গেলাম, তখন বুঝলাম এখানে বিদেশীরা ভীড় জমায়। এটা নাম মাত্র হোটেল। আসলে এটা একটা পতিতালয়। প্রতিটি বেডে রয়েছে একজন করে সেবিকা। এরা মনোরঞ্জনের জন্য নিয়োজিত। এদেরকে পৃথক কোন টাকা দিতে হয় না। সীট ভাড়ার সাথেই তাদের টাকা রেখে দেয়। আমরা ডাবল সীট ভাড়া নিয়েছিলাম। রুমে প্রবেশ করার পর দুইজন সুন্দরী তরুণী আমাদের রুমে প্রবেশ করল। প্রবেশ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল যেন প্রস্তরখন্ড আলেখ্য। কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলে একজন মুচকি হেসে বলল, আমরা আপনাদের আর আপনারা আমাদের।

"তার অর্থ বুঝিয়ে বলবেন?

আমরা ২৫২ নম্বর কক্ষের সেবিকা। এ কক্ষে যে যত দিন থাকবে, আমরা তার ততদিন সেবা করব। আপনারা বহুদূর থেকে সফর করে এসেছেন। শরীর ক্লান্ত স্ত্রীদের নিয়ে আসতে পারেননি। তাই আমরা আপনাদের খেদমতে উৎসর্গকৃত। আপনাদের মনের কামনা-বাসনা সবই আমরা পুরা করব।

ঃনাউযু বিল্লাহি মিন জালিক। তোমরা এ রুম থেকে বেরিয়ে যাও। এক মুহূর্ত যেন বিলম্ব না হয়।

ঃআমরা যাব কোথায়? এ রুম যে আমাদের।

ঃএ রুম তোমাদের মানে? রুম আমরা ভাড়া নিয়েছি।

আপনারা ভাড়া নিয়েছেন ঠিক, আমরা এখানে নিত্য দিনের বাসিন্দা। আমাদের মালিকের নির্দেশ, কোন প্রকারে যেন কেউ কষ্ট না পায়। তাই আমরা আচার-আচরণ দিয়ে এমনকি সুন্দর দেহটি উজাড় করে দিয়ে প্রবাসীদের খেদমত করি, আনন্দে মন ভরে দিই। আমরা রাত যাপন এখানেই করব। আমাদের তো এটা ছাড়া আর থাকার কোন রুম নেই।

মেয়েদের কথা শুনে আমরা বললাম, ঠিক আছে আপনারা পার্শ্বের খাটে শুয়ে পড়ুন আর আমরা এ খাটে শুইয়ে পড়ি। আপনাদের প্রতি আমাদের কোন অভিযোগ নেই। আমরা আপনাদের প্রতি এমনিতেই খুশি। আপনাদের কোন খেদমত আমরা নেব না। খেদমতের প্রয়োজন নেই। এ বলে তাদেরকে অপর খাটে শুইয়ে দিয়ে আমরা নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। সারারাত নামাযে কাটিয়ে দিয়ে সকাল বেলা হোটেল ত্যাগ করে বেরিয়ে এলাম। আহা এযে কত বড় নোংরামি ও অসভ্যপনা তা কেউ না দেখলে ধারণাও করতে পারবে না। যাক বেরিয়ে এসে হাপ ছেড়ে বাঁচলাম ও আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলাম।

চৌদ্দ

কাকডাকা ভোরে পথ চলছি। পথঘাট ফাঁকা। যানবাহন এখনও নেমে আসেনি। মাঝে-মধ্যে দু-একটি মালবাহী ট্রাক মাটি কাঁপিয়ে এদিকে-ওদিক যাচ্ছে। আমার রাহবর ইজদান। আমি তাকে অনুসরণ করে পথ চলছি। সে শহরের থমথমে ভাব দেখে বলল, ভাইজান চলুন আমরা বেশিক্ষণ শহরে না বেরিয়ে সোজা খেবাগামি বাসে চলে যাই। শহরের হাবভাব ভাল মনে হচ্ছে না। গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আমি ইজদানের কথা শুনে বললাম, ভাই আমার এ এলাকা চেনা নেই, জানা নেই। এ এলাকার ভাষাও আমার জানা নেই। আমি কিন্তু বোবার ভান ধরে থাকব। যা বলার তুমিই বলবে। আর তুমি যা ভাল মনে

কর, তাই কর। শহর থেকে যত তাড়াতাড়ি পার নেমে যাও। সে বলল, সামনে দুই কিলোমিটার হাঁটলেই আমরা বাসের সন্ধান পাব। বাসে উঠতে পারলে আর চিন্তা নই। আমরা ৪৮ ঘন্টায় খিবায় পৌঁছতে পারব। এ বলে সে দ্রুতগতিতে পথ চলতে লাগল। আমিও তার পিছু পিছু চলছি।

আনুমানিক এক কিলোমিটার পথ চলার পর পুলিশের গাড়ি আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। আমরা স্বাভাবিকগতিতে তাদের পাশ কেটে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একজন পুলিশ আমার হাত ধারে ফেলে। চেয়ে দেখি, এ যেন এক মানুষরূপী নরপিচাশ। লম্বা আমার চেয়ে দেড় গুণ। চোখ দুটিতে যেন জাহান্নামের আগুন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আর একজন ইজদানের হাত ধরে গাড়ির দিকে টানতে লাগল। আমরা অসহায়ের মত গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। তারপর হাতকড়া লাগিয়ে দুটো মোটা রশি লাগিয়ে থানায় চালান করে দেয়। এর মধ্যে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি। ইজাদান কিছু বলতে চাইলে বন্দুকের মাথা দিয়ে গুতা,মেরে বলে, যা বলার থানায় গিয়ে বলবি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই থানাগারদে ঢুকিয়ে দিল। কেন আমাদেরকে আটক করল, কি আমাদের অপরাধ কিছুই জানতে দেয়নি। গারদে আরো দুজন লোক আছে। এর মধ্যে একজন পেলাম ইজদনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইজদান তাদের গ্রেপ্তাপের কথা জানতে পেরে বলল, আমাদেরকে আসলে মুজাহিদ সন্দেহ করে আটক করেছে। তোমাদেরকে মুজাহিদ সন্দেহ করে আটক করার কারণ কি, এমন কি আলামত পেয়েছে তোমাদের কাছে। আলামত একমাত্র দাড়ি-গোঁফ। তাই গ্রেপ্তার করেছে। তাহলে আমাদের অবস্থাও তাই মনে হয় এমনটাই হবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল আর বিকাল গড়িয়ে রাত হল। এর মধ্যে দানা-পানি কিছুই দেয়নি। ক্ষুধা পিপাসায় কাতর সকলেই। গারদ অভ্যন্তরে তায়াম্মুম করে নামায পড়ি। রাত এগারটার দিকে শুধু একটা করে পরাটা পরিবেশন করল। তা উদরস্থ করলে ক্ষুধা যেন আরো বেড়ে গেল। ইজদান তুর্কি ভাষায় পুলিশদের বলল, ভাই আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আরো কিছু রুটির ব্যবস্থা করুন। পুলিশ অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, বন্দিদেরকে এর চেয়ে বেশি খাবার দেয়ার বিধান নেই। তার কথা শুনে সবর করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। রাত আনুমানিক একটার দিকে আজরাঈলের মত ৫/৭জন পুলিশ এসে দুইজন করে নিয়ে গেল জিজ্ঞসাবাদের জন্য। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।

প্রথমেই আমাদের উপর চালাল শারীরিক নির্যাতন। চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করে তুলল। তারপর চলল জিজ্ঞাসাবাদ। আমাদের নাম কি, বাড়ি কোথায়, কি করি কোথয় থাকি, কারানুভডস্কে আগমনের কারণ কি আমরা কট্টরপন্থি মুসলমান কিনা, কামাল পাশাকে কেমন জানি। ধর্মনিরপেক্ষ পছন্দ করি কিনা, পর্দা সম্বন্ধে কি অভিমত, নারীদের স্বাধীনতা ভাল লাগে কি না এ ধরনের শত শত প্রশ্ন করতে লাগল। আমি বোবা সেজে শুধু আউ আউ করছিলাম আর ইজদার তুর্কি ভাষায় উত্তর দিতে লাগল। সে খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উত্তর দিল।

অফিসার ইজদানের কথা শুনে বলল, যার কাছে যে জিনিস আছে সে জিনিস দেয়াই উদারতা। এটাই ধর্ম। তোমাদের কাছে যা ছিল তা সেবিকাদের দাওনি। এটাই অপরাধ। অতীতে দেখেছি, যারা এ ধরনের কট্টর, তারাই আইন ভঙ্গ করেছে, সমাজে বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। এরাই জিহাদের নামে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। তোমাদের কোন কৈফিয়ত শোনা হবে না। তোমরা তিন মাসের কারাদন্ড ভোগ করার পর এমনিতেই খালাস পেয়ে যাবে। তোমরা মুক্তি পেয়ে দেশবাসীকে জানিয়ে দেবে কারাগারের হাল অবস্থা। তাহলে জনগণ কামাল পাশার বিরোধিতা করবে না। আমরা তার অযৌক্তিক কথা শুনেও প্রতিবাদ করার সাহস পেলাম না। অপর দুজনের সাথেও হায়েনারা এ ধরনের ব্যবহার করেছিল। রাত পোহালে আলো-বাতাসমুক্ত অন্ধকার গাড়িতে তুলে খিবা কারাগারে প্রেরণ করে।

গাড়ি পাগলের মত বিরামহীনভাবে চলছে তো চলছেই। কোন দিকে যাচ্ছে পূর্বদিকে, না পশ্চিম দিকে, তা বুঝার সাধ্য নেই। গাড়িটা এত অন্ধকার ছিল যে কারো চেহারা দেখা যাচ্ছিল না। দিন না রাত তা বুঝার সাধ্য ছিল না। ক্ষুধার অনল উদরে জ্বলছে। পিপাসায় প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম। হায়েনারা আমাদের খানাপিনার ব্যাবস্থা করেনি। একটানা চার-পাঁচ ঘন্টা গাড়ি চলার পর একটু বিরতি দেয়। তখন মনে করতাম, এখন হয়ত কিছু খাবার দিবে। কিন্তু দেয়নি। গাড়ি আবার চলতে থাকে। আনুমানিক তিনদিন পর আমাদেরকে কারাগারে ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়ি ফিরে যায়।

কারাগারের মর্মান্তিক কাহিনী শোনানোর আগে কামাল পাশার সামান্য আলোচনা না করলেই নয়। যদিও ইতিপুর্বে সামান্য আলোচনা করেছিলাম, তারপরও মন চাচ্ছে আরো একটু আলোচনা করতে। কামাল

পাশার পুরা নাম মুস্তফা কামাল পাশা। কোন কোন ঐতিহাসিক তুর্কী বীর কামাল পাশাও বলেছেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার কমিউনিষ্টগণ জারনিকোলাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। এই আন্দলনে জার নিকোলাই পরাজিত হয়। সে সময় কমিউনিজম উৎখাত করে ইসলামিজন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জিহাদের জন্য ডাক দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কামাল পাশার নাম উল্লেখযোগ্য। মুস্তফা কামাল পাশা ছিলেন আনোয়ার পাশার সেনাপতি। বলসেবিকদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পরিচালনা করেন। দুর্বার গতিতে চলছিল তুমুল লড়াই। এতে বলসেবিকদের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। তারপর সুচতুর বলসেবিকরা কামাল পাশাকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে দল ত্যাগ করে নিজের দলে নিয়ে যায় এবং অনেক মুজাদিকে অর্থের লোভে ফেলে দল ত্যাগ করিয়ে নিজের দলে নিয়ে যায় এবং অনেক মুজাহিদ শহীদ করে ফেলে এবং অনেক মুজাহিদ ধরিয়ে বলসেবিকদের হাতে দিয়ে দেয়। এভাবে মুজাহিদ বাহিনীর চরম ক্ষতি করে। এভাবে আনোয়ার পাশাও শহীদ হন।

তারপর কমিউনষ্টিরা তাদের ওয়াদামাফিক তুর্কমেনিস্তানকে কামাল পাশাকে দিয়ে দেয়। কামাল তুর্কমেনিস্তানকে স্বাধীন ঘোষণা দিয়ে ধর্মনির পক্ষবাদ প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বাস করলে সে আর মুসলমান থাকে না, বেঈমান হয়ে যায়। যেসব আলেম তার বিরোধিতা করেছে তাদেরকে পাইকারিহারে শহীদ করেছে। এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শহীদ করার পর মুখ খোলার আর কেউ ছিল না। কামাল নারী স্বাধীনতা আইন পাশ করিয়ে নারীদেরকে অর্ধউলঙ্গ করে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে। তুর্কি মা বোনরা ছিল পর্দানশীল। কামাল তাদেরকে সমঅধিকার দিয়ে পুরুষের সাথে চাকরি করার অধিকার দিয়েছে। বোরকাপ্রথা আইন করে বাদ দিয়েছে মেয়েরা সেলোয়ার-কামিজের পরিবর্তে স্কার্ট,শার্ট,হাফপেন্ট,জাইঙ্গা পরতে শিখেছে। সকল ক্ষেত্রে নারীদেরকে চাকরিতে ঢুকিয়েছে। তারপর ইসলামের নাম উচ্চারণকারী আর কেউ থাকল না। ইসলামি শিক্ষা বাদ দিয়ে অন্য শিক্ষা চালু করেছে। এতে শত শত মাদরাসা শিক্ষাকেন্দ্র একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ধর্মনিরপক্ষতা, নারী স্বধীনতা ও সমঅধিকারের জন্মদাতা বা প্রবর্তক হলেন কুখ্যাত মুস্তফা কামাল।

পনের

আমাদেরকে কারাকর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে পুলিশরা চলে আসল। কারা অফিসাররা আমাদেরকে ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমি তো বোবার ভান ধরে আছি, উত্তর দিতে গিয়ে পে পে আওয়াজ করি। এতে আমাকে বেশি কিছু প্রশ্ন করেনি। আর অপর আসামীদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করে জর্জরিত করে তুলল। জিজ্ঞাসাবাদ সেরে আমাদেরকে নিয়ে গেল কারাঅভ্যন্থরে। সেখানে নিয়ে আমাদের সকলের হাতে-পায়ে সাত কেজি ওজনের বেড়ি আর ৫ কেজি ওজনের শিকল পড়িয়ে দিল। এ নিয়ে চলাফেরা করা খুবই কষ্টকর। বেয়ে উপরে উঠা অসম্ভব হয়ে পড়ল। বেড়ির ভারে একদম কুঁজো হয়ে গেলাম। হায় আমাদের ফরিয়াদ শোনার কেউ নেই।

আমাদেরকে আট নং ওয়ার্ডে রাখল। এখানে সবই আলেম, মুজাহিদও দ্বীনদার লোক। তাদের অপরাধ তারা ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী স্বাধীনতার নামে নগ্নতা ও বেহায়াপনা সমর্থন করেনি। শিক্ষার নামে কুশিক্ষা ও খোদাদ্রোহীতা,নাস্তিকতা পছন্দ করেননি। তাই তাদের ভাগ্যে নেমে এল নাস্তিক কামালের অকথ্য নির্যাতন। আর কিছু সাহসী আলেমকে হাতে-পায়ে বেড়ি পরানো দেখেছি। তাদের অপরাধ হল, তারা কামাল পাশার নামে মুর্তাদ বা ধমদ্রোহী ফতোয়া দিয়ে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে। কারাগারে তাদের শাস্তিই ছিল কঠিন। আমাদেরকে যদিও বেড়ি পড়িয়েছিল একটু চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছে, তবুও চলাফেরা করতে পারতাম। ওরা তাও পারত না।

আমাদের খাবার ছিল একদিন পর পর দু বেলা সালনবিহীন ভুট্টার রুটি। তাও অনেক পুরাতন। জীবন বাঁচানোর দায়ে সবার সাথে তাই খেতে হত। আমরা একদিন পর একদিন রোজা রাখা আরম্ভ করলাম। আমাদের ওয়ার্ডে যে সাপ্লাই পানি দিত, তা দিয়ে সকলের অযু-গোসল

পেশাব-পায়খানার কাজ শেষ হত না। গোসল করলে পান করার পানি পেতাম না আর পান করলে গোসল করার পানি পেতাম না। তাই সবাই মিলে পরামর্শ করে নিলাম, ফরয গোসল হলে সে গোসল করে নিবে আর সপ্তাহে দুইবার স্বাস্থ্যরক্ষার্থে গোসল করবে। একদল সপ্তাহের প্রথমে আর একদল সপ্তাহের শেষে। এভাবে রুটিন করে দেয়ায় সকলেই পানি ব্যবহার করতে লাগল।

খিবা কারাগারের বন্দিদেরকে বাসিয়ে বাসিয়ে খাওয়াত না। তাদেরকে সীমার বাইরে পরিশ্রম করতে হত। কারাগারে ভিতরে এবং বাইরে ছিল প্রচুর জমি। এসব জমিতে চাষাবাদের কাজ বন্দিদেরই করতে হত। বন্দিদের উৎপাদিত শষ্যের ভাগ সামান্যই ভোগ করত বন্দিরা আর সিংহ ভোগ করত সরকার। তাছাড়া ২০/২৫কিলোমিটার দুরে সীমান্ত এলাকার যে সব পাহাড় রয়েছে, সেসব অনাবাদি পাহাড়ি অঞ্চলকে আবাদি ভুয়ে পরিণত করার জন্য মাটি কাটতে হত। আহা সেকি কষ্ট। নিরীহ মানুষ ধুকে ধুকে মরছে এ নিষ্ঠুর কারাগারে। তার হিসাব কে রাখে। মাটি কাটার জন্য সপ্তাহে দুতিন দিন আমাকেও যেতে হত। পাহাড়ী অঞ্চলে। মাটি কাটার মত কঠিন কাজ উপলক্ষ্যে খাবারের মাত্রা একটুও বৃদ্ধি করত না। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেত আবার নিরাপত্তার মাধ্যমেই নিয়ে আসত। চলাফেরা করার সময় কেউ কারো সাথে ভুলেও কথা বলতে পারত না। যদি বলত, তাহলে তার জন্য কড়া শাস্তি রয়েছে। কাজের সময় কিছু বেড়ি খুলে দিত অন্য সময় নয়। শুধু হাত ও পায়ের বেড়ি খুলে দিত।

কারাগারে কামাল পাশার পক্ষ থেকে একজন বেতনভোগি আলেম এসে প্রতিদিন ওয়াজ নসিহত করত। আসলে এই ব্যক্তি আলেম নামের কলঙ্ক, কামালের চাটুকারও। এক নম্বর চামচা। সে কোরআন-হাদিসের দলিল দিয়ে বোঝাত। কোরআন-হাদিসের মনগড়া অর্থ উপস্থাপন করত। উক্ত মাওলানা যে একজন উঁচুমানের নাস্তিক, তা তার বক্তব্যের মাধ্যমেই বুঝা যেত। মাওলানা সাহেবের ভাষায় তার বক্তব্য শুনুন।

প্রিয় কারাবন্দি আলেম ওলামা,পরহেজগার ও দ্বীনের মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনারা হলেন দ্বীনের ধারক ও বাহক ওয়েরাছাতুল আম্বিয়া। আপনারা পবিত্র কোরআনের উপর সঠিকভাবে আমল করতে পারেননি বলেই আজ নিষ্ঠুর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কালাতিপাত করছেন। এ

শাস্তি আপনাদের হাতের কামাই। এ শাস্তি আপনাদের কৃতকর্মের ফল। কেননা, আল্লাহপাক পবিত্র কালামে এরশাদ করেন, জলে-স্থলে যত বিপর্যয় হয়, তা সবই মানুষের হাতের কামাই। কাজেই আপনারা জেনে-শুনে কোরআন হাদিসের বিপরীত চলছেন)। সে আরো বলে–

(দেশের আমীর বা রাষ্টনায়ক হলেন আল্লাহর ছায়া। তাই আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করার সাথে সাথে রাষ্ট্রনায়কের হুকুম পালন করাও ফরয। পবিত্র কোরআনে বেশ কয়জায়গায় এ নির্দেশ এসেছে। তাছাড়া হাদিসে নববীতে আপনারা দেখেছেন, আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন, আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান যদি গোলাম, কানকাটা, আর মাথা কিসমিসের মতও হয়, তবু তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে। এ সমস্ত সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও আপনারা মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করেন। এটা কি আপনারা ঠিক করছেন? তারপর সে আরো বলে–)

(আমাদের মহামান্য মুস্তফা কামাল পাশা মাদ্দাযিল্লুহুম আলী ধর্ম নিরপক্ষে রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছেন । আর আপনারা আদাজল খেয়ে এর বিরোধিতা করছেন। ধর্মনিরপেক্ষবাদের অর্থ আপনারা বুঝেননি। আসলে এ ধর্মের অর্থ হল সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ধর্মীয় মুল্যবোধ থাকতে হবে। সকল ধর্মের লোক সম্প্রীতি বজায় রেখে এক সাথে চলতে হবে। কোন ধর্মকে অবজ্ঞা করা যাবে না। আল্লাহ পাক নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন, দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরস্তী বা বাধ্যকতা নেই। অন্যত্র বলা হয়েছে, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কোরআনের স্পষ্ট আয়াত থাকতেও আপনারা এটা নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করছেন)। তিনি আরো বলেন–

(বর্তমান বিশ্বে নারী সমাজ খুবই অবহেলিত। নারীদের অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে পদে পদে। তারাও আমাদের মত মানুষ। পুরুষগণ তাদের উপর জুলুম করে আসছে যুগ যুগ ধারে। স্বাধীন নারীদেরকে বন্দী করে রাখছে পুরুষরা। বাহির জগতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র কালামে এরশাদ করেছেন, পুরুষদের যেমন তাদের স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ আয়াতের উপর ভিত্তি করেই নারী স্বাধীনতা দিয়েছেন। ইউরোপিয়ানিরা এত উন্নতি সাধন করার একমাত্র কারণ হল নারী স্বাধীনতা। ইউরোপিয়ান নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে

যাচ্ছে। মুসলিম দেশের এত পিছনে পড়ে থাকার কারণ হল নারীদের ঘরে বন্দি করে রাখা। তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে দেয় না। নারীরা অনেক কাজ করতে পারে। কিন্তু তাদেরকে সে সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। তাই মুসলিম সমাজ এত পিছনে রয়েছে। তাই আমাদের সরকার নারীদের প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দেশের উন্নতির সাথে সাথে ব্যক্তি উন্নতির দ্বার খুলে দিয়েছেন। আর আপনারা নারী স্বাধীনতা ও সম অধিকারের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন। আপনাদের ফতোয়ার কারণে আপনাদের কোন নারীই দেখতে পারে না। কথাও শুনতে পারে না)।

উক্ত মাওলানার যবান থেকে কোরআনের এই অপব্যাখ্যা শুনে শরীর শিউরেয়ে উঠল। কিন্তু বলার কিছুই ছিল না। কারণ একদিকে আমি বোবার ভান ধরে আছি অপর দিকে হাত-পায়ে বেড়ি লাগানো। কিছু বলতে গেলে কোন মসিবতে পড়তে হয় তা কে জানে। এজন্যই আমি নীরব ভুমিকা পালন করছিলাম। কিন্তু আমার সহকর্মী ভাই ইজদান তা সহ্য করতে পারল না। তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন–

(জনাব মাওলানা সাহেব, আপনি যে মিষ্টার কামালের কেনা গোলাম ও চামচা তা প্রথমেই চিনতে ভুল করিনি। অর্থের লোভে ঈমান বিক্রি করা যায় না। আপনি অর্থের পিছনে পড়ে ঈমান বিক্রি করেছেন। কোরআন-হাদিসের মনগড়া অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। আপনার এ ওয়াজ-নসিহত যদি মুর্খ মানুষ শুনে, তাহলে তারা বুঝবে বেচারা কোরাআনের রেফারেন্স দিয়ে বুঝাচ্ছেন। আসলে, কথাগুলো সত্য। একমাত্র আলেমরাই বুঝতে পারবে আপনি কত বড় মিথ্যুক ও অপব্যাখ্যাকারী ফেতনাবাজ আলেম। আপনি বলেছেন, আমরা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরোধিতা করে কোরআন ও হাদিসের অবমাননা করেছি। আসলে আমরা কোরআন হাদিসের উপর আমল করেছি। আপনাদের আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান হল জালেম। তিনি কোরানের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছেন। দ্বীনদার-পরহেজগার, আলেম-ওলামাকে হত্যা করেছে। অতএব কামাল একজন জালেম শাসনকর্তা। রাসুল সাঃ বলেছেন, জালেম বাদশার বিরুদ্ধে কথা বলা বড় জিহাদ। জালেমের জন্য দোয়া করতে কোরআন নিষেধ করেছে। নিষেধ করেছে জালেমের সমর্থন করা। তাই আমরা মিষ্টার কামালের বিরোধিতা করছি।)

তাছাড়া আপনি আরো বলেছেন যে, আমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি। এটাও স্পষ্ট মিথ্যা অভিযোগ। কারণ মিষ্টার কামাল নতুন ধর্মের প্রণয়ন করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। কামাল ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বলেছেন সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। কোন ধর্মকে অবজ্ঞা করা যাবে না। খারাপ মনে করা যাবে না। এটা যদি কেউ বিশ্বাস করে তাহলে ঈমান থাকবে না। কারণ, আল্লাহ পাক বলেছেন একমাত্র ইসলামই হল আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম। অন্য যত ধর্ম আছে, তা সবই কাল্পনিক। তা মানা যাবে না। সমর্থন করা যাবে না। বিশ্বাস করা যাবেনা। কোন মুসলমান সব ধর্মকে সমর্থন করতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল ধর্মহীনতা। সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে হলে হিন্দুদের মত ৩৩ কোটি দেবতাকে মানতে হবে। মূর্তিপুজা,লিঙ্গপুজা করতে হবে। খৃষ্টানদের মত তিনজন খোদাকে মানতে হবে। আর এসব করতে হলে সে কি মুসলমান থাকে? তাছাড়া যে যেই ধর্মকে ভাল জানে, সে সেই ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে। এতেও বুঝা যায় সে অন্য ধর্মের চেয়ে নিজ ধর্মকে বেশি প্রাধান্য দেয়, বিশ্বাস করে। কাজেই ধর্ম নিরপেক্ষতা একমাত্র পাগলের কাছেই পাওয়া যায়। তাছাড়া আপনি আরো বলেছেন-

মিস্টার কামাল পাশা কোরআনের নির্দেশমতে নারীদের স্বাধীনতা দিয়েছে। নারী স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, নারীরা পর্দা লঙ্ঘন করে স্কার্ট জাইঙ্গা,হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরে পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে বিচরণ করবে। নারী স্বাধনতার অর্থ এই নয় যে, তারা আন্ডার প্যান্ট পরে হাজার হাজার দর্শকের সামনে ফুটবল খেলবে। স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষের সাথে কাবাডি খেলায় প্রতিযোগিতা করবে। চুল কেটে রাস্তায় ঘোরাফেরা করবে। নারী স্বাধীনতা আইন পাশ করার পর সামান্য মনো মালিন্য হওয়ার কারণে মাছুম বাচ্চা রেখে স্বামীকে ত্যাগ করে অন্যের নিকট চলে গেছে। হাজার হাজার পরিবারে অশন্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। জিনা, ব্যাভিচারের পথ সুগম হয়েছে। তাই আমরা নাস্তিক কামালের বিরোধিতা করছি।

এতটুকু বলতে না বলতেই মাওলানা সাহেব উঠে চলে গেলেন। মাওলানা সাহেব গিয়ে ইজদানের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিলেন।

পরদিন জেলকর্মকর্তা ইজদানকে আফিসে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি আইন লঙ্ঘন করেছেন। সরকারের বিরুদ্ধে কটুক্তি করেছেন। এ অপরাধে তিন মাসের সাজার পরিবর্তে যাবজ্জীবন সাজা বর্ধিত করা হল। তৎসহ ডাবল বেরির নির্দেশ দেয়া হল। তারপর ইজদানকে ডাবল বেড়ি পড়িয়ে দিল এবং অন্য কোন বন্দির সাথে সম্পূর্ন কথা বলা নিষেধ করে দিল।

ষোল

অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়ে একটি মাস নিষ্ঠুর কারাগারে অতিবাহিত হল। এর মধ্যে কোন দিন যবান খুলিনি ভাবলাম, এখন যদি যবান খুলি, তাহলে আমার বোবার ভান ধরার রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। অনেক দিন ঈমান বিধ্বংসী কথাবার্তা শুনে মুখ খুলতে চেয়েছি । পরক্ষণই ভাবলাম কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। তখন হীতে বিপরীত হয়ে যাবে। কারাগারের ভিতর রয়েছে অনেক গুপ্তচর। এরা তো ক্ষমা করবে না। বাকি দুটি মাস যদি আল্লাহ আল্লাহ করে কাটাতে পারি আর ছাড়া পেয়ে যাই, তাহলে দ্বীনের কিছু কিছু খেদমত করা যাবে। তাই মুখ বুঝে সব নীরবে সহ্য করে যেতে লাগলাম।

কারাগারে অনেক আলেম, উলামা ও মুজাহিদের সাথে প্রতিদিনই দেখা-সাক্ষাত হয়। কিন্তু আমরা যাদের মুক্তির জন্য এতদুর সফর করেছি ,এত জুলুম-অত্যাচার বরদাস্ত করেছি তাদের তো কোন সন্ধান পেলাম না। মাওলানার সাহেবের সাথে বাকবিতন্ডার কারণে ইজদানকে ভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়ে গেছে। এর আগে তার সাথে গোপনে পরামর্শ করতে পারতাম। এখন সে পথও রইল না। এক দিকে আমি কথা বলি না আর সন্ধান নিতে পারি না। তা দিনরাত চিন্তা করি ও আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকি।

পয়তাল্লিশ দিন পর বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে বেছে একশ আসামীকে নিয়ে যায় খিবা থেকে প্রায় দুইশ কিলোমিটার দূরে ক্যাস্পিয়ান সাগর অববাহিকায়। সেখানে একটি মিনি সেনানিবাস স্থাপন করবে। তাই শ্রমিক হিসাবে আমাদেরকে নিয়ে যায়। ক্যাস্পিয়ান সাগর তীর ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে রাওয়াল পর্বতমালা। রাওয়াল এর পশ্চিমে ক্যাস্পিয়ান সাগর, উত্তর পশ্চিমে আকতাই ভস্ক। আর উত্তর-পূর্বে চিমবেই অবস্থিত। মিষ্টার কামাল সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে দেশের নিরাপত্তা আরো জোরদার করার জন্য মারবিয়া উপত্যকায় একটি মিনি সেনানিবাস তৈরি করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। রাওয়াল পর্বতবেষ্টিত মারবিয়া উপত্যকা। মারবিয়া বিশাল এক সমতল ভূমি। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। মারবিয় উপত্যকায় পৌছতে ৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ রাস্তার প্রয়োজন। পাহাড় না কেটে রাস্তা তৈরি করা আদৌ সম্ভব নয়। এ রাস্তা নির্মাণের কাজেই আমাকে নিয়ে গেছে সেখানে। আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২ ঘন্টাই কাজ করি। পাথুরে মাটি কি শক্ত। কোদাল, শাবল ও কুঠার ফিরে আসে। মাঝে-মধ্যে বড় বড় পাথরের সাথে সাক্ষাত হয়। এসব পাথর না সরিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই বড় বড় হামার পিটিয়ে তা ভাঙ্গতে হয়। আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। প্রকাশ পায়। আহাঃ কি কষ্ট।

আমাদের থাকার কোন ব্যবস্থা করেনি। সারারাত খোলা আকাশের নিচে থাকতে হয়। রাত্রে সবাইকে লম্বা শিকলে বেঁধে রাখে। আমরা পুলিশের থাকার জন্য বাঁশ ও টিন দিয়ে ঘর তৈরি করে দিয়েছি। তাছাড়া দশটি তাঁবু রচনা করেছি। কিন্তু আমাদের থাকার কোন ব্যাবস্থা করেনি। এখানে আমাদের পেট ভরে তিন বেলা আহার দিত। রান্না-বান্নার কাজ আমাদেরকেই করতে হত। পুলিশদের সংখ্যা ছিল দুইশ । তাদের রান্না-বান্নার কাজও আমাদেরই করতে হত। তাদের জন্য তৈরি হত উন্নত আটা রুটি। প্রতিদিন চাউল ও সবজী পাকানো হত। আর এক দিন পর পর পাক করা হত খাসির গোস্ত। আর আমাদের তাকদিরে ভুট্টার মোটা আটার রুটি এর সাথে চাউল বা সবজি কিছুই দিত না। তাদের অনেক সুস্বাদু খাবার বাইরে ফেলে দিত। কিন্তু আমাদেরকে দিত না। দিনে দশ ঘন্টা কাজ করেও তাদের মন জয় করতে পারিনি। সব সময় আমাদেরকে গালি দিত। ইস সেকি খারাপ গালি। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার কারণে পোশাক পরিচ্ছদ সর্বদা থাকত ঘর্মশিক্ত। তবু গোসল করার সুযোগ দিত না। দিত

না পোশাক পাল্টানোর সময়টুকু। পঁচা গন্ধে প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হত। চার-পাচদিন পরপর গরু-মহিষের মত হাঁকিয়ে নিয়ে যেত সমুদ্রের তীরে। গোসল করার সময় দু-এক মিনিট। এক-দুই ডুব দিয়ে তাড়াতাড়ি গোসলের কাজ সেরে নিতাম।

আমি দু-দেড় মাসে তুর্কি ভাষা আয়ত্ব করে নিয়েছিলাম। বলতে কষ্ট হলেও অন্যদের ভাষা বুঝতে কষ্ট হত না। মনে মনে একা একা অনেক আলাপ করতাম। কিন্তু অন্যের কাছে বলতাম না। কারণ, আমি তো বোবার ভান ধরে ছিলাম। তাই অন্যের সাথে আলাপ করলে গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে। এজন্যই নিজে নিজে অনুশীলন করতাম।

একদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে সকলেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যেত না। সকলেরই একই অবস্থা। সুবেদার আমাদোর এ অবস্থা দেখে পাষাণ হৃদয়ে সামান্য দয়ার উদ্রেগ হল। তিনি সবাইকে লক্ষ করে বললেন, এই শালারা, তোরা আজ অনেক পরিশ্রম করেছিস এখন খানা খেয়ে গোসল করে বিশ্রাম নে। আজ আর কাজ করা লাগবে না। তারপর অন্যদিনের মতই নিয়ে গেল সাগরে। বলল, যা বিশ মিনিট সময় দিলাম। ভালভাবে গোসল করে নে। আমরা মনের আনন্দে গোসল করলাম। গোসল করে এসে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। পুলিশরা দুরে বসে টইল দিচ্ছে। এর মধ্যে তিন-চারজন বন্দি চুপিচুপি আলাপ করছে। তাদের আলাপ-আলোচনা বুঝতে পারলাম। এরাই আমাদের কাংখিত লোকগুলো, যাদের উদ্ধারের জন্য এত দূর পথ সফর করে এসেছি এবং কষ্ট করছি। আমি গোপনে তাদেরকে জানিয়ে দিলাম যে, আমরা জনাব জালাল দামালা গৌরানির পক্ষ থেকে তোমাদের মুক্তির জন্য এসে বন্দি হয়েছি। তিন মাসের জন্য আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেছে। আশা করি ১৫/২০দিন পর ছাড়া পাব। আমি ফিরে গিয়ে তোমাদেরকে মুক্ত করব ইনশাআল্লাহ। তোমরা কোন চিন্তা কর না। ।বেশি বেশি দোয়া করতে থাক।

তাদের নিকট আমার সফরসঙ্গী ইজদানের বন্দীর সংবাদও জানালাম। মুক্তি সংবাদ পেয়ে নুরানী আভায় চেহারা উজ্জল হয়ে উঠল। বেশি বেশি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করতে লাগল।

আমি সাথীদেরকে সান্তনা দিতে গিয়ে বললাম, হে আমার প্রাণপ্রিয় মুজাহিদ সাথী ও বন্ধুরা, আল্লাহর রাসুল সাঃ বলেছেন, দুনিয়া মোমেনের জন্য কারগার আর কাফিরদের জন্য জান্নাত। এ হিসাবে আমরা সবাই

কারাগারে বন্দি। অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানই কারাগারে বন্দি। এরপর আমরা কজন দুনিয়া নামক কারাগারে, জেলখানা নামক সেলে আছি। এর চেয়ে বেশি কিছু না। জাহান্নাম থেকে তো দুনিয়ার কারাগার কোটি গুণে ভাল। আমরা চুরি করিনি, ডাকাতি করিনি, অন্যের মাল লুণ্ঠন করিনি। আমরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করছি। আমাদের লড়াই হক বাতিলের লড়াই, ন্যায়ের লড়াই দ্বীন প্রতিষ্ঠার লড়াই। কাজেই আমরা ঈমানী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। আমরা জয়-পরাজয়ের ধার ধারিনা। কে হারবে কে জিতবে তার পরোয়া করি না। বাচব না মরব এসব ভাবনা ভাবি না। সর্বাবস্থায় মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা রয়েছে। কাজেই হীনবল হওয়ার কোন কারণ নেই। বেহেস্ত আমাদের জন্য এমারত নির্মিত করা হচ্ছে। নির্ঝরনি কল কল তানে বয়ে যাচ্ছে। নহর অববাহিকায় অপরূপ সুন্দরী হুরেরা অপেক্ষা করছে। গেলমানরা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অতএব তোমরা ভয় পেওনা মন ভেঙ্গেনা। কিছু দিন সবর কর। এই তো তোমাদের মুক্তির পয়গাম নিয়ে আবার আসছি।

আমার কথা শুনে সকলেই খুব খুশি হল বটে, কিন্তু যদি মুক্তি না পাই, সে চিন্তাও অনেকের দিলের মধ্যে। একজন বলেই ফেলল, পনের-বিশ দিনের মধ্যেই আপনার ছাড়া পাওয়ার কথা কিন্তু ছাড়বে কিনা তা মোটেই বলা যায় না। এর আগেও সন্দেহভাজন কয়েকজন বন্দিকে ছেড়ে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছাড়েনি। ওর কথা শুনে আমিও চিন্তায় পড়ে গেলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন উপায় নেই। ওদেরকে বললাম, খুব বেশি বেশি দোয়া করতে থাক।

আমরা সারা বিকাল বিশ্রামেই কাটালাম। সন্ধা নেমে এল। রাতে আহার করতে দেয়নি। আমরা হায়েনাদের খাবার তৈরি করে দিয়েছি। কিন্তু বিকালে কাজ করিনি বলে খাবার দেয়নি। সারারাত সকলেই ক্ষুধায় ছটফট করতে লাগলাম। ভোরে সকলেই চলে গেল পাহাড় কাটার কাজে। আমি মাজুর হিসাবে যদিও মাটি কাটতে দেয়নি, বাসায় বসিয়েও খাওয়নি। রান্নার কাজে সাহায্য করতে হত। এভাবে কেটে গেল বিশ দিন। তারপর আরো ৬০জন বন্দিকে আনা হল কাজের জন্য।

অতঃপর একদিন সুবেদার সন্ধা বেলা এসে ১৫ জন বন্দির নাম ডেকে এক সারিতে দঁড় করিয়ে বলল, বন্দিগণ, আমি যাদের নাম ঘোষণা করেছি

তারা খালাস। এক্ষুনি তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তোমারা নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে কামাল পাশার গুণ গাইবে আর যেন কেউ আইনের অমর্যাদা না করে। যদি আইনের অমর্যাদা করে, তাহলে এ ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ সংবাদ তোমাদের এলাকায় ছড়িয়ে দিবে। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দির নামের তালিকার মধ্যে আমার নামটাও ছিল। সুবেদারের কথা শেষ হওয়ার পর আমাদেরকে বের করে দিল। আমরা কয়েজন মিলে করজোরে নিবেদন করলাম, হুজুর আমাদেরকে একটি রাতের জন্য অবকাশ দিন। আমরা অন্ধকার রাতে কোথায় যাব?পথ নেই,ঘাট নেই। নেই আশেপাশে কোন লোকালয়। নেই কোন যানবাহন। পার্বত্য অরণ্যে রয়েছে হিংস্র প্রাণী। আত্মরক্ষার মত কোন অবলম্বনও আমাদের নেই। এতএব আজ রাতটুকু আমাদেরকে এখানে থাকার অনুমতি দিন।

আমাদের কথা শুনে সুবেদার বন্য বরাহের মত দন্ত প্রকাশ করে কস্তাকৃতি চক্ষুদ্বয় কপালে তুলে বলল, শালারা,। মুক্তি পাওয়ার পরও দেখি এখানেই থাকতে চাচ্ছিস। এখানে যদি তোদের এতই ভাল লাগে, তাহলে আরো কয়েক বৎসর থাক কোন আপত্তি নেই। নেই কোন অভিযোগ। তোমরা বলছ, যাবাহন নেই, এটা কি মামুর বাড়ি মনে করছ। বদমাইশ শালারা। যা এক্ষুনি যা। বিলম্ব হলে আর যেতে দেয়া হবে না। এ বলে চর্মনির্মিত চাবুক হাতে নিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে দুজন সাথীকে ধপাস ধপাস মেরে বসল। আমরা নিরুপায় হয়ে হাবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

সুবেদারের আচরণে বুঝতে পারলাম যে, ওরা আমাদেরকে অন্ধকার রজনিতে বাঘ-ভাল্লুকের মুখে ঠেলে দিতে চায়। আমরা যেন জ্যান্ত আপন নিবাসে ফিরে যেতে না পারি। তাদের কু-মতলবের প্রতিবাদ করার সাহস পেলাম না। অগত্যা সাথীদেরকে ইশারায় বললাম, এখানে আর কাল ক্ষেপন না করে চল এদের চোখের আড়ালে চলে যাই। এখানে থাকলে অনর্থের সৃষ্টি হবে। তার পর সকল সাথীকে আলবিদা জানিয়ে তাদের সম্মুখ থেকে চলে এলাম।

সতের

গভীর রজনী। চার দিক নিরব নিথর। মনে হয় কে যেন মসিভান্ড ঢেলে দিয়েছে রাতের গায়ে। দু-তিন হাত দূরের বিশালাকৃতির কোন প্রস্তর বিটপী দৃষ্টি গোচর হয় না। আমরা বিপদসংকুল বন্ধুর গিরিপথ বেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। কিছুদূর পথ অতিক্রম করতেই কর্ণকুহরে ভেসে এলো গগনবিদারী শার্দূলগর্জন। মনে হয় আকাশচুম্বি পর্বতমালা ভেঙ্গে খান খান হয়ে ছিটকে পড়বে ভূমিতলে। আমরা জীবনাশংকায় ১৫ জন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কৃষ্ণশিলায় নির্মিত আলেখ্যের ন্যায় দাঁড়ি থাকি।

ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে জীবন ওষ্ঠাগত। অরণ্য পথ পাড়ি দিয়ে লোকালয়ের সন্ধান যে কত দিনে পাব, তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। তবুও বাঁচার তাকিদে পথ চলছি। শার্দলগর্জন ডানে ফেলে আমরা বাম দিকে অগ্রসর হচ্ছি। কৃষ্ণপক্ষের তিমির যামিনী। চন্দ্রালোকের সাক্ষাত পাব না। দূরাকাশে কিছু তারকা আমাদের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাসছিল। এখন আর তা নেই। কারণ, কূহেলিকায় সব ঢাকা পড়ে আছে। তারকাগুলো এতক্ষণ দিকদর্শনের কাজ করতো। এখন আর তা করছে না। একজন দিকভ্রম নাবিক মহাসমুদ্রে জাহাজ নিয়ে যেমন বিপাকে পড়ে, আমাদের অবস্থা তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহটির ভার বহন করে পদযুগল আর সম্মুখে অগ্রসর হতে পারছে না। পারছে না পর্বতারোহণে সাহায্য করতে। এই বুঝি জীবন গেল। এই বুঝি আজরাঈলের সাথে সাক্ষাত ঘটবে। সাথীদের অবস্থা আমার চেয়েও করুণ। এমতাবস্থায় খানিকটা যাত্রা বিরতি দিয়ে একটি পাদপ মূলে বসে সবাইকে বললাম, ভাইয়েরা আমার! আমাদের কষ্টের রজনীর আর মাত্র কয়েক ঘন্ট পর অবশ্যই অবসান

ঘটবে। সোবহে সাদিকের নূরানী আভা স্বাগত জানাবে। তোমরা এত বিচলিত হয়ো না। একটু অপেক্ষা কর।

আমি আরও বললাম, বন্ধুগণ! আমরা মানবিক কারণে বন্য হায়েনাদের কারণে শংকিত। আসলে তা নয়। বন্য হায়েনারা মানুষকে ভয় পায়। সহজে মানুষের উপর আক্রমণ করে না ওরা। কিন্তু মানুষই হলো মানুষের বড় শত্রু। মানুষ নামক হায়েনাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন। প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আপনারা বন্য পশুদেরকে মোটেই ভয় পাবেন না। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখুন। আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে হেফাজত করবেন। আর যদি আমরা হিংস্র প্রাণীদের খোরাক হয়ে থাকি, তা হলে এথেকে চেষ্টা করেও রেহাই পাব না। তাকদিরে যা লিখন রয়েছে, তা ঘটবেই ঘটবে। এথেকে বাঁচা যাবে না। আমরা যদি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করতে পারি ও ধৈর্যধারণ করতে পারি, তবে তিনিই আমাদেরকে এমহাবিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। চলো, আমরা তায়াম্মুম করে বিপদ উদ্ধারের জন্য সালাতুল হাজাত আদায় করি।

আমার কথা শুনে সাথীদের মনোবল অনেকটা চাঙ্গা হলো। তার পর সকলেই তায়াম্মুম করে সালাত আদায়ের জন্য দন্ডায়মান হলাম। কিন্তু কেবলা দিক কারো জানা নেই। তার পর কেবলা দিক কোনটি হবে এনিয়ে পরামর্শ করলাম। অধিকাংশের খেয়াল অনুসারে দুরাকাত সালাত আদায় করে মোনাজাত করলাম। প্রার্থনা পরিচালনার জন্য সকলেই আমার উপর ভার দিলেন। আমি দুটি হাত প্রসারণপূর্বক বললাম, প্রভু হে! আমরা তোমারই অনুগত বান্দা। যদিও গোনহের কোন হিসাব আমাদের কাছে নেই, তবু আমরা তোমারই দাস আর তোমারই চরণতলে মাথা ঠেকাই। অতএব আমাদের সমুদয় পাপরাশিকে ক্ষমা করে দাও। তুমিই ক্ষমা করতে পার। কেননা, তোমার নাম গাফফার। আমরা মজলুম আর তুমি হলে মজলুমের সাহায্যকারী। অতএব আমাদেরকে এমহাবিপদ থেকে রক্ষা করো। আমার দোয়ার ফাঁকে ফাঁকে কান্নামিশ্রিত আমীন, আমীন শব্দে তিমির রজনীর নিরবতা ভঙ্গ হলো। কান্নার করুণ শব্দে কান্তার বাসির [illegible]। ভঙ্গ হলো। হিংস্র হায়েনারা দল ছেড়ে দিগ্বিদিক ছুটে পালাতে লাগল। হায়েনাদের পালানোর শব্দে আমাদের শরীর শিউরিয়ে উঠল। অদুরে কি একটি জানোয়ার হুমড়ি খেয়ে ভূবন কাঁপানো হুংকার ছেড়ে নিমিষেই যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমরা সম্মুখে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রইলাম। আমাদের এক সাথী বিনীত কণ্ঠে বলল, ভাইজান! এ গহীন অরণ্যে জিন-ভুত যে নেই সে কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে না। আপনারা লক্ষ করেছেন কিনা জানি না, আমি একটু আগে দেখেছি বিশাল কৃতির এক অগ্নিকুন্ডলি আমাদের সম্মুখের পাহাড় থেকে প্রকাশ পেয়ে পার্শ্বস্থিত অন্য এক পাহাড়ে তড়িৎবেগে ,পতিত হচ্ছে। তার কথা শুনে অনেকেই সায় দিয়ে বলে উঠলহ্যাঁ তা সত্য, আমরাও তা অবলোকন করেছি; কিন্তু ভয়ে প্রকাশ করিনি।

ওর কথা শুনে বললাম, দেখ তোমাদের ভয়ে ভীত হয়ে বন্য হায়েনারা দ্রুত পালিয়েছে। তোমাদের ভয়ে জিন-ভুতও পালাবে। রাসুল সাঃ বলেছেন, আযানের শব্দ শুনে শয়তান ও জিনরা বাতকর্ম করতে করতে পালায়। পিছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার মত সময়টুকু পায় না। তোমাদের যদি এতই ভয় হয়, তাহলে চল একযোগে আযান দেই। আমার কথা শুনে সকলেই বজ্রকণ্ঠে আযান দিতে লাগল। আযানের পর পরই পূর্ব আকাশে সুবহে সাদিকের আভা প্রকাশ পেতে লাগল। সকলের মনেই আশার সঞ্চার হলো। এই বুঝি বেঁচে গেলাম। তিমিরাচ্ছন্ন যমিনের অবসান হল। অতঃপর আমরা তায়াম্মুম করে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে কিছু তাছবিহ আদায় করে মহান রাব্বুল আলামীনের সমীপে সকাতরে প্রার্থনা করলাম,। এতক্ষণে শিশু রবি আত্মপ্রকাশ করলো। আমরা নতুনভাবে কোমর বেঁধে আবার হাঁটতে লাগলাম।

দুপুর বারটার দিকে আমরা মারবিয়া উপত্যকা পাড়ি দিয়ে পূর্ব-দক্ষিণে চলে আসি। এখানকার পাহাড়গুলো রাওয়াল পর্বতের মত এত খাড়া নয়। তাছাড়া বন-জঙ্গল তত ঘন নয়। পথচলা অনেকটা আসান। এতক্ষণে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে চলার গতি থেমে গেল। যোহরের নামায আদায় করে সকলেই ভূপৃষ্ঠে লুটিয়ে পড়ল। তাদের এই অবস্থা দেখে বললাম, বন্ধুগণ, তোমরা বিশ্রাম নাও। আমি দেখি কোন ঝর্নার সন্ধান পাই কিনা। কিছু পানি পান করতে পারলে আরো কিছুক্ষণ পথ চলা যাবে। এই বলে বেরিয়ে পড়লাম পানির সন্ধানে।

প্রায় এক ঘন্টা খোঁজা-খুঁজির পর অনেকটা নিরাশ হয়ে পড়লাম। তবু আল্লাহর উপর ভরসা করে খোঁজ করতে লাগলাম। এরই মধ্যে কি একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। এটা কিসের আওয়াজ তা ঠাহর করতে পারিনি।

আরো একটু এগিয়ে যেতেই পানির কল কল শব্দ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। নিকটে গিয়ে দেখি, পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত হয়ে আঁকা-বাঁকা চলে গেছে বহুদূর। প্রবাহিত স্রোত পাথরে ধাক্কা খেয়ে কল কল আর্তনাদে বয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর শোকর আদায় করে মিষ্টি পানি পেট ভরে পান করে সাথীদের নিকট নিয়ে গেলাম। ঝর্নার সুসংবাদ পেয়ে সকলেই আমার পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝর্নার নিকট এসে হাজির হলাম। সকলেই উদর পূর্ণ করে ঠান্ডা পানি পান করে কলিজা শীতল করল। আবার অনেকেই গোসল করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি ওদেরকে ঝর্নার নিকটে বসিয়ে কোন ফলমূলের সন্ধানে বের হয়ে গেলাম। একটু সামনেই দেখি ঝর্নার দুধারে লতানো গাছগুলোর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শশা জাতীয় এক প্রকার ফল ধরে আছে। এগুলো শশার মতই খাওয়া যায়। আমি অনেকগুলো শশা রুমালে বেঁধে সাথিদের নিকট নিয়ে গেলাম। সকলেই পেট ভরে আহার করল। বড় সুস্বাদু ফল। তা খেয়ে সকলেই সেজদাবনত মস্তকে আল্লাহর শোকর আদায় করল। প্রচন্ড ক্ষুধার পর আহার করায় আরো বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাই সকলেই এখানে রাত্র যাপন করল। এখন বেলাও বেশি বাকি নেই। পশ্চিমের পাহাড়ের ছায়ায় ক্রমশই লম্বমান হয়ে পূর্ব দিকে বিস্তার করছে। সন্ধার আগমনী গান গেয়ে পাখিরা আপন নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য অস্তমিত হয়ে যাবে।

রাতের আহারের জন্য সাথীদেরকে নিয়ে বন্যশশা কুড়িয়ে আনলাম। কিছু শুকনো ডাল-পালা ও লতা-পাতা এনে জমা করলাম। কারণ, রাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখলে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমরা মাগরিবের নামায আদায় করে সরবে জিকির আরম্ভ করলাম। তার পর এশার নামায সমাপন করে শশা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। দুজন দুজন করে পাহারাদারি করে রাত্রি পোহালাম। তার পর সকলেই শশা গাঠুরী বেঁধে সামনে চলতে লাগলাম।

লাগাতার ৫দিন পথ চলার পর পাহাড়ী এলাকার অবসান হলো। সম্মুখে পেলাম এক খরাস্রোতা নদী। নদীটি রাওযান পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে চলে গেছে বহুদূর। নদীটি অনেক গভীর। মাঝে মাঝেই দৃষ্টিগোচর হয় ঘূর্ণাবর্ত। স্রোত প্রচুর। স্রোতের তোড়ে ভেসে যাবে জ্যান্ত হাতী। পারাপারের জন্য নেই কোন নৌযান।

আর থাকবেই বা কেন? এদিকে তো নেই কোন শহর-বন্দর,পথ-ঘাট ও জনবসতি। আমাদের ধারণা, নদী পার হয়ে পূর্ব দিকে গেলে লোকালয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই যেভাবেই হোক নদী পার হতেই হবে। আমরা নদীর কূলঘেঁষে হাঁটতে লাগলাম। একজন সাথী পানির নিকটস্ত নরম মাটির দিকে ইংগিত করে বললো "এই দেখুন বন্য হায়েনাদের পায়ের ছাপ লেগে আছে। এরা নদীতে পানি পান করতে আসে। এভাবে পথচলা মোটেই উচিত নয়। যে কোন সময় তাদের খোরাক হতে হবে।

হিংস্র প্রাণীর পদচিহ্ন দেখে সকলেই ভয় পেয়ে গেল। আমিও যে ভয় পাইনি এমন নয়। কিন্তু করার কিছু ছিল না। আমি ওদেরকে অভয় দিয়ে বললাম, প্রিয় সাথীরা! আমরা যদি বন্য পশুদের খোরাক হয়ে থাকি, তবে ওরা আমাদের কেশ পরিমাণও ক্ষতি করতে পারবে না। তার পর অতীতের সিংহের কাহিনী শুনিয়ে দিলাম।

চলতে চলতে কিছু দূর গিয়ে দেখলাম স্রোতের বেগ অনেক কম। একটু চেষ্টা করলে সাঁতরে পার হওয়া যাবে। গভীরভাবে তাকিয়ে দেখি অনেক কুমির সাঁতার কাটছে। আহঃ কত ভয়ংকর কান্ড। কার সাধ্য আছে কুমির আর হাঙ্গরের মধ্যদিয়ে সাঁতার কেটে ওপারে যাওয়ার। আমরা আরো সামনে যেতে লাগলাম। এবার দেখি নদীটা দু ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, স্রোতও তেমন নেই। গভীরতাও অনেক কম। মনে হয় অল্প ক্লেশে পার হওয়া যাবে। কুমির আর হাঙ্গরের আনাগোনাও দেখা যায় না। আমরা মোহনা থেকে আরোও একটু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখি নদীর চড়ায় অনেক বাঘ শুয়ে আছে। আবার দু-একটি খেলা করছে। তা দেখে আবার পিছনে এসে নদীতে ঝাঁপ দিলাম। দেখি পানি অনেক কম। প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত হেটেই গেলাম। তার পর সামান্য সাঁতার কেটে আবার মাটির নাগাল পেলাম। এভাবে অতি সহজেই দুটি নদী পার হয়ে গেলাম।

এভাবে আরও দুই দিন পথ চলার পর লোকালয়ের সন্ধান পেলাম। জনবসতী পেয়েছি বটে; কিন্তু যানবাহনের কোন বালাই নেই। কারণ, পাহাড়ী এলাকাতে পথ-ঘাট নেই। নেই ঘন লোকালয়। আমি একজনকে খিবা শহরের দূরত্ব ও যাওয়ার পথ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন " আপনারা এক দিনের পথ পায়ে হেঁটে চললে খিবা যাওয়ার যানবাহন পাবেন। তিনি আরো বলেন, আপনারা খিবা যেতে হলে এখান থেকে সোজা দক্ষিণ ফারগান চলে যান। ফারগান সরাইখানাতে রাত্র যাপন

করতে পারবেন। সেখানে থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধে নেই। সরকারী খানা পিনার ব্যবস্থা রয়েছে। তার পর সকাল ৮ ঘটিকায় ফারগান থেকে টাংগা চলে। এঅঞ্চলের সাথে শহরের যোগাযোগের জন্য মিষ্টার কামাল পাশা এব্যবস্থা করেছেন। দৈনিক দশটি টাংগা যায় আর দশটি টাংগা শহর থেকে আসে। এভাবেই আপনাদেরকে খিবা পৌছতে হবে। তা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অগত্যা আমরা এভাবেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পল্লীবাসী ভদ্র লোকটির আচার-আচরণে আমরা খুবই মুগ্ধ হলাম। অনাহার-অর্ধাহার আর সংযুক্ত সফরের ক্লান্তি আমাদের সর্বাঙ্গে প্রস্ফুটিত। আমাদের শারীরিক অবস্থা হলো নরকংকাল যাদুঘরে রাখার মতো। আমাদের মলিন বসন-ভূষণ ও কৃশাঙ্গ দেখে ভদ্র লোকটির অন্তরে দয়ার সঞ্চার হলো। তিনি আমাদের সফরের কারণ জানতে চাইলে সব কিছু খুলে বললাম। লোকটি আমাদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং বাংলোয় বসতে দিলেন। তার পর প্রাথমিক অবস্থায় কিছু ফল এনে খেতে দিলেন। আমরা শোকরিয়ার সাথে গ্রহণ করলাম। তার কিছুক্ষণ পর গরম রুটি ও ভেড়ার গোস্তের ভুনা নিয়ে এসে বললেন" বাবাজীরা! তোমরা দু-তিন দিন এই গরীবালয়ে আতিথ্য গ্রহণ করো। বর্তমানে তোমাদের শারীরিক যে অবস্থা, এ অবস্থায় সফর করা সমীচীন নয়। তিন দিন বিশ্রাম নিলে অনেকটা চাঙ্গা হবে। তার পর সফর করলে অসুবিধা হবে না। লোকটির আদর-আপ্যায়ন এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। তাই এখানেই থেকে গেলাম। তিন দিন পর্যন্ত তিনি এত মেহমানদারী করলেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেখানে তিন দিন অবস্থান করে খিবা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

আঠার

খিবা পর্যন্ত পৌছতে আমাদের দুইদিন সময়,লেগে গেল। কারণ, একটা টাংগা ৬/৭ ঘন্টার বেশি চলতে পারে না। আর না পারারই কথা। কারণ, পথঘাট খুবই অনুন্নত। অশ্বগুলোও অনেক দুর্বল। মঞ্জিলে মঞ্জিলে বিশ্রাম নিয়ে পথ চলতে হতো। আমরা খিবা শহর থেকে এক ক্রোশ দূরে একটি মসজিদে রাত যাপনের জন্য ইমাম সাহেবের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তোমরা আমাদের অতিথি। মসজিদে নেই থাকার কোন বিছানা। তোমাদের কাছেও কোন বিছানাপত্র দেখছি না। এভাবে তো মসজিদে থাকা যাবে না। তোমরা আমার বাড়িতে অবস্থান কর। খাওয়ার একটু কষ্ট হলেও থাকার কোন কষ্ট হবে না। আমার মেহমানখানা খুব বড়। পনের বিশজন আনায়াসে থাকতে পারে।

ইমাম সাহেবের কথায় আমরা তার বাড়িতে থাকাটাই নিরাপদ মনে করে রাজি হয়ে গেলাম। আর রাজি না হয়েই অন্য কোন উপায় ছিল না। ইমাম সাহেব আমাদেরকে তার বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। খাওয়ার পর ইমাম সাহেব আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। কোথায় থাকি, কি করি,এ সফরের কারণ কি জানতে চাইলেন। আমি প্রথম দর্শনেই ইমাম সাহেবের মেজাজ দর্শন করেছি। কথা-বার্তায় মনোভাব বুঝতে পেরেছি। তাই আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা ইমাম সাহেবের নিকট প্রকাশ করেছি। তবে সফরের মূল উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই বলিনি।

ইমাম সাহেব আমার কথা শুনে দীর্ঘক্ষণ অবনত মস্তকে ধ্যান তাপসের মত বসে রইলেন। তারপর আল্লাহর আরশকাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, নাস্তিক কামাল পাশা কত যে নিরপরাধ মানুষকে তার নিষ্ঠুর জেলখানায় আবদ্ধ করে রেখেছে, কত যে মায়ের বুক খালি করেছে আর যুবতীকে করেছে স্বামীহারা, তার কোন ইয়ত্তা নেই। জালিম শাহীর মসনদে আঘাত

হানার মতো আর কোন মুজাহিদ গ্রুপ অবশিষ্ট নেই। যেভাবে সে তার আর্মী বাহিনীকে ঢেলে সাজিয়েছে, তা অন্য কোন রাষ্ট্র পারেনি। তাদেরকে পরাস্ত করাও অত সহজ নয়। আজ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হতে চলছে কোন অভিযান পরিচালনা করার সুযোগ হয়নি। আজ খুবায়েব জাম্বুলী বেঁচে থাকলে কোন না কোন খিত্তায় আক্রমণ হতো।

ইমাম সাহেবের কথা শুনে আমার ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি মুজাহিদ না হলেও জিহাদ সমথর্ক একজন ব্যক্তি। তাই তাকে প্রশ্ন করলাম, ভাই! আপনি খুবায়েব জাম্বুলীকে কি করে চিনেন, তিনি তো তুর্কমেনিস্তানের অধিবাসী নন?

ঃ খুবায়েব জাম্বুলী এদেশের অধিবাসী নন তা ঠিক, কিন্তু তাকে চিনে না বা তার নাম শুনেনি এমন লোক কমই আছে। তার প্রতিটি অভিযান ছিল অব্যর্থ। সে যত দিন বেঁচে ছিল, তত দিন নাস্তিকদের ঘুম হারাম ছিল। বিছানা তাদের পিঠের সাক্ষাত পায়নি।

ঃ তিনি কি এখন বেচে নেই?

ঃ মনে হয় তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। এখন আর কোন খোঁজ পাইনি।

ঃ আপনি কি কোন মুজাহিদ সদস্যকে চিনেন?

ঃ আপনার কাছে সত্য কথা বলতে কি, আমিও ছিলাম এ পথের পথিক। বিশেষ একটি দায়িত্ব দিয়ে আমাকে এ অঞ্চলে রাখা হয়েছে। এখনো কোন সুরাহা করতে পারিনি।

ইমাম সাহেবের কথা শুনে আমার শোণিতধারা প্রবলবেগে সঞ্চালিত হতে লাগল। তিনিই আওলাদ জান কি না নিজের সন্দেহ হল। আমি সরাসরি প্রশ্ন করে বসলাম যে, হুজুর! আপনি কি আওলাদ জান ? নাম শু চমকে উঠলেন এবং বললেন, হ্যাঁ আমি আওলাদ জান। আমার নাম জানলেন কি করে? ইতিপূর্বে তো আমার নাম জিজ্ঞাসা করেননি এবং আমিও বলিনি। উত্তরে আমি বললাম, আমি আপনার ঠিকানা নিয়ে এসেছি আফগানিস্তান থেকে। আপনার বন্ধু জালাল দামলা গৌরানী এ ঠিকানা দিয়েছে। জালাল দামলার কথা শুনে তিনি আরোও বিস্মিত হলেন। তাঁর সাথে কি পরিচয় তা জানতে চাইলে আমার পূর্ণ পরিচয়সহ জালাল দামলার সাথে যে সম্পর্ক তা জানিয়ে দিলাম এবং দামলা সাহেব কেন

আমাকে পাঠিয়েছেন তাও বললাম। বর্তমানে যে আমার সফরসঙ্গী ইজদান কাওড়ী কয়েদখানায় বন্দি আছেন, তাও জানাতে কসুর করিনি।

আমার কথা শুনে আওলাদ জান বললেন "আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং মহান রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শোকরিয়া এজন্য যে তিনি আপনাকে জালেমের হাত থেকে রক্ষা করে,হিংস্র হায়েনাদের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে সরাসরি আমার হাতে এনে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি তো আমুজান শহরে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। এখন দেখছি এখানে ইমামতি করেন। এব্যাপারে কিছু বলবেন কি? তিনি বললেন " চার মাস আগে এখানে ইমামতি নিয়েছি। আর এখনো ব্যবসা আছে। আমুজান শহর বেশী দূরে নয়। এখান থেকে টাংগা ৮/১০ মিনিটের রাস্তা। ইমামতির দায়িত্ব নেয়ার পিছনে অনেক রহস্য আছে। তা পরে জানবেন। এখন কথা হলো আপনি কি আমাদের সাথীদের মুক্তির ফিকির নিয়ে এসেছেন? উত্তরে আমি বললাম, আপনি দীর্ঘ দুই তিন বৎসরে কতটুকু কি করেছেন তা আগে শুনি। তার পর আমার চিন্ত চেতনা ও পরিকল্পনা সবই আপনার নিকট খুলে বলব। তবে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করে একথা বলতে পারি যে, আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে সাথীদেরকে বন্দিশালা থেকে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ।

আওলাদ জান আমার সাথে কারামুক্ত সাথীদের ব্যাপারে জানতে চাইলে বলালাম, ওরা সাধারণ দ্বীনদার-পরহেজগার লোক। মিষ্টার কামাল পাশা সন্দেহমূলকভাবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করে। দু-তিন মাস কারাবরণ করে মুক্তি লাভ করে। আমার ব্যাপারে তারা এমন কিছু জানে না। এখনো পর্যন্ত জিহাদ সম্পর্কে ওদের কাছে কোন আলোচনা করিনি। তবে এদের মধ্য থেকে ৫/৭ জন পাওয়া যেতে পারে, যারা জিহাদে অংশ নিবে। আপনি আলাপ করে তাদের মনোভাব জানতে পারেন। আওলাদ জানের সাথে কথাবার্তা হচ্ছিল এক নির্জন কুটিরে।

আমার কথা শুনে আওলাদ জান অন্যান্য সাথীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারলেন যে, এদের অনেকের বাড়ীই খিবা এলাকায়। ধর্ম নিরপেক্ষবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে গ্রেপ্তার করেছিল। তাছাড়া মুজাহিদদেরকে আর্থিক সহযোগিতা ও সমর্থন করতো। জেল খাটার পর তাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

মিষ্টার কামালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য জান-মাল নিয়ে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত।

সাথীদের কথা শুনে আমি বললাম, সত্যি যদি জিহাদ করার বাসনা থেকে থাকে, তা হলে কেউ জান নিয়ে আর কেউ মাল নিয়ে আবার কেউ জান-মাল উভয়টা নিয়ে এগিয়ে আসুন। অর্থাৎ যাদের জান এবং মাল উভয়টা আছে ,তারা জান এবং মালসহ আসুন। আর যাদের মাল নেই, তারা জান দিন আর যাদের জান দুর্বল তারা মাল দিন। তা হলে অল্প দিনের মধ্যেই আমরা মিষ্টার কামাল ও তার অনুগত বাহিনীর সাথে রণ খেলায় মেতে উঠতে পারব ইনশাআল্লাহ। আপনারা পরামর্শ করে আজকের মধ্যেই ফলাফল জানিয়ে দিন যেন আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

সাথীরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে এশার পর জানিয়ে দিলেন যে, আমরা দীর্ঘ দিন ছিলাম কারাবাসে, সয়েছি অসহ্যনীয় ও অমানুষিক নির্যাতন। তাছাড়া করেছি জানতোড় মেহনত। তাই শারীরিক অবস্থা কিরূপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন উন্নত চিকিৎসা, পুষ্টিকর খাবার ও বিশ্রাম নিতে হবে দীর্ঘ দিন। তার পর শরীরের অবস্থা স্বাভাবিকে ফিরে এলে যে কোন অভিযানে শরীক হতে পারব ইনশাল্লাহ।

ওদের কথা শুনে আমি নিজেও চিন্তা করে দেখলাম যে, কথাগুলো তো শতভাগই সত্য। এ অবস্থায় তাদের দ্বারা জেহাদের কাজ হবে না। তাই ওদেরকে বললাম, আগামী কাল আপনাদেরকে খিবা শহরে পৌছে দেব। সেখান থেকে নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যান এবং শরীরের যত্ন নিতে থাকুন। দুই-তিনমাস পর যদি সম্ভব হয়, তবে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারবেন। আর যাদেরকে আল্লাহ পাক ধন-দৌলত দান করেছেন, তারা সাধ্যানুযায়ী জেহাদের ফান্ডে অর্থ সাহায্য দিবেন। কেননা, একাজে প্রচুর অর্থের দরকার। আমার কথা শেষ হতে না হতেই চার-পাচঁজন বলে উঠলেন , ভাইজান! আপনি আমাদেরকে একা ছেড়ে দিবেন না আর আমরাও আপনাকে রেখে যাব না। আপনি আমাদেরকে অনেক বল-ভরসা ও আদর-সোহাগ দিয়ে এবং পথ দেখিয়ে এ পযর্ন্ত নিয়ে এসেছেন। আপনি না থাকলে হয়ত এ পযর্ন্ত আসা সম্ভব হত না। এখন আমরা জন্মভূমি ও নিজ এলাকায় ফিরে এসেছি। আর কোন ভয় নেই। সকলেই এখন একা বাড়ী যেতে পারবে। তাই বলে আপনাকে ছেড়ে যাব না।

আপনি আমাদের সাথে যাবেন। আমাদের বাড়ীতে জেহাদের ফান্ডে অনেক অর্থ কড়ি জমা আছে। এসব অর্থ আপনাকে দেয়া হবে।

উক্ত পাচঁজনের বাড়ী খিবা নগরীর অদূরে। আর বাকী নয়জনের বাড়ী খিবা থেকে প্রায় ৬০/৭০ ক্রোশ দূরে। এদের মধ্য থেকে একজন বললেন, "ভাইজান! আমরা তো খুবই গরীব। অর্থ-সম্পদ ও টাকা-পয়সা কিছুই নেই। তাই টাকা পয়সা দিতে পারব না বলে খুবই দুঃখিত ও লজ্জিত। তবে সদা সর্বদা কামিয়াবীর জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করব। আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই টাকা-পয়সা, এরচেয়ে বড় না। আপনারা আমাদের ইহও পরকালীন সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয় করুন। এটাই সবচেয়ে বড় চাওয়া-পাওয়া।

এসব পরামর্শের শেষে এশার নামায আদায় করে খানাপিনা সেরে অন্য সব সাথীদের ঘুম পাড়িয়ে আমরা একটি আঙ্গিনায় আম্রবৃক্ষের তলায় বসে পরামর্শ করতে লাগলাম। আওলাদ জান বললেন, "খুবায়েব! আমি গোপনে গোপনে বেশ কিছু বোমা গোলা-বারুদ ও বন্দুক সংগ্রহ করেছি। লোক হলে বড় ধরনের আক্রমণ করা যাবে। তা ছাড়া আমার নিকট জেহাদের ফান্ডে লক্ষাধিক টাকাও জমা রয়েছে। এসব অস্ত্র ও টাকা ব্যবহার করার মতো লোক আমার কাছে নেই। যারা ছিল ওরা সকলেই বন্দি। আমাজান ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লোক সংগ্রহ করা বর্তমান সময়ে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ নানান বেশে কামালের চৌকস গোয়েন্দারা ঘুরাফেরা করে।

আওলাদ জানের কথা শুনে বললাম আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি ওসব সাথীদেরকে বাড়ী পৌছে দিয়ে সোজা চলে যাব আফগানিস্তান। সে খানে বেশ কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক আমাদের মাননীয় আমীর জনাব জালাল দামলা গৌরানীর নিকট রয়েছে। কাবুল সরকার আমাদেরকে অস্ত্র দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আমি সেখান থেকে তাদেরকে নিয়ে যেভাবেই হোক রাওয়াল পর্বতে আশ্রয় নেব। তার পর যা হওয়ার তাই হবে। এজন্য দু-তিন মাস আপনাকে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে। পরামর্শ,শেষে সবাই শুয়ে পড়লাম।

উনিশ

ফজরের নামায আদায় করে নাস্তা- সেরে বিদায় কামনা করলে আওলাদ জান বললেন, "সামান্য সময় অপেক্ষা করুন। টাংগা রিজার্ভ করেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। টাংগাঅলার সব পথ-ঘাট পরিচিত। খিবায় পৌছে দেবে। একথা বলে তিনি কিছুক্ষণ পর বেশ কিছু রুটি, যবের ছাতু,ভূনা গোস্ত ও কয়েক মশক পানি নিয়ে এসে বললেন, "আপনারা এসব খাবার সাথে নিয়ে যান। আমাদেরকে যে পথে নিয়ে যাবে, সে পথে কোন হোটেল ও সরাইখানা পাবেন না। এগুলো সময় সময় খেয়ে নিবেন। এরই মধ্যে খটখট আওয়াজ তুলে টাংগা বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াল।

আমরা সকলেই খাবার ও পানি নিয়ে টাংগায় উঠে আসন গ্রহণ করলাম। টাংগাঅলা লাগাম টেনে কষাঘাত করতেই খটখট আওয়াজ তুলে উর্ধ্বশ্বাসে চলল খিবাভিমুখে। কত চড়াই, উৎড়াই, বালুময় ও কংকরময় মাঠ-ঘাট পেরিয়ে চলছে। আমাদের নিরাপত্তার জন্য খিবাগামি রাজপথ পরিত্যাগ করে আঁকাবাঁকা মেঠোপথ ধরে চলছে। এপথে সচারাচর টাংগা চলে না। রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। তাই সামান্য পথ চলতে না চলতেই ঘোটক ক্লান্ত হয়ে যায়। মুখ গহবর থেকে ফেনপুঞ্জ নিঃস্বরণ হতে থাকে। তাই বিশ্রাম নিতে নিতে পথ চলতে থাকে। অনেক কষ্টের পর রাত আনুমানিক ৮ টার দিকে আমাদেরকে খিবা শহরের কাছে পৌছে দেয়। আমরা খিবা শহরের প্রবেশদ্বারে পৌছে খবর পেলাম শহরে রাত্র কালীন কারফিউ জারি করেছে। রাস্তায় বের হলেই গুলি ছোড়ে।

এঅবস্থা দেখে একজন সাথী বললেন " শহরে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। আমরা শহরে প্রবেশ না করে গাঁয়ের পথ ধরে যেতে পারব। আমাদের মহল্লায় পৌছতে দুই-তিন ঘন্টা সময় লাগতে পারে। তার কথা শুনে আমি সবাইকে নিজ নিজ জিম্মায় বাড়ী যাওয়ার এজাজত দিয়ে

দিলাম। ওরা দুই-তিনজন এক সাথে যার যার বাড়ীতে চলে গেল আর আমাকে নিয়ে গেল অন্য পথে। আমরা সাথী তিনজন। রাত ১১ টায় আমরা একজন সাথীর বাড়ী পৌছলাম। বাকি দুজন সাথীর বাড়ী নিকটেই। ওরা তাঁদের বাড়ী চলে গেল। আমি যার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি,তার নাম রাফে গুল। রাফে গুলের মুক্তির সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল পুরা গ্রামে। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ছুটে আসল লোকজন তাকে দেখতে। অনেকেই ভাবছিল মিষ্টার কামাল তাদেরকে মেরে ফেলেছে। কৌতূহলী জনতার ভীড় জমিয়েছে মরা মানুষটিকে দেখতে।

রাফে গুল বাড়ীতে প্রবেশ করেই মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও সন্তাদের খোঁজ নিলেন। সকলেই তার সামনে হাজির। কিন্তু স্নেহময়ী মায়ের চেহারা দেখতে না পেয়ে মা-মা বলে চিৎকার দিলেন। কিন্তু কোন ঘর থেকে মা বেরিয়ে আসেননি। রাফে গুল-রাফে গুল বলে বুকে জড়িয়ে ধরেননি। তার পর জানতে পারলেন, রাফেগুল গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ পেয়ে মা হার্টফেল করেছিলেন। এ থেকে তিনি আর চোখ মেলেননি। জনমের মতো চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। ইসরাফিলের দ্বিতীয় সিঙ্গা ফুৎকারের আগে আর ঘুম ভাঙবে না। রাফেগুল মায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে এক চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। পরে জ্ঞান ফিরে পেলে আমি তাকে অনেক শান্তনা দিলাম।

আমি তিন দিন রাফে গুলের বাড়ীতে অবস্থান করে আফগানিস্তানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। রাফে গুল আমাকে বিদায় দেয়ার প্রাক্কালে তার কারাবন্দী সাথী ও স্থানীয় বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করলেন।। পরামর্শ বিষয়বস্তু ছিল আমাকে কোন পথে কিভাবে আফগান পৌছাব। এদের মধ্য থেকে একজন বললেন "কাবুল বহু দূরের পথ। দুই-তিনটি সিমান্ত না পেরিয়ে কাবুল পৌছা যাবে না। রেল বা বাসে সফর করা বর্তমান সময়ে খুবই কঠিন। যদি আশপাশের কোন শহর হত, তবে এত ভয়ের কারণ ছিল না। জায়গায় জায়গায় বসা আছে অসংখ্য চেকপোষ্ট। এসব চেকপোষ্টের চেক কাটিয়ে গন্তব্যে পৌছা ঝুঁকিমুক্ত মনে করি না। "রাফে গুল তার পরামর্শ শুনে বললেন, ভাই! তোমার পরামর্শ খুবই সুন্দর। তবে নদীপথে কিভাবে যাবে? আর নৌযানই বা পাওয়া যাবে কোত্থেকে? উত্তরে বললেন" আরব সাগর থেকে নদীটি প্রবাহিত হয়ে তাসখন্দের উপর দিয়ে তাজিকিস্তান পর্যন্ত পৌছেছে, সে নদীর নাম

চিমবেই নদী। বন-বনানীর বুক চিরে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে নদীটি আবহমান কাল থেকে বয়ে চলছে। অনেক বাণিজ্যযান ও জেলে নৌকা নদীর বুকে চলা-ফেরা করে। তাজিকিস্তনগামী কোন বাণিজ্য নৌকা পেলে তাতে দিয়ে দিতে পারলে খুবই ভাল হবে। রাফে গুল তা কি করে সম্ভব জানতে চাইলে তিনি বলেন-

আমি কিভাবে তাকে তাজিকিস্তান পাঠাব,সে দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেন। আমার এক পরিচিত বন্ধু চিমবেই থেকে মালামাল নিয়ে নৌপথে টোরটকোল ও বুখারা হয়ে দুসানবে যান। প্রতি মাসেই তিনি মালামাল নিয়ে যাতায়াত করেন। আশা করি, তার মাধ্যমে তাঁকে তাজিকিস্তান পৌছে দেয়া যাবে। সেকান থেকে অতি সহজেই কাবুলে পৌছতে পারবেন। তার কথাগুলো আমার নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচিত হলো। তাই রাফে গুলকে বললাম, ভাইজান, বর্ণিত নৌপথে যাওয়াটাই আমার নিকট নিরাপদ বলে মনে হয়। এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন। আমার একান্ত আগ্রহ দেখে রাফে গুল উক্ত সাথীকে বললেন, "ঠিক আছে নৌপথে যাওয়ারই ব্যবস্থা করে দাও। অতঃপর আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় নির্ধারণ করলেন পর দিন ভোরে। পরামর্শের পর সকলেই নিজ নিজ আলয়ে ফিরে গেলেন।

রাতে এশার নামায সমাপন করে রাতের আহার করে শোয়ার ব্যবস্থা করলাম। এর মধ্যে রাফে গুলসহ আরো দুজন ভদ্রলোক আমার রুমে প্রবেশ করে কেদারায় আসন গ্রহন করলেন। রাফে অঙ্গুলী নিদের্শপূর্বক দুজনের পরিচয় আমার কাছে তুলে ধরলেন এবং আমারও আসল পরিচয় দিলেন। এরা আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো খেতে খেতে বললেন, "খুবায়েব ভাই! আপনার কথা পত্র-পত্রিকায়, ও রেডিওতে অনেক বার শুনেছি। শুনেছি লোকমুখে, কিন্তু দেখার সৌভাগ্য হবে তা কখনো কল্পনা করিনি। এখন আপনাকে দেখতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করছি। আচ্ছা খুবায়েব ভাই,আপনার জীবনের কিছু ঘটনাবলি শুনতে মন চায়,কিছু শোনাবেন কি?

লোকটির একান্ত আগ্রহ দেখে আমার জীবনের খুঁটিনাটি কিছু ঘটনা শোনালাম। লোকটি আমার কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। দীর্ঘ তিন ঘন্টা ব্যাপী নানা ধরনের ঘটনা শোনালাম। তার পর তিনি বললেন, "ভাই খুবায়েব,যদি দুতিন দিন আপনার ইতিকথা শুনি, তবুও শেষ হবে না। রাত

গভীর হয়ে,গেছে। আগামী কাল তো চলে যাবেন। কিছু বিশ্রাম নিতে হবে। এখন বিশ্রাম করুন। এ বলে তিনি লক্ষ টাকার একটি ব্যাগ আমার হাতে দিয়ে বললেন, এ টাকাগুলো জিহাদের ফান্ডে জমা ছিল। দেওয়ার মত কোন প্লেস পাইনি। তাই দিতে পারিনি। আজ সরাসরি একজন জানবাজ মুজাহিদের হাতে তুলে দিতে পারছি বলে আল্লাহর শোকর আদায় করছি। এ বলে ওরা সকলেই চলে গেল। আমিও বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন রাফেগুল সাহেবের বন্ধু শরমিন্দা খান এসে আমাকে বললেন, "খুবায়েব ভাই! আপনি তৈরি হয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চিমবেই অভিমুখে যাত্রা করব। রাফে গুল আমাকে নাস্তা পানি খাইয়ে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় করলেন। বিদায় লগনে তিনি অশ্রুশিক্ত নয়নে বললেন, "খুবায়েব ভাই, আপনি আমাদেরকে অনেক উপকার করেছেন, যা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। আর সম্মুখে প্রশংসা করতে মহানবী (সাঃ) মানা করেছেন। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আজীবন আপনার কথা ভুলতে পারব না। আর ভোলা সম্ভবও নয়।হৃদয়ের গভীরে আপনার পবিত্র নাম চিরদিন অংকিত থাকবে। এসব কথা বলে রাফেগুল অশ্রুস্বজল নয়নে অনেক পথ এগিয়ে দিয়ে বিদায় দিয়ে দিলেন। আমরা বিদায়ি সালাম জানিয়ে সামনে অগ্রসর হলাম। যতদূর দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত আমাদের পথপানে তাকিয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে হাত নেড়ে আলবিদা জানালেন। এরই মধ্যে আমরা চোখের আড়ালে চলে এলাম। রাফে গুলের এই অমায়িক ব্যবহার আজও ভুলতে পারিনি।

শরমিন্দা খান আমাকে নিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে সোজা উত্তর দিকে হাঁটতে লাগলেন। সারাদিন পথ চলতে চলতে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এখন আর এক কদম সামনে এগুতে পারছি না। শ্রমক্লান্ত পদযুগল শরীরের ভার বহন করতে পারছে না। সূর্য প্রায় ডুবুডুবু। একটু পরেই হারিয়ে যাবে দিনমণি। তখন নেমে আসবে অমানিশার অন্ধকার। পথ চলা হয়ে যাবে দুষ্কর। তাই শরমিন্দা খানকে বললাম, ভাইজান! আমি তো আর হাঁটতে পারছি না। কোথায় রাত যাপন করবেন? লোকালয়ের আলামত কোথাও পাচ্ছি না।

আমার কথা শুনে শরমিন্দাখান বললেন, খুবায়েব ভাই ! আমি অবস্থা অবলোকন করছি জীর্ণ শীর্ণ শরীর নিয়ে এতটুকু আসতে পারবেন তা আমি

কল্পনাও করতে পারিনি। আমি সুস্থ-সবল মানুষ, তারপরও ক্লান্ত হয়ে গেছি। আর আপনি দুর্বল মানুষ, আপনার অবস্থা কি তা তো অনুমান করতে পারি। অতঃপর বললেন, আর কিছুক্ষণ পথ চললেই সামনে চিমবেই নদীতে পৌছে যাব। সেখানে গিয়ে যদি কোন নৌযান পাই, তাহলে চিমবেই শহরে যাত্রা করব। আর যদি না পাই, তাহলে বাজারে কোন হোটেলে রাত্র যাপন করব। কোন চিন্তা করবেন না। এলাকার পথ-ঘাট সবই আমার পরিচিত।

অতঃপর আরো একটু পথ চলার পরই চিমবেই নদীর কলকল ধ্বনি শুনতে পেলাম। একটি নৌকা চিমবেই অভিমুখে ছেড়ে গিয়েছে। রাত্রে আর কোন নৌকা নেই। পর দিন সকাল দশটায় আর একটি নৌকা ছেড়ে যাবে। আমরা নিরুপায় হয়ে একটি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেলে রাত্র যাপন করে সকালে নাস্তা সেরে নৌকার অপেক্ষায় রইলাম। আনুমানিক নয়টার দিকে একটি নৌকা এসে নোঙ্গর ফেলল। নৌকাটা তত বড় নয়। বিশ-পঁচিশজন যাত্রীর বেশী সংকুলান হবে না। সকাল দশটায় ১৫ জন যাত্রী নিয়ে চিমবেইর উদ্দেশ্যে সারাবিস্কো ত্যগ করল। মাঝি-মাল্লারা কয়েকটি পাল তুলে দিলেন। কান্ডারী মজবুত করে বৈঠা ধরে বসে আছেন। বাতাস তরী নিয়ে দ্রুতগতিতে চলল। তরঙ্গমালার উপর দিয়ে দোল খেতে খেতে হেলে-দুলে এগিয়ে চলছে। চলছে তো চলছেই। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। নেই কোন ক্লান্তি। থাকা-খাওয়া রান্নাবান্না সব কিছু নৌকাতেই হয়। এভাবে একটানা তিন দিন চলার পর চিমবেই গিয়ে পৌছলাম।

আমরা নৌকা থেকে অবতরণ করে একটি হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। শরমিন্দাখান আমাকে হোটেলে রেখে চলে গেলেন তাজিকিস্তান গামী নৌযানের খোঁজে। তিনি কয়েক ঘন্টা পর ফিরে এসে বললেন, "ভাইজান! অনেক খোঁজা-খুঁজির পর আল্লাহর অপার অনুগ্রহে একটি নৌকার সন্ধান পেয়েছি। ওরা মাল বোঝাই করছে। রাত তিনটায় নৌকা ছেড়ে যাবে, ওরা কোন যাত্রী নিতে চায় না। অনেক বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি। কান্ডারী বলে দিয়েছেন,আপনাকে মাল্লা পরিচয় দিতে হবে। মাঝি-মাল্লা একটি নৌকায় কতজন থাকে তা কাগজে লিখে দিতে হয়। কম-বেশী হলে চেকপোষ্টে অনেক ঝামেলা করে। তাই আপনার নামও মাল্লার খাতায় লিখে দিবে। আপনার সাধ্য অনুযায়ী কিছু কিছু কাজ

করবেন। তা হলে সবাই বুঝবে আপনিও ওদের একজন সদস্য। আমি তার কথাকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, আপনার কথার ব্যতিক্রম হবে না ইনশাআল্লাহ। তার পর কিছু বিশ্রাম নিয়ে রাত তিনটায় গিয়ে নৌকায় আশ্রয় নেই। আমাকে বিদায় দিয়ে বন্ধু শরমিন্দা খান হোটেলে চলে গেলেন। আমরা আবার নদীর বুকে হেলে-দুলে চলছি।

বিশ

চিমবেই বন্দর থেকে ২৮ দিনে আমরা চালিসকোরিয়া এসে পৌছলাম। চালিসকোরিয়ায় কিছু মাল বিক্রি হল আরও কিছু মাল নেয়া হলো। এখানে সময় লেগে গেল তিন দিন। তার পর আবার টোরটকোল বন্দরের উদ্দেশ্যে চালিসকোরিয়া ত্যাগ করলাম। এভাবে ক্রমাগত ১৫ দিন চলার পর আকাশে মেঘ দেখা দিল। কান্ডারী সবাইকে হুঁশিয়ার করে বললেন,"ভাই সব! আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ। যে কোন সময় ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হতে পারে। এখনই নিরাপদ আশ্রয়ে নোংগর ফেলা দরকার। আমি বললাম, জনাব! এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আকাশের এমন অবস্থা তো নেহায়েত মামুলী ব্যাপার। তুফানের কোন আলামত তো দেখছি না। আমার কথা শুনে কান্ডারী বললেন "না,না, তোমার ধারণা ঠিক নয়। আবহাওয়া সম্পর্কে আমরা যা বুঝি তা তোমরা বুঝ না। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা করছি। তোমরা পালগুলো নামিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল বাতাস আরম্ভ হতে পারে। হয়তবা রোষে উঠবে অকূল পাথার।

কান্ডারী এসব কথা বলতে না বলতেই বৃষ্টিসহ দমকা হাওয়া বইতে লাগল। মাঝি-মাল্লারা তাড়াতাড়ি পালগুলো খুলে দিল। আকাশচুম্বী উত্তাল তরঙ্গে আমাদের নৌকাটি দুলতে লাগল। কান্ডারী খুব শক্তভাবে হাল ধরে তটে,ভেড়ানোর চেষ্টা করছেন। দুঃখের বিষয়, কূলের নিকট পৌছতে না

পৌছতেই প্রচন্ডবেগে এক ধমকা হাওয়া এসে নৌকাটি নদীগর্ভে তলিয়ে দিল। মাঝি-মাল্লারা নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করতে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। ঢেউয়ের তোড়ে কাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তা বুঝতে পারিনি। আমার উপর দিয়ে ঢেউয়ের উপর ঢেউ যেতে লাগল। আমি মাজুর। আমি কলমা শরীফ পাঠ করতে লাগলাম। সাঁতার কাটতে না পারলেও চিৎ হয়ে নাসিকা জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। নদীর দুই কূলে সারি সারি পাহাড় সগর্ভে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অনুমান করছি যে, আমাকে কূলের নিকটবর্তী থেকে আস্তে আস্তে মাঝ দরিয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁচার আশা নিরাশায় পরিণত হতে চলছে। এদিকে সন্ধা হয়ে আসছে। এখন তো বাঁচার আশা আরোও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

নিষ্ঠুর তরঙ্গ আমাকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে। রোষে উঠে একবার তলাচ্ছে। সস্নেহে আবার ভাসাচ্ছে। আর পানি পান করাচ্ছে এক দম ফ্রি। পানি পান করতে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পান করতে হচ্ছে। আমি অনুমান করছি যে, পেটটি জয়ঢাকের মত ফুলে যাচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এরই মধ্যে কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি, তা বুঝতে পারিনি।

রাত পোহায়ে ভোর হলো, ভোর পেরিয়ে দুপুর, আর দুপুর পেরিয়ে বিকাল হলো। আমি কিছুই জানি না। হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, বেশ কিছু মানুষ আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আর দু-তিনজন আমার সেবায় রত। কেউ হাত-পা টানছে। কেউ বা পেট মর্দন করছে। আমার চাহনীতে সকলেই আনন্দে নেচে উঠল। অনেকের মুখে ধ্বনিত হলো "আহা! লোকটি বেঁচে গেছে! লোকটি বেঁচে গেছে! "আমি তখনো বুঝে উঠতে পারিনি কেন লোকগুলো আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর সেবা করছে। এক পর্যায়ে আমি উঠে বসার চেষ্টা করি, কিন্তু পারিনি। এখনো পেটে চাপ দিলে মুখ ও নাসিকা দিয়ে পানি বেরোচ্ছে। আরো কিছুক্ষণ পর উঠে বসতে সক্ষম হলাম। এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখি এটা নদীর অববাহিকা।

একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা! তোমার নাম কি কোথায় ঠিকানা? উক্ত লোকটির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমার আসল পরিচয় লুকিয়ে রেখে বললাম, বাবাজান! আমি একজন নৌকর্মচারী, এক, সওদাগরের অধীনে চাকুরী করি।

ঃ তুমি তো মাজুর, একটি হাত নেই,কি কাজ কর?

ঃ আমি দাঁড় টানতে পারি না বটে, কিন্তু রান্না-বান্না করি, নৌকা পাহারা দেই ও হাট- বাজার করি।

ঃ ঠিকানা কোথায়? তোমাকে এ এলাকার অধিবাসী বলে মনে হয় না।

ঃ আমার আসল ঠিকানা জাম্বুল। পিতা-মাতা,জায়গা জমি নেই। নেই বাড়ী- ঘর। দিন- রাত কাটাই নৌকাতে।

ঃ তোমরা কোন কোন বন্দরে বাণিজ্য কর?

ঃ আমার মালিক খিবা,সারাবিস্কো,বুখারা, ও দোসানবে বন্দরে বাণিজ্য করেন।

ঃ তুমি এখানে কি করে আসলে?

ঃ তা তো বলতে পারি না। তবে এতটুকু মনে পড়ে, আমরা ঝড়ের কবলে পড়েছিলাম। আমাদের মালামালসহ নৌকা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে।

ঃ তোমাদের অন্যান্য সাথীরা কোথায়?

ঃ বাবাজান! নৌকায় আমাকে ছাড়া আরো সাতজন সাথী ছিল। নৌকা মাঝদরিয়ায় ডুবে যাওয়ার পর কে কোথায় গেছে, আছে না মারা গেছে তা কিছুই বলতে পারি না। আর বলবই বা কেমন করে? তখন যে ছিল রাত।

আমার কথা শুনে অনেকেই আক্ষেপ করছিল। এর মধ্যে একজন বললেন চল বাবা! ঘরে চল। তোমার জামা -কাপড় ময়লা হয়ে গেছে। এসব পরিস্কার না করলে ব্যবহার করতে পারবে না। এগুলো ধুয়ে দেই রোদে শোকাক। তুমি গোসল সেরে খানাপিনা করে খানিক বিশ্রাম নাও। চল বাবা, চল। "এ বলে লোকটি আমাকে ধরে বসা থেকে উঠালেন। আমি দাঁড়িয়ে পা ফেলতে পারছিলাম না। তিনি আমার কর্তিত বাহুটি চেপে ধরে স্কন্ধে ভর দিয়ে গৃহাভিমুখে নিয়ে চললেন। তার পর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ী পর্যন্ত পৌছলাম। লোকটি হাম্মামখানায় নিয়ে পানি তুলে দিলেন। লুঙ্গি,গামছা, তোয়ালে ও সাবান এনে দিয়ে তিনি হাম্মামখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি মাথায় পানি ঢেলে শরীর সিক্ত করে সাবান মাখছিলাম। এমন সময় শরমিন্দা খানের দেয়া তিন লক্ষ টাকার কথা মনে পড়ল। আমার কটিদেশে ও উরুদ্বয়ে বাঁধা ছিল দুই লক্ষ্য টাকা,আর বাকী এব লক্ষ টাকা ছিল একটি ব্যগে। হাত দিয়ে তালাশ করে দেখি, দুই লক্ষ টাকা অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু থলের টাকাগুলো পেলাম না। তাই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে এল ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি

রাজিউন। তার পর টাকাগুলো রেখে, গোসল সেরে, কাপড় পাল্টিয়ে জামা -কাপড় ধৌত করে হাম্মামখানা ত্যাগ করলাম। লোকটি কাপড়গুলো হাত থেকে নিয়ে রোদে শোকাতে দিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন মেহমানখানায়। তার পর খানাপিনা সেরে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শুয়ে পড়লাম। এদিকে টাকাগুলো ছিল ভিজা। না শোকালে নষ্ট হয়ে যাবে। এতগুলো টাকা রোদে বিছিয়ে শোকানো নিরাপদ নয়। তাই গৃহকর্তার হাতে টাকাগুলো দিয়ে বললাম, বাপজান! এসব টাকা আমার নিকট আমানত ছিল। তাই টাকাগুলো বুঝে নিয়ে শোকানোর ব্যাবস্থা করুন।

লোকটি টাকা নিয়ে অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। তার পর সবগুলো গেইট বন্ধ করে দিয়ে উঠানে বিছিয়ে দিলেন। তিনি টাকা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলেন না। এদিকে এক লক্ষ টাকা খোয়া যাওয়ায় অনেক চিন্তা ও পেরেশানীতে ছটফট করছিলেন। কারণ এ টাকা আমার নয়,এ গুলো জিহাদের ফান্ডের টাকা। আমার হলে কোন চিন্তা করতাম না। এখন ছবরে জামিল এখতিয়ার করা ছাড়া কোন পথ নেই। এসব চিন্তা করতে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পরেছিলাম তা টেরই পাইনি।

বিকাল চারটায় আপনা- আপনিই ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি অযু এস্তেঞ্জা সেরে আসরের সালাত আদায় করে জায়নামাজে বসে তাসবীহ। পাঠ করছি এর মধ্যে গৃহ কর্তা এসে বললেন, " বাবাজী! তোমার টাকাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে। আমি সব ভাঁজ করে রেখে দিয়েছি। তিনি আরও বলেন " আমার কাছে তুমি যে টাকা দিয়েছ, সেগুলো ছাড়া আরো এক লক্ষ টাকার একটি থলে তোমার পার্শ্বে পেয়েছি। টাকাগুলো যেহেতু তোমার পার্শ্বে পেয়েছি, সে হিসাবে তোমার মনে করে রোদে শুকিয়েছি। এই টাকাও সে গুলোর সাথে রেখে দিয়েছি। লোকটির আমানতদারীর পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হলাম এবং মহান আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলাম। আমি এখানে কি করে এলাম, তা তো বুঝতে পারিনি। তাই লোকটির নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ভাই! আপনারা আমাকে কোথা থেকে এনেছেন? তিনি উত্তরে বললেন-

আমরা নদীর তীরে এসে তোমাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তোমার কপালে সেজদার আলামত দেখে ভাবলাম তুমি মুসলমান। তাই তোমার দাফন-কাফনের জন্য মহল্লায় নিয়ে আসি। তোমাকে ধরাধরি করে আনার সময় নাক-মুখ দিয়ে পানি বেরোচ্ছিল। আঙ্গিনায় এনে রাখলে

একজন বলে উঠল লোকটি মরেনি। তার পর পানি নিষ্কাসনের চেষ্টা করলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠ।

তার পর আরো আলাপ আলোচনা করে জানতে পারলাম, ঝড়কবলিত এলাকা থেকে এখানকার দূরত্ব প্রায় দেড়শ মাইল আর ঝড় হয়েছে তিন দিন আগে। উক্ত ঝড়ে পাহাড়ী গাছ-গাছরা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। শত শত নৌকা, মাছ ধরার ট্রলার,বাণিজ্য জাহাজ ও খেয়া তরী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। শত শত ঘর-বাড়ীর চিহ্ন মুছে ফেলেছে। শত শত লাশ নদীতে ভাসছে আর হাজার হাজার মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

এ এলাকার ভৌগলিক অবস্থান জানতে চাইলে তিনি বললেন "তুমি যেখানে আছ এ এলাকার নাম ডামাস্কোরিয়া। এটা উজবেকিস্তানের সীমান্ত এলাকা। এখান থেকে বুখারা উত্তর পশ্চিমে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। তিন মাইল সম্মুখে গেলেই পাবে তাজিকিস্তানের সীমান্ত। লোকটির কথা শুনে আমার শরীর শিউরে উঠল। কারণ, ডামাস্কোরিয়া,বুখারা, টোরট কোল, আবজান, ও মুসলিয়ার পথঘাট আমার অনেক পরিচিত। এসব এলাকার লোকজনের সাথে ছিল গলায় গলায় মিল। কালের বির্বতনে হয়ত কেউ আমাকে চিনবে না আর আমিও পরিচয় দিতে পারব না। তার পরও কয়েকজন লোকের নাম বলে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি এদেরকে চিনেন? তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করলেন , "আপনি এসব লোককে কি করে চিনেন? আপনি একজন ছিন্নমূল মানুষ *থাকেন নৌকায়,* আর ঘোরেন বন্দরে বন্দরে। এদেরকে তো চিনার কথা নয়। আর আপনি যাদের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, এদের মধ্যে আমিও একজন।

লোকটির কথা শুনে তিক্ষণদৃষ্টি মেলে দেখি তিনি তো আজমল খান। তিনি আমাকে এক সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন অনেক সু-পরামর্শ ও করেছিলেন আথিক সাহায্য। আমি লোকটিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম এবং বললাম,জনাব! আপনি কি আজমল খান নন?

ঃ হ্যাঁ, আমি আজমল খান। তুমি কি করে চিনলে?

ঃ আমি আপনার অতি আদরের খুবায়েব।

ঃ তুমি কি মুজাহিদ কমান্ডার খুবায়েব জাম্বুলী?

ঃ হ্যাঁ ,আমি খুবায়েব জাম্বুলী।

ঃ বাবা! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? তোমার হাতের এ অবস্থা কেন? সব ঘটনা খুলে বলো। আমরা তো ভাবছি শহীদ হয়ে গেছ। বলো বাবা

তোমার বীরত্বগাঁথা ও অগ্নিঝরা দিনগুলোর কাহিনী। অতঃপর আমি এক এক করে সবগুলো ঘটনা শুনালাম। তার পর তিনি চুপি চুপি আমার পরিচিত লোকদেরকে খবর দিলেন। গভীর রাতে লোকজন এসে আমার সাথে দেখা করলেন। অর্ধ রাত পর্যন্ত জেগে আমার কথা শোনলেন।

এদিকে আজমল খান সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন " ভাই সব! এপর্যন্ত যে সব কথা হয়েছে তা সম্পূর্ণ আমানত। এগ্রামে মেহমানের অবস্থান যদি দুশমন জানতে পারে, তা হলে পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে। আর আপনারা যদি বলাবলি করেন, তবে মেহমানকে এক নজর দেখার জন্য লোকের ঢল নেমে আসবে। এতে ক্ষতির আশংঙ্কা রয়েছে শত ভাগ। কাজেই আপনারা এব্যাপারে নীরব থাকবেন। এসব কথা বলে সতর্ক করে দিয়ে সবাইকে বিদায় দিলেন। লোকজন চলে গেলে তিনি বললেন, বাবা! মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না। এরা বলাবলি করলে সংবাদ চলে যাবে দুশমনের কানে। তার পর আর রক্ষা থাকবে না। জানাজানির আগেই তোমাকে অত্র এলাকা ছেড়ে দেয়া উচিৎ। মেহমানকে ঠেলে পাঠানো নেহায়েত অন্যায়, তবু পাঠাতে হয়। এখন তোমার মর্জি। আমি দেখলাম তাঁর কথা দ্রুব সত্য। তাই সকালেই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি ভোরে আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিলেন।

একুশ

ডামাস্কোরিয়ার পথ-ঘাট অলিগলি সবই আমার নখদর্পণে। রাহবর ছাড়া পথচলা আমার জন্য মোটেই কষ্টকর নয়। আমি লোক চলাচলের বড় সড়ক পরিত্যাগ করে নিরাপত্তার জন্য গ্রাম্য মেঠোপথ বেছে নিলাম। আপথ, কুপথ আর জমির আইল ঘুরে সামনে এগুতে লাগলাম। তিন-চার ঘন্টা হাটার পর আফগান সীমান্তে পৌছলাম। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, তাজিক ও আফগান সীমান্তে উভয় দেশের পাহারা জোড়রার

করেছে। প্রায়ই সংঘর্ষ বেঁধে যায়। দিবালোকে সীমান্ত পাড়ি দেয়া সমীচিন মনে না করে গভীর অরণ্যে লুকিয়ে রইলাম।

রাত আনুমানিক তিনটায় চার রাকাত সালাত আদায় করে নিরাপত্তার জন্য দোয়া করে সীমান্ত পার হলাম। তাজিক সীমান্ত রক্ষীরা টের পেয়ে পিছু ধাওয়া করতে লাগল। আমি জীবন বাজী রেখে অন্ধকারে দৌড়াতে লাগলাম। জিরো পয়েন্ট পার হয়ে এক টিলায় আরোহণ করতে চাইলে পা ফসকে নিচে গড়িয়ে পড়লাম। উক্ত টিলার অপর দিকেই সোজা নিচে ছিল কোসকা সীমান্ত রক্ষীদের ঘাঁটি। আমি নিচে পড়ার সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যাই। আমার পতনশব্দে সৈন্যরা চমকে উঠে টর্চ,ফোকাস করলে আমাকে দেখে গুলি ছোড়ার চেষ্টা করে। তিন-তিনবার চেষ্টা করার পরও বন্দুকের নল থেকে গুলি বের হল না। পুনরায় গুলি ছোড়ার চেষ্টা করলে, সুবেদার হাতের ইশারায় মানা করলেন। এতে আমি রক্ষা পাই। তার পর আমাকে তাদের মোর্চায় নিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেলে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি ভাবলাম যে, এখন আমি আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছি। এটা আমার দেশ। সরকার আমাকে এদেশে থাকার অনুমতি দিয়েছেণ। আমার কিসের ভয়? কিসের ভাবনা? তাই সৈন্যদের প্রশ্নের জবাব সত্য সত্য বলে দিয়েছি। কিন্তু এদের বিশ্বাস হলো না। তারা আমাকে কমিউনিষ্টদের গুপ্তচর মনে করে কিছু শারীরিক নির্যাতন করেছে। তার পর সবগুলো টাকা-পয়সা রেখে কারাগারে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি অনেক অনুরোধ করে বললাম যে, আমাকে কারাগারে প্রেরণের আগে দয়া করে কাবুল সরকারের নিকট বলেন। তিনি যা নির্দেশ করেন, সে হিসাবে আমল করুন। কিন্তু নিষ্ঠুর সীমান্ত রক্ষীগণ তা আমলে নিল না। আমি যে একজন প্রতিবন্ধি, কর্তিত হস্ত বিশিষ্ট মানুষ, তাতেও ওদের অন্ত রে একটু দয়ার উদ্রেক হলো না। আমার কান্নাকাটি তাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করল না। একবার ভেবে ছিলাম যে, আমি আমার আসল পরিচয় তুলে ধরবো, আমার মিশনের কথা খুলে বলবো। কিন্তু এটাও আশংকামুক্ত মনে হলো না। এটা ওরা কোন নজরে দেখবে তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই আসল কথা মনের গহীনে লুকিয়েই রাখলাম।

সীমান্ত রক্ষীদের আচার- আচরণে বুঝতে পারলাম, এরা জন্মগতভাবে আফগানী নয়। কারণ ,আফগানীরা মেহমানদের খুবইজ্জত-সম্মান করে। আত্মীয়-মুসাফিরকে অনেক আদর-আপ্যায়ন করে। অভাবগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত

ও রোগাগ্রস্তদের সেবা করে। এমন কি দুশমনের সাথেও সীমালঙ্ঘন করে দুশমনি করে না। কিন্তু তাদের কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার তেমন নয়। এরা যে জন্মগতভাবে তাজিক, তার নিদর্শন সুস্পষ্ট। এরা নির্দয়, নিষ্ঠুর,হিংসুক ও অহেতুক সন্দেহ পোষণকারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক তাজিক ও উজবিকস্থান ভিটে বাড়ী হারিয়ে আফগানে রিপুজী হয়ে ছিল। মহামতি নাদির শাহ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। আবার অনেক যুবককে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেন। এরা ওদেরই মধ্য থেকে কয়েকজন।

ওরা আমার কোন কথাই শুনল না, মানল না। আমার সবগুলো টাকা কেড়ে রেখে হাতকড়া পরিয়ে নর্দাঙ্গি কারাগারে প্রেরণ করে। আমি ভেবেছিলাম, সীমান্ত পার হয়ে দু-দিনের মধ্যে ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে মুহতারাম আমীর সাহেবের সাথে দেখা করে আমার সফরের কারগুজারী বর্ণনা করব এবং অন্যন্য সাথী ভাইদের খোঁজখবর নেব। দুঃখের বিষয় তা আর সম্ভব হলো না। আবার নিষ্ঠুর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্টে প্রবেশ করতে হলো। আল্লাহ পাক প্রতি কদমে কদমে পরীক্ষা নিচ্ছেন। বহু দিন আগে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ বলেছিলেন("আল্লাহ তাআলা যাকে উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চাসন দান করতে চান, তাকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন)। কোন কোন সময় মনে উদয় হতো যে, আমি তো ছাত্রই হতে পারিনি, তা হলে পরীক্ষা কিসের ? আর এটাও মনে জাগ্রত হয় যে, আল্লাহ তাআলা যদি কোন গোনাহগারকে ক্ষমা করে দেন আর কোন অযোগ্য অপদার্থকে উচ্চ আসনে সমাসীন করেন,তা হলে তো কেউ বাধা দেয়ার নেই। আর এটা আল্লাহ পাকের পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়।

আমি দ্বিধাহীন চিত্তে, অম্লান বদনে ও হাসিমুখে আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নিলাম। কারাগারের শক্ত প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুরাকাত শোকরিয়া আর দু রাকাত সালাতুল হাজাত (নামায) আদায় করে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশ্রুসজল নয়নে প্রার্থনা করলাম যে, প্রভ হে! আমি তোমার গোনাহগার বান্দা, আর তুমি হলে গাফফার। অতএব তুমি আমার পাপরাশিকে
ক্ষমা করেদাও। আমি দুর্বল, অসহায় ও মজলুম, তুমিই একমাত্র সাহায্যকারী। অতএব তুমি আমাকে এ মহাবিপদ হতে রক্ষা করো। ওগো আমার মাওলা! তুমি অবশ্যই আমার অভিপ্রায় সম্পর্কে জ্ঞাত, কিসের

আশায় কিসের নেশায় জীবনের ঝুঁকি মস্তকে নিয়ে, দেশ থেকে দেশান্ত ঘুড়ে বেড়াচ্ছি। নিতে পারি না প্রাণাধিকা স্ত্রীদের খোজ-খবর আর দিতে পারিনে তাদের খোর- পোষ। এসব অপরাধের জন্য আমাকে দায়ী করো না। ওগো আমার দয়ালু মাওলা, তুমি যদি আমাকে কোন সন্তান দান করে থাক,তবে সন্তান সহ সবাইকে হেফাজত কর। হেফাজত কর ইজ্জত ও আবরুর। ওগো রাব্বুল আলামীন! আমার মিশনকে কামিয়াব কর এবং সীমান্ত রক্ষী ও কারা কর্তৃপক্ষের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে ই জিন্দানখানা থেকে মুক্তি দান কর। আমীন ইয়া রাব্বুল আলামীন।

আমাকে কারাগারের এমন এক প্রকোষ্টে ঢুকিয়ে দিল, যেখানে আল্লাহর দেয়া আলো-বাতাস প্রবেশ করে না। নেই কোন লোকজন, নেই আলাপ করার মতো কোন মানুষ। সকাল-বিকাল কে যেন দুটি করে রুটি আর সামান্য সালন দিয়ে যেত। তাকেও কোন দিন দেখার বা কথা বলার সৌভাগ্য হয়নি। অনেক চেঁচিয়েছি ও ডাকাডাকি করলে কারারক্ষীরা দূরে দাঁড়িয়ে "কি হচ্ছে? বলে চিল্লাচিল্লি করে। কোন সুন্দর সমাধান দেয়নি ওরা। কারা কর্তৃপক্ষের অমানুষিক ও অসহনীয় নির্যাতনের মধ্য দিয়ে কেটে গেল জীবনের মহামূল্যবান তিনটি মাস।

পবিত্র জুমায়ার দিনের সুসংবাদ নিয়ে ফিরে এলো কোন এক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার। আগামী দিন বিশেষ এবাদতের দিন। আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের দিন। আজই কাপড়-চোপড় ধুয়ে, গোসল করে তৈরী হতে হবে জুমার রাতের এবাদতের জন্য। জুমার দিন কারাগারে জুমার সালাত ও যোহরের জামাত পড়া হয় না। হানাফী মাযহাব হিসাবে তা বৈধ নয়। তাছাড়া মহামতি নাদির শাহের কড়া নির্দেশ ছিল কোন কারাবন্দি যেন কোনক্রমেই নামায কামাই না করে। তাই সমস্ত বন্দিরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হত।

সে দিন আমি জামা-কাপড় ধুয়ে, গোসল করে প্রায় সারা রাত এবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়েছি। কাটিয়েছি দোয়া প্রার্থনার মধ্য দিয়ে । রাত পোহায়ে ভোর হলো। ফজরের নামায আদায় করে পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের মগ্ন হলাম। একটু পরেই সকালের গণনার জন্য সুবেদার আসবেন। ভেবেছিলাম আজ সুবেদারকে বলব, তিনি যেন সেল থেকে বের করে অন্য ওয়ার্ডে দিয়ে দেন। তা হলে জামাতের সাথে নামায আদায় করতে পারব। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোবেদার আসলেন। আমি পূর্ব

পরিকল্পনানুযায়ী ওয়ার্ড পরিবর্তনের আবেদন জানালাম। তিনি বললেন, "বাবা! আজকের দিন এখানেই থাক, আগামী কল্য জেলার সাহেবের কাছে বলে অন্য ওয়ার্ডে দিয়ে দেব। আজ তোমাদের বড় ফাইল আছে।

বড় ফাইল কি জানতে চাইলে সুবেদার বললেন "বাবা! এত দিন জেল খাটার পরও ফাইল কাকে বলে তা জান না। শোন! প্রতি সপ্তাহে জেলার ও সুপার জেল পরিদর্শনে আসেন। এটাকে বলে জেলার ফাইল। আর প্রতি মাসে প্রাদেশিক গভর্নর ও কাজি (বিচারক) জেল দেখতে আসেন, এটাকে বলে গভর্নর ফাইল। তার পর প্রতি বৎসরে একবার কেন্দ্রীয় শাসনকর্তা, আমীর বা বাদশা আসেন। একে বলে বড় ফাইল। অতএব আজকে মহামতি নাদির শাহের শুভাগমন ঘটবে তোমাদের জেল খানায়। তাই আজকে কাজ অনেক বেশী। এবলে সুবেদার সাহেব ত্রস্তপদে বেরিয়ে গেলেন।

সুবেদারের কথা শুনে আমার অন্তর আনন্দে নেচে উঠল। আমি মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় করে নিজেকে বললাম, "খুবায়েব! তোমার দঃখের রজনীর অবসান ঘটেছে। তোমার ভাগ্যাকাশে মুক্তির সুবহেসাদেক উদিত হয়েছে। আজ তুমি মুক্ত। তোমার প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেছেন। তোমার মুক্তির অর্ভ্যথনার জন্য স্বয়ং আফাগান অধিপতি মহামতি নাদির শাহ এগিয়ে আসছেন। আল্লাহ তোমার জেলখানার রিযিক উঠিয়ে নিয়েছেন। এসব বলে আত্নাকে শান্তনা দিলাম। তার পর এশরাকের নামায সমাপন করলাম। এদিকে সশ্রম সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা পরিস্কার পবিচ্ছন্নতার কাজে লেগে গেল। অন্যান্য আসামীরাও বসে নেই। তারাও নিজ নিজ ওয়ার্ড সাফাই করছে। কাপড়-চোপড় ভাজ করছে। থালা-বাটি কম্বল পরিস্কার করে সাজিয়ে ঘুচিয়ে রাখছে। কেউবা গোসল সেরে তৈল মালিশ করে নিজকে পরিপাটি করছে। জেলার, সুপর, সুবেদার ও জমাদার সহ কারাকর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আপন আপন দায়িত্ব যথাযথভাবেপালন করছে। মনে হয় জেলখানাকে গোসল করিয়ে কনের সাজে সুসজ্জিত করছে। গোটাজেল খানায় বিরাজ করছে পিনপতন নিরবতা, বইছে মুক্তির শীতল হাওয়া। কোথাও কোন হট্রগোলের আওয়াজ কানে আসছে না। মনে হয় এরাই এদেশের সুসভ্য মায়ের সুসভ্য সন্তান। আসন্ত মুক্তির সমীরণে উড়িয়ে নিয়ে গেল দুঃখ, বেদনা ও মলিনতা।

দুপুর বারটা বাজার বেশী বাকী নেই। এরই মধ্যে সংবাদ হয়ে গেল, অর্থাৎ সুবেদার ঘোষণা দিলেন "ওহে বন্দিগণ! আফগান অধিপতি মহামান্য নাদির শাহ প্রধান ফটক অতিক্রম করেছেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই তিনি আমাদের মাঝে তাশরিফ আনবেন। অতএব তোমরা সারিবদ্ধ ভাবে নিজ নিজ জায়গায় বসে যাও। এরই মধ্যে তিনি ভিতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলেন। সর্বশেষ আমার সেলের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। আমি উচ্চশব্দে সালাম দিতেই অপলক নেত্রে, জিজ্ঞাসু লোচনে, বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সমস্ত দর্শকমন্ডলী এদৃশ্য অবলোকন করছিলেন। সমস্ত নীরবতার যবনিকা টেনে আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, আলমপানাহ! শাহানশাহে আফগান ও অনুচরবৃন্দ! আপনারা কেমন আছেন? আমার চেহারা ও কণ্ঠস্বর শাহের নিকট অতি পরিচিত। তাই তিনি ভাল আছি উত্তরের সাথে সাথে প্রশ্ন করলেন "তুমি না খুবায়েব! তুমি এখানে যে?

ঃ আলমপানাহ! জেলখানার রিযিক আমাকে টেনে এনেছে।

ঃ কিভাবে এখানে এলে?

ঃ আপনার সিমান্ত রক্ষীরা কমিউনিষ্ট গুপ্তচর মনে করে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

ঃ তুমি কিছু বলনি?

ঃ হ্যাঁ বলেছি। তাতে কোন উপকার হয়নি।

ঃ কত দিন যাবত এখানে আছ?

ঃ এই তো, তিন মাস।

ঃ এর মধ্যে কোন অভিযোগ করনি?

ঃ বন্দিদের অভিযোগ কে শোনে? তবু করেছি ; কিন্তু ফলাফল শূন্য। যিনি অভিযোগ শোনেন ও কবুল করেন, তাঁর নিকট প্রতি দিনই অভিযোগ অনুযোগ দরখাস্ত ও প্রার্থনা করে আসছি। যার ফলে তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন আমাকেসহ আরো বহু নিরপরাধ বন্দিকে মুক্তির জন্য।

ঃ তুমি ছাড়া আরও নিরপরাধ বন্দি আছে তা তুমি জানলে কি করে?

ঃ আমি যেহেতু কোন অপরাধ করিনি। তবু কারাগারে আসতে হলো,এমন যে আর কেউ নেই তা বলি কি করে?

ঃ গ্রেপ্তারের আগে কোথায় ছিলে?

ঃ আমি আমার মিশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত আর পরীক্ষার পর এপর্যন্ত আল্লাহ এনেছেন। বাকি আলাপ বিস্তারিতভাবে পরে বলবো।

আমার কথা শুনে মহামতি নাদির শাহ সুপারকে নির্দেশ দিলেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া যেসব আসামী রয়েছে, তাদেরকে দুঘন্টার মধ্যে মুক্তি দেয়ার জন্য এবং সকলকে দূরত্ব অনুযায়ী রাহাখরচ প্রদানের জন্য। এনির্দেশ পেয়ে জেল সুপার জরিপ করে এধরনের দেড়শ লোকের সন্ধান পেলেন এবং সবাইকে মুক্ত করে রাহা খরচসহ বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে নাদির শাহের পরিদর্শনের কাজ সমাপ্ত করে খানাপিনা সেরে যোহরের সালাত আদায় করে আমাকেসহ কপ্টারে গিয়ে উঠলেন। কপ্টার আমাদেরকে নিয়ে আকাশে ডানা মেলল। অনেকগুলো পর্বতের উপর দিয়ে চক্কর দিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্বরণার্থী শিবির পরিদর্শনের জন্য কপ্টার এক অনুচ্চ পাহাড়ে ল্যান্ড করালেন। সেখানে গিয়ে আমার কমান্ডার জালাল দামলা ও অন্যান্য সাথীদের সাথে সাক্ষাত ও কুশল বিনিময় হলো। শাহের সাথে আমাকে দেখে সবাই বিস্মিত হলেন। ভাবছেন শাহ আমাকে নিয়ে সরকারী সফর করছেন। তার পর সব ঘুরে-ফিরে দেখে কমান্ডারসহ আমাকে নিয়ে কাবুল চলে গেলেন।

বাইশ

কত যে বাধার প্রাচীর মাড়িয়ে,দুখের সাগর পেরিয়ে,বিরহের অনলে পুড়িয়ে, সহায়-সম্পদ হারিয়ে,অর্ধদুনিয়া ঘুরিয়ে আল্লাহ পাক এপর্যন্ত পৌছিয়েছেন। সকল অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি, মসিবতের সুরতে রহমত আসছে। প্রত্যেকটা মসিবতের শুরুতে বুঝতে পারিনি। কিছু দিন অতি বাহিত হলে বুঝতে পারতাম যে,এটা আসলে মসিবত নয়, মসিবতের সুরতে রহমত। যেমন তুর্কমেনিস্তানের খিবা কারাগারে বন্দি হওয়ার অর্থ

হলো বন্দি সাথীদের সন্ধান পাওয়া। ঝড়ের কবলে পতিত হওয়ার অর্থ হলো দেড়শ মাইল পথ নিরাপদে পৌছা। আফগানের নর্দাঙ্গি কারাগারে বন্দি হওয়ার অর্থ হলো আফগান অধিপতি নাদির শাহ ও কমান্ডার সাহেবের সাথে সাক্ষাত এবং হেলিকপ্টারে কাবুলে পৌছা।

কাবুল সরকার আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে নিয়ে গেলেন। রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও আদর আপ্যায়ন করতে কোন দিক দিয়ে কসুর করেননি। গভীর রাতে জরুরী পরামর্শের জন্য প্রধান সেনানায়ক মোল্লা আতাউল্লাহ গুলবাহারীকে অতিথিভবনে ডেকে পাঠান। আমার পরামর্শ কক্ষে বসার পর পবিত্র কালামে পাক তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্য্যক্রম আরম্ভ হলো। আফগান শাহ প্রথমেই দেশের পরিস্থিতির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন "আমরা আফগানী ভাইয়েরা আমাদের রয়েছে জাতীয়তা,স্বকীয়তা, ও বীরত্বগাঁথা ইতিহাস। এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এদেশের চৌকস সেনাবাহিনীর পার্শে রয়েছে সর্ব স্তরের জনগণ। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পুরুষের পাশাপাশি মা- বোনেরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন–

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তানে যখন কমিউনিষ্টদের নগ্ন আগ্রাসন চলছিল,তখন থেকেই সে সব দেশের ইসলামী জঙ্গী গ্রুপগুলোকে কাবুল সাধ্যানুযায়ী আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে আসছে। তাছাড়া শরণার্থীদের বাসস্থান, কর্মসংস্থা ও পুনর্বাসনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। একারণেই কমিউনিষ্টগণ রক্তচক্ষু মেলে আফগানের দিকে তাকাচ্ছে। তারা চাচ্ছে,সুকৌশলে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাসখন্দ, সমরকন্দ ও বুখারার মতো, আফগানিস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে। আফগান বরাবরই সমুচিত শিক্ষা ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে যাচ্ছে। ইদানিং সীমান্তবর্তী এলাকায় তাদের উপদ্রব অনেক বেড়ে চলছে। এদেশের সেনাবাহিনী ও সীমান্ত রক্ষীগণ তাদের যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। আপনাদের সাথে যেহেতু সামরিক সাহায্যের ওয়াদা রয়েছে, সেহেতু সাহায্য করা ঈমানী দায়িত্ব মনে করছি। আমার প্রধান সালার ইতিমধ্যে কয়েক দেশ সফর করে এসেছেন। সামান্য কিছ সাহায্যও এসে পৌছেছে। এখন সেনাপতির সফরের কারগুজারী শুনুন।"

অতঃপর প্রধান সেনাপতি সফরের কারগুজারী প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন "আমি ইতিমধ্যে ইরান, ইরাক ও সৌদী আরব সফর করেছি। ইরান শাহ সামরিক সাহায্য দেয়ার ওয়াদা করেছেন এবং অর্থের বিনিময়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রি করবেন। অস্ত্র কেনার জন্য টাকা-পয়সাও দিয়েছি। কয়দিন আগে কিছু অস্ত্রসস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠিয়েছেন। আরো পাঠাবেন বলে পত্র দিয়েছেন। ইরাক ও সৌদী আরব আর্থিক সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। দু,–এক মাসের মধ্যে পাব বলে আশা করি। আপনাদের প্রস্তুতি কতটুকু, তার একটা ব্যাখা দিলে ভাল হয়। আর আপনার সফর কি ধরনের হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

সেনানায়ক মোল্লা আতাউল্লাহ গুলবাহারী সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমার মোহতারাম আমীর জনাব জালাল দামলা গৌরানী সাহেব বলেন যে, আমী দীর্ঘ ছয়–সাত মাস যাবত শরণার্থী শিবিরগুলোতে জানতোড় মেহেনত করে বিশ–পঁচিশজন যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে ময়দানে লড়াইয়ের জন্য তৈরী করেছি। ওরা বিভিন্ন অস্ত্র চালাতে পারে, বারুদ বানাতে পারে,শক্তিশালী বোমা তৈরী করতে জানে। এদের মধ্যে পাঁচ-ছয়জন এমন আছে, যারা আত্মঘাতী হামলা করতেও প্রস্তুত রয়েছে। এসব ছাড়াও বিভিন্ন সামরিক কলা-কৌশল রপ্ত করেছে ওরা। আমার ধারণামতে তাদের দক্ষতা আপনার ফোর্স থেকে কম নয়। আট–নয়জন এমন রয়েছে, তারা কমান্ডোজে খুব পাক্কা। কোন দেশের আর্মী তাদেরকে হারাতে পারবে না বলেই বিশ্বাস। আমীর সাহেবের কথা শুনে সেনাপতি প্রশ্ন করলেন "ওদেরকে কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন?

ঃ আমি নিজেই। উত্তর দিলেন আমীর সাহেব।

ঃ আপনি কি সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ, নিয়েছি।

ঃ কোথায়,কার কাছে ও কিভাবে নিয়েছেন তা জানাবেন কি?

ঃ আমি তো প্রথমে আর্মীতে চাকুরী করতাম। তার পর নাফমান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদ বাহিনীতে শরীক হয়ে অনেক হামলা করেছি। এর মধ্যে কোনটাতে বিজয়ী হয়েছি আর কোন কোনটাতে পরাজিতও হয়েছি। তাই সামরিক কায়দা–কানুন ভালভাবেই জানা আছে। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আমার বাহিনীকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছি। তার পরও আপনার পরামর্শ শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করব। আমীর

সাহেবের কথা শুনে সেনাপতি খুব খুশী হলেন এবং বললেন, "আপনাদেরকে রওয়ানা করানোর তিন দিন আগে আমি মহড়া প্রদর্শন করব।"

তার পর আমার কার্য বিবরণ জানতে চাইলে বললাম, নাস্তিক কামাল পাশার সাথে লড়াই করে কুলিয়ে উঠতে পারব না তা ঠিক। তার অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ। কামালের সামরিক শক্তির সম্মুখে ইরান ও ইরাক পর্যন্ত হার মানবে। তবে গেরিলা হামলায় যথেষ্ট ক্ষতি করা যাবে বলে আশা করি। কামালের নৌসেনাও অত্যন্ত চৌকস। কামালের নৌবহরের চলাচলে কাস্পিয়ান সাগর সব সময় উতলা থাকে। কাজেই তার সাথে কুলিয়ে উঠা সম্ভব নয়। আমার রিপোর্ট শুনে সেনাপতি সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন তা হলে আপনারা কিভাবে কি করতে চান, তা পরিস্কার করে বলুন।

আমি উত্তরে বললাম, জনাব! বর্তমান পরিস্থিতিতে কামালের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত করা ও ক্ষমতা গ্রহণ করা আমাদের ইচ্ছা নয়। আমরা চাচ্ছি কামালের জেলখানা থেকে আমার ১২ জন সাথীকে মুক্ত করা।

ঃ আপনাদের সাথী কোথায় কিভাবে আছে, তার সন্ধান পেয়েছেন কি?

ঃ হ্যাঁ পেয়েছি। তাদেরকে প্রথমে খিবা কারাগারে বন্দি করে রেখেছিল। তার পর সেখান থেকে মারবিয়া উপত্যকায় নিয়ে গেছে। সেখানে কামাল একটি শক্তিশালী সেনানিবাস তৈরী করছে। নির্মাণ করছে রাস্তা ঘাট। এসব কাজ বন্দিদের দ্বারা করাচ্ছে। আমাদের ১২ জন সাথী সেখানেই রয়েছে।

ঃ মা রবিয়া উপত্যকা কোন প্রদেশে অবস্থিত?

ঃ খিবা প্রদেশে।

ঃ খিবা থেকে তা কতটুক দূর এবং কোন দিকে?

ঃ খিবা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে রাওয়াল পর্বতমালা। রাওয়াল কাস্পিয়ান সাগরতীর থেকে আরম্ভ করে খিবা পর্যন্ত লম্বা-লম্বিভাবে বিস্তৃত। যেখানে সেনানিবাস তৈরী করছে তা সাগর থেকে বেশী দূরে নয়। আমরা সব সময় সাগরেই অযু গোসল করেছি।

ঃ আক্রমণের কোন খসড়া তৈরী করেছেন কি?

ঃ হ্যাঁ, করেছি। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আংশিক পরিবর্তন হতে পারে।

ঃ যুদ্ধের খসড়া প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিদ্যা কি জানা আছে?

ঃ (আমি মৃদু হাস্যে বললাম) জনাব! বেয়াদবী মাফ করবেন। আপনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের লক্ষাধিক সৈনিকের প্রধান সেনাপতি। বাঁশীর ফুৎকারে লক্ষ লক্ষ সৈন্য উঠা-বসা করে। দক্ষতাও কম নয়। তবে একটি কথা সত্য যে, আপনারা তরু ছায়ায় বসে মানচিত্র সম্মুখে নিয়ে যুদ্ধের খসড়া প্রণয়ন করেন। যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞা নেই। আর আমরা যুদ্ধের খসড়া তৈরী করি সরেজমিনে বসে এবং তুমুল লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে যুদ্ধের পট পরিবর্তন করি এবং ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করি। এ অভিজ্ঞতা আপনাদের নেই। আপনারা বারুদের ধোঁয়া আর গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য সিক্ত রুমাল ব্যবহার করেন। আর আমরা বারুদের ঘ্রাণকে মেশক আম্বর থেকে পবিত্র ও সুঘ্রাণ মনে করি। অপর দিকে আপনারা বোমের আওয়াজ পেয়ে বুকে থুতু মালিশ করেন আর কানে আঙ্গুল প্রবেশ করান। আর আমাদের অবস্থা হলো আমরা বোমের আওয়াজে নতুন জীবন ফিরে পাই,শরীর চাঙ্গা হয়, আনন্দে মন-প্রাণ নেচে উঠে। কাজেই জরিপ রিপোর্ট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আমাদের পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়, অতি মামুলী ব্যাপার। আমার কথা শুনে তাঁর অধরে হাসির রেখা ফুটে উঠল এবং জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ আপনি মৌখিকভাবে জরিপ রিপোর্টের ধারণা দিন।

ঃ আমরা গেরিলা হামলা চালাব। এতে গ্রুপ হবে তিনটি। প্রতি গ্রুপে লোক থাকবে ছয়জন। আক্রমণ হবে সাঁড়াশী। অর্থাৎ সাগর ও পাহাড় থেকে। এক গ্রুপ থাকবে সাথীদের মুক্তির জন্য। আমাদের এক দল পাহাড়ের উপর থেকে গুলি ছুড়বে। এতে কামালের সৈন্যরা পাহাড়ের দিকে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। আমাদের দ্বিতীয় গ্রুপ দুশমনের ঘাঁটির নিকট ওঁৎ পেতে বসে থাকবে। সৈন্যদের দৃষ্টি যখন পাহাড়ের দিকে থাকবে,তখন তৃতীয় গ্রুপ সাগর থেকে গুলি ছুড়বে। এর আগে আমরা এমনভাবে স্থলমাইন পুততে হবে, যে সব জায়গা দিয়ে শুধু সৈন্যরাই চলা ফেরা করে। এভাবে আক্রমণ করলে আশা করি সমস্ত বন্দিকে সহী-সালামতে ছিনিয়ে আনতে পারব ইনশা আল্লাহ।

ঃ দুশমনের সংখ্যা কতজন হবে?

ঃ আমি দেখে এসেছি প্রায় দেড়শর মতো।

ঃ সৈন্যসংখ্যা আরো বাড়বে বলে মনে করেন?

ঃ দুই-তিন মাসের মধ্যে তো বাড়ায়নি। এখন বৃদ্ধি করে কি না তা তো বলা যায় না।

ঃ তাদের কাছে কি ধরনের অস্ত্র রয়েছে?

ঃ পাঁচটি রকেটলাঞ্চার আর ৩০ টি রকেট। দশটি এল, এম, জি, দশটি ষ্টেনগান আর বাকী সব রাইফেল। গ্রেনেড ২০ টি, মাইন ৩০ টি।

ঃ আপনারা কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করার ইচ্ছা রাখেন?

ঃ আমাদের লোকসংখ্যা মাত্র ২২ জন। অস্ত্রও লাগবে ২২ টি। এর মধ্যে চার-পাঁচটি এল,এম,জি,চার-পাঁচটি এস, এল, আর, দশ-বারটি রাইফেল,দশ-পনেরটি গ্রেনেড, শতাধিক স্থলমাইন ও একটি লাঞ্চার আর আট দশটি রকেট। এই পরিমাণ অস্ত্র হলে কামিয়াব হতে পারব বলে আশা রাখি। আমার কথা শুনে সেনাপতি বললেন "ইরান শাহের পক্ষ থেকে আরো একটি চালান আসবে। তা আসলে আপনাদের যা প্রয়োজন তাই নিতে পারবেন।

সেনাপতির কথা শুনে আমি বললাম, জনাব! ইরান শাহ যদি অস্ত্র দেন, তাহলে এগুলো এদিকে না এনে কোন শহরে পাঠিয়ে দিলে আমাদের জন্য অতি সহজ হবে। কারণ, কাবুল থেকে দু-একটি সীমান্ত পেরিয়ে খিবা পর্যন্ত পৌছা খুবই কঠিন। তাছাড়া ঝুঁকিপূর্ণও। আর আমরা যদি কোন বন্দর থেকে নৌকযোগে কাস্পিয়ান সাগর দিয়ে যাই, তা হলে আশা করি নিরাপদে পৌছা যাবে। সময়ও লাগবে অর্ধেকেরও কম। অতএব আপনার নিকট আমাদের দরখাস্ত হলো আমাদেরকে ইরান সরকারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। আর তিনি যেন অস্ত্রগুলো কোমে পৌছে দেন।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই কাবুল সরকার বললেন " বাবা খুবায়েব! তোমার চিন্তা এবং পরামর্শ আমার কাছে খুবই চমৎকার লাগল। তোমরা চিন্তা করো না, আমি তোমাদেরকে সম্মানের সাথে ইরান পৌছে দেব। তোমরা এক সপ্তাহের মধ্যে তৈরী হয়ে যাও। সীমান্ত রক্ষীরা তোমার যে টাকা নিয়ে ছিল তা আমার কাছে পাঠিয়েছে। সকালে তোমাদেরকে টাকা দিয়ে দেব। তোমরা প্রয়োজনীয় কেনাকাটা কর।

আফগান অধিপতি ও সুদক্ষ সেনানায়ক আমাদেরকে অতিথি ভবনে রেখে চলে গেলেন। আমি আমীর সাহেবকে নিয়ে পরামর্শে বসলাম। আমাদের এদীর্ঘ সফরের অত্যাবশ্যক জিনিসগুলোর একটি তালিকা তৈরী করলাম। এর মধ্যে ২২ টি চর্মনির্মিত জলাধার, ২২ টি গ্রাউন সিট, ২২ টি

পিট্র,২২ টি কম্বল ও ২২ জোড়া উর্দী। তা ছাড়া ঔষধ ও খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় মালামাল। এসব কেনাকাটার জন্য সময় ও নির্ধারণ করলাম।

পর দিন দুজনে কাবুল থেকে সমস্ত মালামাল সংগ্রহ করে সেনাপতির নিকট পৌছে দিলাম। এদিকে শরণার্থী মিবির থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাথীদেরকে আনার জন্য আমীর সাহেব চলে গেলেন। এ অবসর সময়ে আমি কাবুলের অলি-গলিতে ও আবাসিক এলাকায় পাগলের মত খুঁজতে লাগলাম আমার রেখে যাওয়া অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রীদেরকে। কিন্তু কোথাও তাদের কোন সন্ধান পেলাম না। আর সন্ধান পাবই বা কি করে? কারণ অন্যসব দেশের মত আফগানের মহিলারা আল্লাহর হুকুম পর্দা লংঘন করেণ না। কোন মহিলা বোরকা ছাড়া রাস্তায় বের হয় না। আপাদ-মস্তক থাকে পর্দাবৃত। শরীরের কোন অংশ দেখার কোন ব্যবস্থা নেই। কোন হেজাব পরিহিতা ললনা দেখলেই আমি তাদের সম্মুখ দিয়ে ঘুরা-ফেরা করতাম,ভাবতাম যে, আমি না চিনলেও তো ওরা আমাকে চিনবে। কত ঘুরা-ফেরা করলাম। কই! কেউ তো আমাকে ডাক দেয় না। কেউ কোন কিছু সুধায় না। সকলেই আপন আপন কাজে এদিক থেকে ওদিক,ওদিক থেকে সেদিক চলে যায়। আমার দিকে চোখ তুলেও তাকায় না। অনেক দূরে কোন মহিলা দেখলেই মনে করতাম, সে-ই হয়ত মাহমুদা বা ছায়েমা। মনে হতো কে যেন মিহিন সুরে ডাকছে অ........খুবায়েব ভাই! আমরা এদিকে। অ......প্রিয়তম আসুন এদিকে। আমরা আপনার অপেক্ষায় আছি।

আসলেই কি এ সুরলহরী ছায়েমা বা মাহমুদার সুললিত কণ্ঠস্বর! না তা নয়। এটা আলেয়ার ধাঁধাঁ। এটা মনের খেয়াল মাত্র। বিরহের অনলে দগ্ধ হতে হতে ভস্ম হয়ে গেছি। কবির উদাহরণ আমার বাস্তব জীবনটাই।

- (লাকড়ি জ্বলকর কয়লা বন্‌তা,কয়লা জ্বলকর রাগহে,
  মায় বেচারা এয়ছা জ্বলতা, না কয়লা না রাগ হে॥)

অর্থাৎ-(লাকড়ি পুড়ে কয়লা হয়, আর কয়লা পোড়ালে ভস্ম। আমি বিরহের আগুনে এমনভাবে পুড়েছি যে কয়লাও নই এবং ভস্মও নই।)

- (তেরে ফরকত ছে দিলেগমজাদা এতন্‌ চুড়াহে, রোখ না রোখনা হে কে গুয়া খানায়ে জাম্বুরহে॥)

অর্থাৎ -(তোমার বিরহের কারণে আমার অন্তর ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। মৌমাছির বাসার মত আমার অন্তর ছিদ্র ছিদ্র হয়ে গেছে।)

(* আগার দানাম তুরা আজমান জুদাই
নমি কারদাম খেয়ায়ে আঁ সেনাই"

অর্থাৎ - আমি যদি জানতাম তুমি অমন করে ভুলে যাবে, তাহলে কখনো আমি তোমাকে মন দিতাম না, ভালবাসতাম না।

* কুজাই আয় আখের মাহবুব কুজাই
যে হালে মান চুনি গাফেল চেরাই।

অর্থাৎ- ওগো আমার প্রাণাধিকা! তোমরা এখন কোথায়? আমার বর্তমান দুরাবস্থার কোন খবর নিলে না।

- ছুব্বাত আলাইয়্যা মাছায়েবুন লাও আন্নাহা ছুব্বুত আলাল আইয়্যাম ছিরনা লায়ালিয়া।)

অর্থাৎ- (আমার উপর যে মছিবত পতিত হয়েছে,তা যদি দিবসের উপর পতিত হতো, তবে তার ভার সইতে না পেরে রাত্রে পরিণত হতো)। হৃদয় নিংড়ানো কবিতাগুলো অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোন সন্ধান না পেয়ে সেনা ছাউনিতে ফিরে আসি।

তিন দিন পর আমীর সাহেব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাথীদের নিয়ে কাবুলে ফিরে আসেন। আফগান অধিপতি ও সেনানায়ক আমাদেরকে মহা মূল্যবান উপদেশ দিয়ে বললেন "বাবারা! আফগানিস্তান শুধু আফগানে জন্মগ্রহণকারীদের নয়। আফগান মজলুমদের আশ্রয়স্থল। আফগান সমস্ত মুসলিমের। তোমরা রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসে যদি মাতৃভূমিতে আশ্রয় না নিতে পার বা নিরাপত্তার অভাব মনে কর, তবে সোজা আফগানিস্তানে চলে আসবে। আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তোমাদের পুনর্বাসন করে দেব এবং কর্মসংস্থানও। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একজন নাগরিক যেমন সুযোগ-সুবিধা পায়,তা তোমরাও পাবে। এ বলে তিনি আমাদের জন্য একজন রাহবর নিযুক্ত করে দিলেন।

এদিকে সেনাপতি সাহেব একটি মানচিত্র, একটি চিঠি ও কিছু টাকা রাহবরের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, মানচিত্রের নির্দেশনা পথে তোমরা যাবে, আল্লাহর রহমতে কোন অসুবিধা হবে না আর তেহরানে পৌছে এই পত্রটি ইরান শাহের নিকট হস্তান্তর করলে তোমাদের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আল্লাহ তোমাদের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা দান করুন। তার পর বাহন হিসাবে একটি করে ঘোড়া দিয়ে বিদায় দিলেন।

রাহবর আমাদেরকে নিয়ে তেহরানের উদ্দেশ্যে কাবুল ত্যাগ করলেন। আমরা কাবুল থেকে ছয় দিনে হেরাত এসে পৌছলাম। এর মধ্যে কত পাহাড় আর মরুভূমি পাড়ি দিতে হচ্ছে, তার কোন হিসাব নেই। উক্ত ছয় দিনের সফর ছিল খুবই আনন্দময়। ছিল না শত্রুর ভয়, ছিল না ক্লান্তি। বিরতি দিয়ে দিয়ে পথ চলছিলাম। হিরাত আমরা তিন দিন অবস্থান করে ঘোটকগুলোর ক্লান্তি দূর করলাম। তিন দিন পর তেহরানের উদ্দেশ্যে হিরাত ত্যাগ করলাম। আমরা তিন সপ্তাহে মাষাদ হয়ে তেহরানে পৌছলাম। রাহবর আমাদেরকে নিয়ে সরাসরি রাজ প্রাসাদের প্রধান ফটকের নিকট গিয়ে থামলেন। আমরা অশ্ব থেকে অবতরণ করে বাগডোর ও গদিমুক্ত করে চারণভূমিতে বেঁধে দিয়ে, বৃক্ষ তলে বিশ্রাম নিতে লাগলাম।

রাহবর শাহী পত্র নিয়ে প্রবেশ করলেন রাজমহলে। আফগান অধিপতির মহরাংকিত শাহী পত্র পেয়ে শাহে ইরান সম্মানপ্রদর্শন করলেন। পত্র পাঠ করে দুজন রাজ কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন আমাদের আদর-আপ্যায়ন ও থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করার জন্য। কর্মচারীদ্বয় ফটকের বাইরে এসে উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন ("সুদূর আফগান থেকে সদ্য আগত মুজাহিদবৃন্দ! আপনারা শাহে ইরানের সালাম গ্রহণ করুন। আপনারা শাহে ইরানের সম্মানিত মেহমান। আমরা আপনাদের খাদেম। আপনারা আমাদের সাথে শাহী মেহমানখানায় চলুন।")

খাদেমের আহবানে আমরা সবাই এসে তার পার্শ্বে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন মেহমানখানায়। আলীশান ইমারত। মনে হয় আকিক পাথরে নির্মিত উক্ত প্রাসাদখানা। কি সুন্দর ও মনোরম। মনে হয় এটাই যেন ইতিহাসখ্যাত সাদ্দাদের বেহেস্ত খানা। চারদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে ফল-ফুলের বাগান, রয়েছে সুমিষ্ট পানির নহর। ছায়াদার বৃক্ষের নিচে রয়েছে সুন্দর সুন্দর চেয়ার। আমরা প্রত্যেকেই চেয়ার দখল করে বসে ইরান শাহের প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করছিলাম। এর মধ্যে একজন খাদেম এসে বললেন "ভাই সব! আপনারা অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছেন, সকলেই ক্লান্ত। তাই গোসল করে খানাপিনা সেরে বিশ্রাম নিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খানা এসে যাবে। তাই গোসল সেরে খানার জন্য তৈরী হোন। এ বলে লোকটি চলে গেল। আমরা গোসলের নিমিত্তে স্নানাগারে প্রবেশ করলাম। স্তরে স্তরে সাজানো বেশ

কয়টি স্নানাগার। বড়ই চমৎকার খুবই সুন্দর। মার্বেল পাথরে সুনিপুণ কারিগর দ্বারা তৈরী। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি তোয়ালে, সাবানসহ গোসলের যাবতীয় জিনিস পত্র সুবিন্যাস্ত রয়েছে। আমরা মনের আনন্দে গোসল সমাপন করলাম। এমন আরামদায়ক গোসল অতীতে করেছি কি না তা মনে পড়ে না।

গোসলের পর মেহমানখানায় গিয়ে দেখি বিভিন্ন ধরনের রুটি আর হরেক রকম গোস্তের সমাহার। তা ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের সুমিষ্ট ফল। আমরা অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে আহার করলাম। আহারের পর সুন্নত হিসাবে ফলও খেলাম প্রচুর। তার পর পৃথক পৃথক পালংকে শুয়ে বিশ্রাম নিলাম। এত নরম ও মোলায়েম বিছানা যতই আরামদায়ক হোক না কেন এগুলোর প্রতি ছিল অনীহা। এধরনের নরম বিছানা মুসলমানদের হওয়া উচিৎ নয়। আর আমার জন্য তো তা হারামই মনে করি। মুসলিম জাতি যে দিন বিলাসিতায় ডুব দিয়েছে, সে দিন থেকে একের পর এক রাজ্য কাফির-বেঈমানদের হাতে চলে গিয়েছে। যারা এক সময় ছিল গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টিকারী, তারাই রাজ্য হারিয়ে হয়েছে পথের ভিখারী। যে জাতির হুংকারে পূর্ব-পশ্চিমের অইসলামী রাজ্যগুলো থর থর করে কাঁপছিল, যাদেরকে জিযিয়া (কর) দেয়ার জন্য কাফির দুনিয়া করত প্রতিযোগিতা। আজ তাদেরকে ট্যাক্স দিতে হয় কাফির আর বেঈমানদের হাতে। নারী, বাড়ী আর গাড়ীর লোভে মুসলিম জাতির অধঃপতন ডেকে এনেছে। মুসলিম পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অশ্রু শুকিয়ে রক্তাশ্রু নির্গত হয় নয়নপথে। এসব চিন্তা করতে গিয়ে চোখে ঘুম আসল না। শুধু এপাশ ওপাশ করছিলাম।

অঘুম নয়নে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়ে গাত্রোত্থান করে সালাতে দন্ডায়মান হলাম। এদিকে আমীর সাহেবের অবস্থাও অনেকটা আমার মতো। তিনিও ঘুমাননি। কয়েক রাকাত সালাত আদায় করে বাইরে বেরিয়ে এলাম অশ্বগুলোর খোঁজ নেয়ার জন্য। আমীর সাহেবও আমার সাথে বেরিয়ে এলেন। চারণভূমিতে গিয়ে দেখি কয়েকজন রাখাল আমাদের অশ্বগুলোর সেবায় নিয়োজিত। ওরা গোসল করিয়ে পুষ্টিকর খাবার ও পানি পান করিয়ে এখন কাঁচা ঘাস ভক্ষনের জন্য মাঠে ছেড়ে দিয়েছে। অশ্বগুলো মনের আনন্দে ও তৃপ্তির সাথে কাঁচা ঘাস ভক্ষন করছে।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল। ইরানের শাহী মসজিদে আসরের সালাতের আযান ধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের অন্যান্য সাথীরাও অযু এস্তেঞ্জা সেরে মসজিদে আসছে। রাজ কর্মচারীগণও কিছুক্ষণের মধ্যে মসজিদে এসে হাজির হয়েছে। ইমাম সাহেব নামাজ পড়ালেন। তাদের নামায আমাদের নামাযের মতো নয়। আমরা চুপি চুপি নামায দুহরায়েছি। নামাযে হাততালী দেয়া, উরুতে তালী বাজানো, এসব কোন দিন দেখিনি। মেহমানখানায় ফিরে এসে তাদের কান্ডকীর্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমীর সাহেব বললেন "এরা শিয়া। তাদের আকিদার (বিশ্বাসের) সাথে আমাদের আকিদার মিল নেই। শিয়ারা অনেক দলে বিভক্ত। এদের মধ্যে দুই একটি দল আছে তাদের আকিদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার সাথে বেশ মিল রয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য শিয়া দলগুলো ভ্রান্ত। তাদের বিশুদ্ধ আকিদা না থাকার কারণে আমরা মুসলমান মনে করি না। এরা খুবই জঘন্য। তাদের ইমামতিতে আমাদের নামায হবে না। তাই আমরা নামায দুহরায়েছি (পূনরায় পড়েছি)

মাগরিবের নামায আদায় করেছি মেহমানখানায়। তার পর তেহরানের শহর দেখার জন্য বের হয়ে কিছু ঘুরাফেরা করে এশার আগেই ফিরে আসি। আমরা এশার নামায জামাতের সাথে মেহমানখানায় আদায় করলাম। তার পর খানা খেয়ে নিদ্রা যাওয়ার আয়োজন করছি। এর মধ্যে পদস্ত দুজন রাজ কর্মচারী ২২ জন পরমা সুন্দরী যুবতী নিয়ে এসে বললেন "মুহতারাম মুজাহিদ বন্ধুগণ, আপনারা অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছেন। সফরজনিত ক্লান্তি এখনো দূর হয়নি। আপনারা ইরান শাহের সম্মানিত মেহমান। আপনাদের সেবার জন্য শাহে ইরান ২২ জন সুন্দরী তরুণীকে প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে নিয়ে আপনারা রাত যাপন করবেন। ওরা আপনাদের সেবা করবে। মনে আনন্দ দিবে, ক্লান্তি দূর হবে।

রাজ কর্মচারীর কথা শুনে আমার রক্ত পা থেকে মাথায় উঠে গেল। চোখ দুটি হয়ে গেল আগুনের মতো লাল। আমি অগ্নিশর্মা ধারণ করে, রোষকষায়িত লোচনে তাকিয়ে বললাম, কি বলেছেন আপনারা? একটি মুসলিম দেশের শাসকদের এধরনের আচরণ তো ভাবতে পারিনি। লোকটি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে খুব মার্জিত ভাষায় বললেন, "ভাইজান! এটা নাজায়েজ কিছু না। আমরা তাদেরকে আপনাদের নিকট

বিয়ে পড়িয়ে দেব। তারা হবে আপনাদের স্ত্রী। যে কয়দিন এখানে অবস্থান করবেন, সে কয় দিন ওরা আপনাদের স্ত্রী হিসাবে থাকবে। আপনারা চলে যাওয়ার সময় তালাক দিয়ে চলে যাবেন। "আমীর সাহেব বললেন "তাহলে এটা কি নিকাহে মুতা? তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ এটা নিকাহে মূতা। অতঃপর আমীর সাহেব বললেন "ভাইজান! আমাদের মাযহাব অনুযায়ী নিকাহে মুতা জায়েজ নয়। কাজেই এই কর্ম আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।

কেন? তা তো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

"হ্যাঁ এক সময় তা জায়েয ছিল। পরবর্তী হাদীসে তা রহিত হয়ে গেছে। কাজেই এ ব্যাপারে আপনারা আমাদের উপর জুলুম করবেন না। তাছাড়া আমরা দ্বীনের মুজাহিদ। কষ্টকরা আমাদের কাজ। খাদেম-খোদ্দামের কোন প্রয়োজন নেই।

"আমি উক্ত লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ভাই! বলুন ত এত অল্প সময়ে এতগুলো মেয়ে কোথা থেকে এনেছেন?

তিনি উত্তরে বললেন–

এধরনের প্রায় একশ মেয়ে রয়েছে। এরাও ইরান শাহের রাজ কর্মচারী। এদেরকে নিয়মিত ভাতা দিয়ে থাকেন। তাদের থাকার সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী খাবার ও ঔষধ ইরান অধিপতি নিজেই বহন করেন। তাদের কাজ হল মেহমানের খেদমত করা। কোন রাষ্ট্রীয় অতিথি আসলে,তাদেরকে বিয়ে পড়িয়ে দেই। বিদায়ের সময় তালাক দিযে চলে যায়। আমরা তাদের এ প্রস্তাব কে অসম্মানের সাথে প্রত্যাখ্যান করলে ওদেরকে নিয়ে চলে যায়। আমি আমীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "জনাব! ওরা তো দেখি সঠিক মুসলমান নয়। তাহলে আমাদেরকে এত সাহায্য করে কেন? উত্তরে তিনি বলেন–

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক দুর্দিনে ওসব দেশ ইরানের পক্ষে থাকবে। আর সমস্ত রাষ্ট্রের জন্যই উচিৎ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক রাখা তাছাড়া ইরান ভাবছে কমিউনিষ্টরা তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তাসকন্দ সমরকন্দ ও বুখারাসহ এশিয়ার প্রায় অর্ধেক ভূখন্ড জবরদখল করে নিয়ে গেছে রাশিয়ার বলকে। আর তুর্কমেনিস্তান ও রাশিয়ার সাথে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। ওরা যে কোন সময় ইরানের দিকে নজর দিতে পারে। তাই ইরান পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে সাহায্য দিচ্ছে

আমীর সাহেবের কথা শুনে আমার মনে পড়ল হুজুর (সাঃ) এর কথা। তিনিও মদীনার ইহুদীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন।

রাত অতিবাহিত হওয়ার পর শাহে ইরান সেনানয়ককে নির্দেশ দিলেন আমাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি কোম পর্যন্ত পৌছার জন্য সামরিক গাড়ীর ব্যবস্থা করলেন। আর কারানুভডস্ক পর্যন্ত পৌছার জন্য ব্যবস্থা করলেন নৌযানের। সকাল ১০ টা বাজার আগেই আমাদেরকে তৈরি হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্য অনেক লোক জমায়েত হল। আমরা মালামালসহ বাসে উঠে আসন গ্রহণ করলে সকলেই সালাম দিয়ে বিদায় দিলেন।

তেইশ

বাস আমাদেরকে নিয়ে চলল মন্থরগতিতে। কোম থেকে সাগরতীরের দুরত্ব একশ আটত্রিশ কিলোমিটার। এর মধ্যে রয়েছে উঁচু-নিচু টেক টিলা। রয়েছে মরুভূমি। এরই মধ্যদিয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে নির্মিত পিচঢালা মাঝারি ধরনের পথ। পথের দু ধারে রয়েছে বাবলা জাতীয় নাম না জানা বৃক্ষ। গাছগুলো উল্লেখযোগ্য ছায়াদার না হলেও সবুজ কিশলয়ে আপাদমস্তক ঘোমটা ঢাকা। দেখতে বড়ই চমৎকার। হলুদ ফুলে ভরে আছে ডালপালা। যেন এক রূপের বাহার। মৃদুমন্দ অনিল হিল্লোলে মধুর গন্ধে ভরিয়ে দেয় পথঘাট। অত্যন্ত আনন্দের মধ্য দিয়ে পথ চলছি। গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ৩০ কিঃমিঃ। রাস্তাটি আঁকা-বাঁকা থাকার কারণে সাগরতীরে পৌছতে বিকাল হয়ে গেল।

আমরা বাস থেকে নেমে সাগর তীরে তাঁবু রচনা করলাম রাত যাপনের জন্য। কারণ, নৌযানের ব্যাবস্থা না হলে এখানেই থাকতে হবে। আর কত দিন যে এখানে থাকতে হবে তাও জানা নেই। আমরা এখানে এমনভাবে তাঁবু রচনা করলাম, যেন মিনি সেনা ছাউনি। আমরা

পালাক্রমে পাহারা দিয়ে রাত পাড়ি দিলাম। খাবারের জন্য কোন পৃথক চিন্তা করতে হল না। কারণ, আমাদের নিকট যে খাবার আছে, আনায়াসে তা এক সপ্তাহ চলে যাবে। আসার সময় সেনানিবাস থেকে খুরমা,খেজুর,কিসমিস,পেস্তা গোস্ত ভুনা ও প্রচুর রুটি দিয়েছিলেন। এসব খাবার দুই-তিন সপ্তাহে নষ্ট হওয়ার মত নয়। আমরা অনেকটা ভাবনা মুক্ত অবস্থায় কাস্পিয়ান সাগর অববাহিকায় অবস্থান করতে লাগলাম। আমির সাহেব নৌকার জন্য এদিক-ওদিক চেষ্টা করতে লাগলেন। দুঃখের বিষয়, এক সপ্তাহের মধ্যেও কোন ছোট নৌকা বা ট্রলারের ব্যাবস্থা করতে পারেননি। কোন মাঝি–মাল্লা বা নাবিক আমাদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হল না। তাই আমরা অধির আগ্রহে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার প্রমাদ গুণছি এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি।

এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর যখন কোন নৌযানের ব্যাবস্থা করতে পারলেন না, তখন আমাকে বললেন, খুবায়েব ভাই! নৌকা তো কেরায়া করা গেল না। ইঞ্জিন চালিত নৌকা ছাড়া কয়েকশ মাইল পানিপথ অতিক্রম করা যাবে না। ইঞ্জিনচালিত যেসব নৌকা, সেসব এত দুরে পাড়ি জমাতে চায় না। এমতাবস্থায় কি করতে পারি পরামর্শ দিন। আমি বললাম, জনাব এত পেরেশান না হয়ে চলুন মাঝারি ধরনের একটি নৌকা খরিদ করে নেই। আমাদের কাছে খরিদ করার মত অর্থ আছে কিনা জানতে চাইলেন আমির সাহেব। আমি বললাম, একটা কেন, নৌকা চারটা কেনার মত অর্থ আছে।

নৌকা চালানোর মত লোক তো আমাদের নেই।

আমি দীর্ঘ দিন নৌকায় ছিলাম, ইঞ্জিন চালানোর কলাকৌশল আমি জানি, এমন কি মেরামতও করতে পারি।

আপনার দ্বারা কি করে সম্ভব? আপনার যে হাত নেই।

এক হাত এক পায়ে ইঞ্জিন চালানো যায়। এক হাতে কান্ডারীর কাজও করা যায়। অতীতেও তা করেছি।

আমার কথা শুনে আমীর সাহেবের মলিনমুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। এখন তিনি ইঞ্জিনচালিত নৌকা খরিদ করার জন্য কোন শহরে চলে গেলেন। তিনি এক জাহাজ কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে মাঝারী ধরনের একটি নৌকা খরিদ করেন। তিন দিন পর নৌকা এনে

ঘাটে পৌছে দিলেন। আমরা প্রায় তিন মাস চলার জন্য হাট বাজার করে নৌকায় উঠালাম। তা ছাড়া তেলমবিল পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্রয় করে নিলাম, যেন চার-ছয় মাসের মাধ্যে প্রয়োজন না হয়। তার পর সকলেই আল্লাহর নাম নিয়ে নৌকায় চেপে বসলাম। তার পর ইঞ্জিন চালু দিতেই ঢেউয়ের ঝুটির উপর দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে চলল। আমাদের অন্যান্য সাথীরা অস্ত্রশস্ত্র তাক করে ফায়ার পজিশনে বসে রইল। কারণ, সমুদ্রপথে হয়ত কোন জলদস্যু বা টহলরত নৌসেনাদের সাথে সংঘর্ষ হতে পারে। তাই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

আমরা সমুদ্র উপকূল পরিহার করে মধ্যসাগরের বুক বেয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। কারণ, উপকূলের কাছাকাছি দিয়ে সীমান্ত রক্ষী নৌযান নদীর কাজেই মাঝ দিয়ে ঘোরাফেরা করে নদীর কাজেই মাঝ দিয়ে চলাটাই ছিল আমাদের জন্য নিরাপদ। সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার উপর দিয়ে হেলে-দুলে তরী চলল। আমি আমার সঙ্গিদেরকে নাবিকের প্রশিক্ষণ দিয়ে দুতিন দিনের মধ্যেই উপযোগী করে তুললাম। এখন প্রায় অনেকেই হাল ধরতে পারে, ম্যাপ দেখে চলতে পারে, কম্পাস দেখে দিকনির্ণয় করতে পারে। মেঘমুক্ত আকাশের তারকা দেখে সময় বলতে পারে।

আমাদের রণতরীর ইঞ্জিন ছিল দুটি। একটি গরম হলে অপরটি চালু করে দিতাম। এভাবে এক সপ্তাহ পথ চলার পর এমন এক স্থানে এসে আটকা পড়ে গেলাম, যা অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না। আমরা আটকা পড়েছিলাম কোন বালুচর বা দ্বিপপুঞ্জে নয়। এটা ছিল তিমির অভয় চারণভূমি। অর্থাৎ এ এলাকায় ঝাঁকে ঝাঁকে তিমি মাছ চলাফেরা করে। এ এলাকার উপর দিয়ে কোন নৌযান চলাফেরা করতে পারে না। আমরা পরে জানতে পারলাম, তিমিরা অতীতে নাকি অনেক জাহাজ আটকিয়েছিল। অনেক জাহাজের কর্মচারীকে আস্ত গিলে ফেলেছে। আমরা দূর্বীনে বহু দূর পযর্ন্ত দৃষ্টি মেলে দেখি, হাজার হাজার তিমি এদিক-ওদিক ছুটাছুটি ও খেলাধুলা করছে। ডানে-বামে, আগে-পিছে কোন দিকে চলার পথ নেই। এরা যদি,ক্ষেপে উঠে, তা হলে আমাদের নৌকা লেজের আঘাতে খন্ডবিখন্ড করে দিবে আর ২২ জনকে এক লোকমায় গিলে ফেলবে। এমতাবস্থায় ইঞ্জিন বন্ধ করে সবাইকে বলে

দিলাম, ভাই সব! আল্লাহর মদদ ছাড়া এক হাতও অগ্রসর হওয়া যাবে না। অতএব আপনারা সালাতুল হাজাতে দাঁড়িয়ে যান। আমার নির্দেশে সকলেই সালাতুল হাজাত পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নকাটি করতে লাগল।

এ অবস্থায় কেটে গেল পাঁচ দিন। ওরা আমাদের পথ ছেড়ে দেয়নি। আমরা নৈরাশ্বের পারাবারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। ৬ষ্ঠ দিবসে আমি দুরাকাত নামায পড়ে দুহাত উর্ধ্বে তুলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালাম, প্রভূ হে! আমরা তোমার নাফরমান বান্দা। আমাদের অন্যায়-অপরাধের সীমা নেই। এত গোনাহ করেছি, যার কোন হিসাব নেই। প্রভূ গো! আমরা যত বড় গোনাহগারই হই না কেন, তবু তোমারই বান্দা, তোমারই দাস। আর তুমি হলে গাফফার ও রাহমান। অতএব আমাদের গোনাহ মাফ করে দিয়ে গাফফারিয়াতের পরিচয় দাও। ওগো আমার মাওলা,আমরা তোমার দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য তোমার যমিনে তোমার খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছি। অতএব আমরা তোমরাই সৈন্য এবং দ্বীনের মুজাহিদ। অতীতে বহুবার তুমি আমাদেরকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছ। ঠিক তেমনিভাবে এখনো উদ্ধার করবে বলে আশা রাখি। অতএব আমাদেরকে এমহাবিপদ থেকে উদ্ধার কর।

দোয়া শেষ করে আমি উচ্চস্বরে ঘোষণা দিতে লাগলাম, হে জলজ বৃহৎ প্রাণী তিমিকুল! আমরা দ্বীনের মুজাহিদ। আমরা দ্বীনের মুজাহিদ। আমরা আল্লাহর দুশমনদের হত্যা করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য অভিযানে যাচ্ছি। আর তোমরা একটি সপ্তাহ যাবৎ আমাদের পথ বন্ধ করে রেখেছ। আমাদের মহামূল্যবান সময় তোমরা নষ্ট করে দিয়েছ। আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি ,যার হাতে তোমার আমার জান, তোমরা আমাদের চলার পথ ছেড়ে দাও। আমাদের জিহাদের কাজে তোমরাও সাহায্য করো। তা না হয় কাল কিয়ামত দিবসে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বিচার দায়ের করব। আমি যখন এধরনের প্রার্থনা করছিলাম, তখন আমার এক সাথী চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, “খুবায়েব ভাই! খুবায়েব ভাই! পশ্চাৎ দিক থেকে একটি যুদ্ধজাহাজ এদিকে ধেয়ে আসছে।

আমি তার কথা শুনে দুর্বীন হাতে নিয়ে দেখি, সত্যিই তো একটি যুদ্ধ জাহাজ খুব দ্রুত গতীতে আমাদের দিকে আসছে। উক্ত রণতরীর শীরোভাগে তুর্কমেনিস্তানের পতাকা পত্পত্ করে উড়ছে। আমার বুঝতে বাকী নেই যে, এরা তুর্কমেন নৌবাহিনী। এর দূরপাল্লার দুর্বীনের সাহায্যে আমাদেরকে দেখে ফেলেছে। এরা যে কোন মূল্যে আমাদের অগ্রাভিযান রোধ করবে, অগ্রযাত্রা ব্যাহত করবে। এমনকি আমাদের রণতরীর সলিল সমাধি রচনা করবে দেখ দেখ করতে করতে আমরা তাদের অস্ত্রের রেঞ্জে এসে যাওয়ার উপক্রম হলাম।

অবস্থা বেগতিক দেখে আমীর সাহেবকে পরামর্শ দিলাম যে, হযরত! মহাবিপদের সংকেত দেখা যাচ্ছে। আপনি সকল সাথীকে সর্বোচ্চ সতর্কতা সংকেত দিয়ে দিলে ভাল হয়। তুর্কেমেন রণতরী আমাদের সন্নিকটে এসে পৌছেছে। তাদের নিকট যদি দূরপাল্লার মারণাস্ত্র থাকে তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা আমাদেরকে লক্ষ করে গুলি ছুড়বে। এখন চিন্তা করুন কি করবেন।

আমির সাহেব আমার কথা শুনে সবাইকে নির্দেশ দিলেন নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকার জন্য। আমরা প্রত্যেকেই আমির সাহেবের নির্দেশে তৈরি হয়ে গেলাম। এতক্ষণে তুর্কমেন রণতরী থেকে একটি মটারের গোলা আমাদের নৌকার সামান্য দক্ষিণে এসে পড়ল। বিকট আওয়াজ বিস্ফোরিত হওয়ার কারণে পানিগুলো বলক উঠে বহু উপরে উঠে গেল। তিমিরা ভয় পেয়ে লাফালাফি করতে লাগল। আর অনেকেই গভীর সাগরে তলিয়ে গেল। পর পর আটটি গোলা নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহর মেহেরবানিতে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। এদিকে তিমিরা আমাদের রাস্তা ছেড়ে সমুদ্র গভীরে তলিয়ে যাওয়াতে সম্মুখের পথ সুগম হয়েছে। তাই নাবিক ইঞ্জিন চালু দিয়ে সামনে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। এভাবে আমরা চলে গেলাম দুশমনের নাগালের বাইরে। আর দুশমনরা এসে পড়ল মৎসরাজ তিমির রাজ্যে। এবার তুর্কেমেন রণতরী আটকা পড়ে গেল। আমরা দুর্বিনের সাহায্যে এসব অবলোকন করছিলাম। এবং বেশি বেশি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছিলাম।

একবার দেখি, বিরাট আকারের একটি তিমি তাদের রণতরীর পশ্চাত দিকথেকে তার বিশাল লেজ উচিয়ে একটি আঘাত হানল। সাথে সাথে

নৌযানটি টুকরো টুকরো হয়ে সাগর গর্ভে তলিয়ে গেল। আর কিছু সৈন্য বাঁচার জন্য উর্মিমালার উপর দিয়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারেনি। পাচঁ সাতজনকে এক সাথে এক লুকমায় ভক্ষন করতে লাগল। এভাবে যারাই মরে ভেসে উঠত, তাদেরকেই গিলে ফেলত। কিছুক্ষণ পর আর কোন লাশ দুর্বীনের রেঞ্জে ধরা পড়েনি। এদিকে আমাদের রণতরীও অনেক দূরে চলে এসেছে। আর কিছুই নজরে পড়ল না। শুধু পানি আর পানিই দৃষ্টিগোচর হল। আমি সবাইকে এ সুসংবাদ দিয়ে বললাম, আপনারা সকলেই সালাত আদায়ের মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামীনের শোকর আদায় করুন। অতঃপর সকলেই আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

আমরা অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও ঝড় ঝাপটার মধ্য দিয়ে ৩৮ দিনে কারানুভডস্কের বিশ মাইল উত্তরে সমুদ্রোপকূলে অর্থাৎ রাওয়াল পর্বত মালার সন্নিকটে এসে হাজির হলাম। আমরা এমন একটি স্থানে নৌকা নোংগর করলাম, সেখানের দুদিকে রয়েছে আকাশচুম্বী পর্বতমালা। আর এক দিকে রয়েছে কাস্পিয়ান সাগর আর অপর দিকে রয়েছে সমতল ভূমি। আমাদের অবস্থান ছিল খুবই জুতসই স্থানে। গেরিলা হামলার উপযুক্ত জায়গা।

রাতের আহারাদী সমাপ্ত করে, এশার সালাত আদায় করে আমীর সাহেব সবাইকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। বিভিন্ন দিক নিয়ে পরামর্শ হল। আমি আক্রমণের খসড়া প্রস্তুতের জন্য দুদিন সময় নিলাম। এতে সকলেই একমত হয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আমি শেষ রাতে আরো দুইজন সাথীকে নিয়ে মারবিয়া উপত্যকা গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি পূর্বের কোন স্মৃতি অবশিষ্ট নেই। সবই পাল্টে গিয়েছে। আগে বন্দীরা থাকত খোলা আকাশের নিচে। এখন ওরা থাকে হাফ বিল্ডিংএ। আগে কোন বাউন্ডারী ওয়াল ছিল না এবং ছিল না পাহারা চৌকি। এখন এসবই হয়েছে। আমি পাহাড়ের চূড়ায় বসে নাইট দূর্বীনের সাহায্যে এসব দৃশ্য অবলোকন করছিলাম।

আমি আমার দুজন সাথীকে বললাম যে, তোমরা ভয় পেয়ো না। অস্ত্র তাক করে আমার পিছনে আস। ওরা আমার পিছু পিছু বিড়ালের মতো। পা চেপে চেপে আসতে লাগল। আমরা প্রাচীর ঘেঁষে ক্রোলিং করে প্রধান

ফটকের কাছে চলে আসলাম। এসে দেখি তিনজন পাহারাদার চেয়ারে বসে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। ওরা গেইটের ভিতর না থাকলে অবশ্যই জবাই করে দিতাম।

আমরা এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করে তাদের অবস্থান জরিপ করে ফিরে আসি। সারা দিন খুব সতর্কতার সাথে কাটিয়ে দিলাম। রাত ১২ টার দিকে আমীর সাহেব মুজাহিদদেরকে তিনটি দলে বিভক্ত করেন। নয় জনের একটি গ্রুপকে সমুদ্র দিক থেকে আর নয়জনের অপর গ্রুপকে পাহাড়ের দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। বাকী চারজনকে রেখে দিলেন নৌকা পাহারার জন্য। আমীর সাহেব রাত একটার দিকে আমাদেরকে দু রাকাত নামাজ আদায় করে কামিয়াবীর জন্য দোয়া করতে হুকুম দিলেন। আমরা নামাজ আদায় করে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলাম। তার পর রণসাজে সুসজ্জিত হয়ে দুশমনের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

রাত তিনটার দিকে দু দিক থেকে ফায়ারের পর ফায়ার আরম্ভ হলো। প্রথম ধাপে আমাদের গ্রেনেড হামলায় বেশ কজন পাহারাদার নিহত হল। তার পর কয়েকটা ফায়ার করে তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করি। এর মধ্যে বাংকারে লুকায়িত সৈন্যরা আমাদেরকে টার্গেট করে গুলি নিক্ষেপ করে এতে আমাদের পাঁচজন সাথী শাহাদাতবরণ করেন এবং আহত হন তিনজন। অবস্থা বেগতিক দেখে উভয় দল মিলে তাদের উপর তীব্র আক্রমণ চালাতে থাকি। ভোর পর্যন্ত একটানা লড়াই চলতে থাকে। এদিকে ফজরের সময় হয়ে গেলে পৃথক পৃথক জামাতে নামাজ আদায় করে কিছু নাস্তা পানি খেয়ে আবার ফায়ার আরম্ভ করি। সকাল ৬ টার দিকে প্রতিপক্ষের কোন ফায়ারের শব্দ কানে আসেনি। আমরা বুঝতে পারলাম,আল্লাহ পাক আমাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় দান করেছেন।

মোহতামর আমীর সাহেব আমাদেরকে বন্দীশালার তালা ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেন। আমরা থ্রিনট থ্রি রাইফেল দিয়ে তালার মধ্যে কয়েকটি গুলি করলে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে। তার পর ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, বন্দীরা কেউ সেজদায় পড়ে আছে আর কেউ একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে। আমীর সাহেব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন "প্রিয় বন্দীগণ! আমরা দ্বীনের মুজাহিদ। আমরা এসেছি

তোমাদের মুক্তির জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় দান করেছেন। তোমরা এখন মুক্ত। তোমরা নিজ নিজ বাড়ী ফিরে যাও। আর যারা ইচ্ছা কর তারা আমাদের সাথী হতে পার। তবে ২০/২৫ জনের বেশী না। কারণ, আমাদের বাহনে ২০/২৫ জনের বেশী লোক সংকুলান হবে না।"

আমীর সাহেবের কথা শুনে বন্দীরা হুমড়িয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে গেল। আর আমীর সাহেবের ১২ জন সাথী আমাদের নিকট এসে বললেন, "ভাই সব! আমরা আপনাদের সাথে যাব।" আমরা উক্ত ১২ জন সাথী নিয়ে শহীদদের লাশ দাফন করলাম। তার পর আহত সাথী ও দুশমন থেকে গনিমতের মালামাল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিকাল তিনটায় নৌকায় ফিরে আসি। তার পর সন্ধ্যার পর পরই উক্ত স্থান ত্যাগ করে সমুদ্রের গভীরে চলে আসি। তার পর কাস্পিয়ান সাগর পাড়ি দিয়ে আজারবাইজান হয়ে দীর্ঘ কযেক মাসে ইরানের কোম নগরীতে এসে পৌছি। আমরা কোম নগরীতে এসে ইরানের সৈন্যদেরকে আমাদের নৌযান বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, এ তরীখানা এখন থেকে ইরান সৈন্যদের সম্পদ। আপনারা এখন থেকে এটার মালিক। আপনারাই তা ব্যবহার করবেন। কোমের সৈন্যরা আমাদেরকে সেনানিবাসের বাসে করে তেহরানে পৌছে দিলেন। শাহে ইরান ও প্রধান সেনাপতি আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে অতীথি ভবনে নিয়ে গেলেন। তারা আমাদের কারগুজারী শুনে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেখানে তিন দিন বিশ্রাম করার পর ইরান শাহের তত্ত্বাবধানে কাবুল পাঠিয়ে দেন।

আমরা কাবুলে ফিরে আসলে কাবুল সরকারের অনুগত বাহিনী আমাদেরকে গার্ড অব অনার দিয়ে মেহমানখানায় নিয়ে যান। আমরা গনীমতের মালমাল আফগান অধিপতির নিকট পেশ করলে তিনি সব মাল শুকরিয়ার সাথে গ্রহণ করে আবার আমাদের মাঝে বন্টন করে দেন। তিন দিন পর নাদির শাহ আমাদেরকে বললেন, বাবারা! আপনারা অনেক কষ্ট করে বিজয়ী বেশে ফিরতে পেরেছেন বলে মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি এবং তোমাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তোমরা এখন ক্লান্ত। দু-চার মাস বিশ্রাম নেয়া দরকার। এখন আর কোন হামলার চিন্তা না করে নিজ নিজ আশ্রয়ে গিয়ে বিশ্রাম করো। আর বাল-বাচ্চাদের

খোজ-খবর নাও।" আফগান সরকারের কথা শুনে সকলেই নিজ নিজ আশ্রয়ে চলে গেলেন।

আমি সারা রাত অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিলাম। প্রতুষ্যে গাত্রোত্থান করে অযু-এস্তেঞ্জা ও ফজরের নামায সমাপন করে আল্লাহর দরবারে স্বজনপ্রাপ্তির দোয়া করলাম। তার পর শাহে আফগানের খেদমতে হাযির হয়ে পাকতিয়া যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করালাম। তিনি পাকতিয়া যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে আমার সব ঘটনা খুলে বললাম। মহামতি নাদির শাহ আমার করুণ কাহিনী শুনে চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে বললেন "বাবা! আমারও ধারণা তোমার স্ত্রীগণ পাকতিয়া চলে গেছেন। তুমি সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতে পার। এ বলে তিনি আমার হাতে ৫০ হাজার টাকা দিলেন এবং বললেন "ওদেরকে না পেলে আবার কাবুলে ফিরে আসবে।

আমি শোকরিয়ার সাথে টাকাগুলো গ্রহণ করে পাকতিয়ার উদ্দেশ্যে কাবুল নগরী ত্যাগ করলাম। কিছু পথ বাসে, কিছু পথ টাংগায় আবার কখনো কখনো পায় হেটে দীর্ঘ পনের দিনে কাঙ্খিত পাকতিয়া শহরে এসে হাজির হলাম।

পাকতিয়া একটি প্রাদেশিক শহর। শহরটি অত বড় না হলেও ছোট বলা যায় না। জনবহুল এ নগরী। অন্যসব প্রাদেশিক শহরের তুলনায় এটা খুব ব্যস্ততম শহর। উক্ত শহরেই অবস্থিত পাকতিয়া মাদ্রাসায়ে নেযামিয়া। মাদ্রাসাটি দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫ শতাধিক। উস্তাদ সংখ্যাও বিশ এর উর্দ্ধে। পাকতিয়া প্রদেশে এটাই বড় মাদ্রাসা। উত্তর ও পুর্ব দিকে রয়েছে শিক্ষাভবন ও ছাত্রাবাস। পশ্চিমে জামে মসজিদ। মসজিদের উত্তর পার্শ্বে রয়েছে হেফজখানা। মধ্যে বিশাল মাঠ ও দক্ষিণে খালি। পুরা শহরটি প্রদক্ষিণ করে মাদ্রাসার এলাকাটিই আমার কাছে পছন্দ হল। মনের শান্তি, হৃদয়ের প্রশান্তি খুজেঁ পাওয়া যায় এখানেই। তাই প্রতি দিন শহর ও শহরতলীতে মাহমুদা ও হেলেনাকে তালাশ করে করে এখানেই এসে আশ্রয় নেই। থাকি মসজিদের ছেহেনে।

মসজিদের ছেহেনে বসলে হেফজ ছাত্রদের গুনগুনানী সুমধুর তিলাওয়াত শোনা যায়। সকাল-সন্ধা মুখরিত থাকে ছাত্রদের গুঞ্জনে। তাই মসজিদ ছেহেনকেই থাকার জন্য নির্বাচন করলাম। ওদের চিন্তায় পানাহার

অনেকটা কমে গিয়েছে। দিনে কখনো একবার খাই ,কখনো দুদিনে এক বার। প্রায় ১০/১৫ দিন ঘোরাফেরা করে না পেয়ে ভাবলাম, হয়ত আর পাওয়া যাবে না। তাই তালাশ করা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি। এখন ধৈর্যের বীজ বপন করে অশ্রুর সেচ দিতে লাগলাম আর সঠিক সংবাদের জন্য দোয়া করতে লাগলাম।

হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য আমি বেশী সময়ই ছেহেনে বসে কুরআন তিলাওয়াত করি। অনেক ছাত্র-উস্তাদ এসে একটু দূরে হেফজখানা থেকে ছোট একটি বাচ্চার সুমধুর তিলায়াত ভেসে এসে আমার হৃদয়ে পতিত হত। এমন মনমাতানো সুরলহরীতে আমার আত্মা কেড়ে নিয়ে গেল এমন সুললিত ও সুমধুর কণ্ঠ অতীতে আর কোন দিন শুনিনি। ছেলেটাকে দেখার জন্য আমার মন খুবই পাগলপারা হয়ে উঠল। কিন্তু কেউ কোন দিন আমাকে মাদ্রাসায় বা হেফজখানায় যেতে বলত না। যদি কেউ হেফজখানায় নিয়ে যেত, তা হলে হয়ত ছেলেটিকে আবিস্কার করতে পারতাম। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। হোটেলে খাই, মসজিদের ছেহেনে থাকি আর বেশী বেশী তিলাওয়াত করি।(পবিত্র কালামের সাথে রয়েছে আমা আত্মার শান্তি)। এর মধ্য দিয়ে কেটে গেল এক সপ্তাহ।

মুয়াজ্জিন যখন মিনার চূড়ে উচ্চকণ্ঠে সুমধুর সুরে আযান দেন, তখন ছাত্র-শিক্ষকগণ সালাত আদায়ের নিমিত্তে সারিবদ্ধভাবে মসজিদে আসতে থাকেন। আমি তখন সেই বাচ্চাটিকে (যে মধুর সুরে কোরআন পাঠ করে) ডাগর দুটি আঁখি মেলে তালাশ করতে থাকি, কিন্তু পরিচয় পাইনি। ছেলেটির তিলাওয়াতের সুরলহরী সারাক্ষণ আমার অন্তরে অনুরণিত হতে থাকে। তবে আমার তিলাওয়াতও অনেকের দিল কেড়ে নিয়েছিল।

এক দিন যোহরের নামাজ আদায় করে মসজিদের অলিন্দে বসে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ছেলেটির সন্ধান করছিলাম। তখন ছাত্ররা মসজিদে বসে খতম পাঠ করছিল। খতম সমাপন করে বড় হুজুর দোয়া করলেন। তার পর ছাত্রর ক্লাশ রুমের দিকে চলল। আমার সন্ধানী চোখ এবারও ব্যর্থ হল। ছাত্ররা চলে গেলে মাদ্রাসার বড় হুজুরসহ চার-পাঁচজন উস্তাদ জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বসে গেলেন। এর মধ্যে প্রধান হাফেজ হুছাইন বিন মাহবুবও ছিলেন।

বড় হুজুর মাওলানা আফতাব গাহারী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা ! আপনার পরিচয় কি? আজ কদিন যাবৎ এখানে থাকছেন, তার কারণই বা কি ? আমি বিনীত কণ্ঠে বললাম, হুজুর ! আমর পরিচয় দিতে আমার নিকট লজ্জা লাগে।

ঃ নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা হয়, অমন কথা তো শুনিনি কোন দিন, এ আবার কেমন কথা ?

ঃ হুজুর ! আমি যদি পলাতক না হয়ে একজন বীর পুরুষ হতাম, তা হলে বংশের পরিচয়সহ আমার পরিচয় দিতাম। সেটা হত আমার গৌরবের কারণ। তার পরও পরিচয় গোপন রাখা বেয়াদবী হবে বলে পরিচয় দিচ্ছি।(আমার নাম খোবায়েব। বাড়ী কাজাকিস্তান) বলসেবিকদের জুলুম অত্যাচারে প্রিয় জন্মভূমি , আত্নীয় স্বজন ছেড়ে ভেসে এসেছি।

ঃ অ------- তাহলে তুমি মুহাজির তাই না ?

ঃ হাঁ আমি ভাগুরা (মুহাজির)

ঃ তোমার দেশের কিছু অবস্থা আমাদের শোনাও। অতঃপর আমি আমার দেশের নির্যাতনের কাহিনী সামান্য শুনালে হুজুরগণ সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। তার পর অন্য একজন হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন, আনোয়ার পাশার পরে তোমার নামে নাম যে মুজাহিদের কথা পত্র-পত্রিকা ও রেডিওতে ইদানিং বেশী আলোচনা হচ্ছে, সে মুজাহিকে কি তুমি চেন ?

ঃ আনোয়ার পাশা (রহঃ) এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সহযোদ্ধদেরকে দেখেছি। তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছি। কাজাজিস্তান,উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান কিরগিজিয়া, সাইবেরিয়া, জার্মান,ইউক্রেন ও তেহরানসহ অনেক স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু এনামে কোন মুজাহিদ আছে কি না, তা আমার জানা নেই।

ঃ বাবা ! এবয়সে এতগুলো দেশ ভ্রমণ করেছ এবং মুজাহিদদের কথাও বলেছ, এতে মনে হয় তুমিও একজন মুজাহিদ। নাকি তুমিই সে খোবায়ে যার কথা সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে ?

ঃ হুজুর ! মানুষ আমাকে স্মরণ করবে এমন কোন ভাল কাজ করতে পারিনি। যদি বিজয়ের মাল্য ছিনিয়ে এনে দেশবাসীর কণ্ঠে পরিয়ে দিতে পারতাম, মসজিদ-মাদ্রাসা আর আলেম-উলামাদেরকে যদি রক্ষা করতে

পারতাম, অসহায় আর বঞ্চিতের অধিকার যদি আদায় করতে পারতাম,এতিম, বিধবা, বিকলাঙ্গদের চোখের পানি মুছে দিয়ে যদি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারতাম, প্রতিটি খুনের বদলা যদি খুনের মাধ্যমে নিতে পারতাম, তা হলে আমাকে আমি মুজাহিদ হিসাবে পরিচয় দিতে পারতাম। কাজেই যদিও সামান্য কিছু জিহাদের কাজ করার মত তাওফিক আল্লাহ দিয়েছিলেন, তবু মুজাহিদ বলে দাবী করতে ভয়ও হয় আর লজ্জাও পাই।

ঃ বাবা ! আর বলার অপেক্ষা রাখে না তুমিই সে জানবাজ মুজাহিদ খোবায়েব জাম্বুলী। বল বাবা, জিহাদের কিছু ঘটনা বল।

ঃ হুজুর ! এখন তো আপনারা খানা-পিনা করবেন। আবার ক্লাশও রয়েছে। অল্প সময়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমি তো আছি। যদি বলেন, তা হলে এশার নামাজের পর কিছু আলাপ করব। তা হলে ছাত্র-শিক্ষক সবাই শুনতে পারবেন। আমার প্রস্তাব শুনে মোহতামিম সাহেব বললেন" খুব সুন্দর কথা। রাত্রেই হবে। আপনারা ক্লাসে যান।

মোহতামিম সাহেবের কথায় সবাই ক্লাসে চলে গেলেন। এদিকে মাদ্রাসার রুমে রুমে গুঞ্জরিত হতে লাগল যে, মসজিদের ছেহেনে যে লোকটি থাকেন, তিনি একজন মুজাহিদ। এবং এটাও প্রচারিত হল যে, রাতে মসজিদে জিহাদের উপর বয়ান হবে। এসংবাদ পেয়ে অনাবাসিক ছাত্ররাও মাদ্রাসায় রয়ে গেল বয়ান শোনার জন্য।

এশার নামায সমাপণ করে মোহতামিম সাহেব সবাইকে বসার নির্দেশ দিলেন। আমি হুজুরের কানে-কানে আমার নাম ঘোষণা না করার জন্য জানিয়ে দিলাম। তিনি নাম ঘোষণা না করে আমাকে শ্রোতৃমন্ডলির নিকট এমনভাবে উপস্থাপন করলেন, যার দরুন সকলেই আমাকে নিজ নিজ শির উত্তোলন করে নতুন করে দেখতে লাগল। আমি মিম্বরে উপবেশন করে সকলের দিকে তাকিয়ে বললাম, আলোচনার প্রারম্ভে খায়ের ও বরকতের জন্য পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে নিলে সুন্দর হয়। তাই ছোটদের মধ্যে কে আছ এখানে এসে তিলাওয়াত করবে ? অমনি ৭/৮ বৎসরের একটি বালক এগিয়ে এসে সুরা ছফ তিলাওয়াত করে শোনাল। এটা সেই ছেলে, যার তিলাওয়াত শুনে আমি আমাকে হারিয়ে ফেলতাম। এটা আমার সেই কাঙ্খিত ছেলে, যাকে আমি মনে মনে অনেক তালাশ

করেছিলাম। যার সুমধুর তিলাওয়াতের মাদকতায় আমি বিভোর হয়ে থাকতাম এবং অন্য কোথাও যেতে পা উঠত না।

আমি ছেলেটির দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে ছিলাম চাতকের মত এবং মনে মনে ভাবছিলাম, এ কোন মানবীর নয়-নূরের পুতুল। না হয় বেহেস্ত থেকে পালিয়ে আসা গোলাম। তা না হয় কোন ভাগ্যবান রাজার রাজপুত্র। যেমন তার চেহারা সুরত, ঠিক তেমনি তার সুমধুর কণ্ঠস্বর। কোকিলরাও তার নিকট লজ্জা পাবে। সুরভিত কুসুমদলও তার চেহারার সামনে হার মানবে। ছেলেটি ইসলামী পোশাকে সুসজ্জিত। এতে আরো বেশী মানিয়েছে। ছেলেটির দর্শনে আমার কলিজায় বিরহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তার নূরানী চেহারায় রয়েছে আমার প্রাণপ্রিয়া অর্ধাঙ্গিনী মাহমুদার ছাপ। তার চেহারায় মাহমুদার চেহারায় খেলা করে। শিশু বাচ্চা। লাজুক লাজুক চাহনী। কিছু জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর পাই কি না পাই তা নিয়ে ভাবছি। তবু ইচ্ছা জাগল তিলাওয়াতের পরে তাকে কিছু প্রশ্ন করব। তিলাওয়াত শেষ হল। আমি ছেলেটির মাথায় আমার পাগড়িটি খুলে পরিয়ে দিলাম এবং ১০ হাজার টাকা বের করে নগদ পুরস্কার দিলাম। ছেলেটি আনন্দে আত্নহারা। আমার পুরস্কার দেখে সবাই বিস্মিত।

অতঃপর আমি নিরপেক্ষ একটি ভূমিকা টেনে জিহাদ কত প্রকার ও কি কি,তা বুঝিয়ে বললাম। তার পর আফগানের জনগণদের উপর জিহাদ করা কি, তাও জানিয়ে দিলাম। তার পর জিহাদের ফায়য়েল,শহীদের মর্যদা ও জান্নাতে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত রাস্তা জিহাদ তা সুন্দর করে বুঝিয়ে বললাম। তার পর আমার সবগুলো হামলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শোনালাম। উপস্থিত শ্রোতারা আমার বয়ানে অনেক কান্নাকাটি করলেন। তার পর দোয়ার মাধ্যমে সভা ভঙ্গ হল। তখন ঘড়িতে বাজছিল রাত ১টা। সে সময় খানা-পিনার জরুরত সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু ছেলেটির পরিচয় আর জানা হল না।

পর দিন ফজরের নামাযান্তে সূরা ইয়াসীনের খতম হল। তার পর দোয়া শেষে মোহতামিম সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন মাদ্রাসা দপ্তরে। পর পর ১৫/২০ জন উস্তাদও এসে বসলেন। তার পর বড় হুজুর আমাকে একটু কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনাতে বললেন। আমি সূরা

মুহাম্মদ পাঠ করে শোনালাম। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লেখাপড়া কতটুকু করেছি। আমি বললাম, হেফজ শেষ করে মিশকাত শরীফ জামাত পর্যন্ত কিছু দিন পড়ালেখা করেছিলাম। তার পর মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে শেষ পর্যন্ত পড়তে পারিনি।

হুজুর খুব বিনয়ের সাথে বললেন, "বাবা ! আমি তোমাকে পরামর্শ দেই। তুমি আমাদের এখানে থেকে যাও। হেফজখানায় পড়াও আর দু একটি ঘন্টা দেই । তুমি এখন মাজুর। কিভাবে জিহাদ করবে ? অতএব তালিমের কাজে লেগে যাও। এখান থেকে যদি দু-চার-দশজন ছেলেকে তৈরী করতে পার, তবে জিহাদের কাজটি জারি থাকবে। এখন চিন্তা করে দেখ কি করবে। আমি অনেক চিন্তা-ফিকির করে দেখলাম, হুজুরের কথা মানার মধ্যেই কামিয়াবী। তাই হুজুরকে বললাম, আপনার অনুগ্রহ হলে আমি এতে রাজি আছি। তখন তিনি আমাকে হেফজ বিভাগে নিয়ে সবাইকে বলে দিলেন "তিনি আমাদের নতুন উস্তাদ। তিনি তোমাদেরকে পড়াবেন। সমস্ত ছাত্র হুজুরের কথা শুনে খুব খুশী হলেন। আমাকে ছাড়া হেফজখানায় আরো তিনজন উস্তাদ আছেন, তাঁরাও খুব খুশী হলেন আমাকে পেয়ে ।

হেফজখানার প্রধান উস্তাদ আমাকে আমার আসনে বসিয়ে দিলেন। আমার নিকট সর্বপ্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ছেলেটিই সবক নিয়ে আসল। ছেলেটি দ্বিতীয় পারায় সবক শোনাচ্ছে। আমি তার সবক শুনে নাম জিজ্ঞাসা করলাম। সে উত্তরে বলল " আমার নাম মুহাম্মদ বিন খোবায়েব। আমি তার কথা শোনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার আব্বু কি করেন ?

ঃ বলতে পারি না তিনি কি করেন।

ঃ তিনি কি বাসায় থাকেন না ?

ঃ না, তিনি বেহেস্তে থাকেব। আম্মু বলেছেন " তোমার আব্বু জিহাদ করে শহীদ হয়ে বেহেস্তে চলে গেছেন। তিনি আর আসবেন না।

ঃ তুমি কি বলছ তা ঠিক বুঝতে পারছি না, তোমার আব্বু কি সৌদি আরব অর্থাৎ মক্কা মদীনায় থাকেন ?

ঃ না তিনি বেহেস্তে তাকেন, ---অ----নে----ক ----দূরে।

ঃ তোমরা ভাই-বোন কজন ?

ঃ আমরা ভাই-বোন একজন। আর কেউ নেই।

ঃ তোমার আম্মুর নাম কি তা বলতে পার ?

ঃ আমার আম্মুর নাম হেলেনা।

ঃ তোমার আম্মুরা কজন ?

ঃ আম্মু তো একজনই থাকে । আম্মা কি দু জন থাকে ? ছেলেটির কথা শুনে অনেক চিন্তা করতে লাগলাম। নাম মুহাম্মদ বিন খোবায়েব আবার চেহারায় রয়েছে মাহমুদার ছাপ, পিতা শহিদ হয়ে বেহেস্তে গিয়েছে, এসব কথায় তো আমার সন্তান বুঝায়। অন্য দিকের জটিলতা হল, মায়ের নাম নিয়ে। সে বলছে মা একজন,নাম হেলেনা, আর কোন মা নেই। এ কথায় তো অনেক দূরত্বের সৃষ্টি হয়ে গেল। ছোট বাচ্চা ! অনেক কথারই উত্তর দিতে পারে না সে। মায়ের নাম যদি হেলেনা না বলে মাহমুদা বলত, তা হলে চেহারায়ও মিলে যত। তা হলে আমি তাকে পুত্র হিসাবে দাবি করতে পারতাম। এখন তো তা আর সম্ভব নয়।

ছেলেটি অনাবসিক। প্রতিদিন বাসা থেকে আসে। গত রাতের বয়ান শোনার জন্য সে বাসায় যায়নি। মাদ্রাসা ছুটি হলে সে বাসায় চলে গেল। ইয়া বড় পাগড়ী মাথায় দেখে তার মা হেলেনা ভাবছে, অন্যের পাগড়ী হয়ত ভুলে নিয়ে গেছে। তা সে ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে বললো "অন্যের জিনিস দেখে লোভ করতে নেই। এটা বড়ই জঘন্য কথা। মুহাম্মদ মায়ের কথা বুঝতে পেরে বলল, "আম্মু ! আমার মাথার পাগড়ী নতুন হুজুর দিয়েছেন। শুধু তাই নয় দশ হাজার টাকাও পুরস্কার দিয়েছেন।

ঃ নতুন হুজুর আবার কে ?

ঃ জান না বুঝি ? গত কাল না তোমার নিকট বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম যে, আমরা রাতে আসব না, মসজিদে জিহাদের বয়ান হবে তা শুনব। সে আরো বলল "আম্মু ! আম্মু !! নতুন হুজুর খুব ভাল মানুষ। আমাকে খুব আদর করেন । কোরআন তিলাওয়াত শুনে উনার মাথায় পাগড়ী খুলে আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন এবং দশ হাজার টাকাও দিয়েছেন।

ঃ তোমার হুজুর তোমাকে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন ?

ঃ হাঁ, অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন।

ঃ তুমি সব বলতে পেরেছ ?

ঃ অবশ্যই । আম্মু ! আম্মু ! জান নতুন হুজুর আমাকে কি জিজ্ঞাসা করেছেন ? তিনি জিজ্ঞাসা করছেন আমার আম্মু কয় জন ।

ঃ তুমি কি উত্তর দিলে ?

ঃ আমি বলেছি আম্মু তো একজনই থাকে, তাই আমারও একজন ।

ঃ তোর হুজুর কি বিয়ে করেছে ?

ঃ তা আমি বলব কি করে ?

ঃ জিজ্ঞাসা করলেই তো বলবে ।

ঃ ছিঃ অমন কথা কি হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা যায় ?

ঃ বাসায় দাওয়াত দিলি না ?

ঃ একদিন হয় মাত্র আসবেন, দাওয়াত দেব কি করে ?

ঃ আচ্ছা, হুজুরের সময়মত একদিন বাসায় নিয়ে এসো

ঃ ঠিক আছে ।

মুহাম্মদ পর দিন কারুকার্যখচিত নতুন কাবলী সেট পরে মাদ্রাসায় আসল । আমি মনে মনে খুব খুশী হচ্ছিলাম এই ভেবে যে হয়ত পুরস্কারের টাকা থেকে তা কিনেছে । কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখি তা ঠিক নয় । আমি কাপড়ের

কথা জিজ্ঞাসা করলে মুহাম্মদ বলল, আমার এসুন্দর কাপড় ভাইয়া কিনে দিয়েছেন । আমি জিজ্ঞাসা করলাম–

ঃ একি ! তুমি না বলছো ভাই–বোন নেই, তাহলে সে আসল কোত্থেকে ।

ঃ এটা তো বড় ভাইয়া !

ঃ তুমি বলছ ভাই-বোন নেই, তাহলে বড় ভাই আসল কেমনে ?

ঃ অ ----সে কথা ? যিনি জামা দিয়েছেন, তিনি হল আমার ভাইয়া, তিনি একদম বুড়া । কাপড়ের ব্যবসা করেন তিনি । মুখভরা সাদা দাড়ি । আমার সাথে তিনি কুটুস ফুটুস কথা বলেন । আমাদের মহল্লায়ই তার বাসা । আমি তাকে বড় ভাইয়া বলে ডাকি । তিনি আমাকে অনেক কিছু খাওয়ান । তার পর মুহাম্মদ খুব অনুনয়–বিনয় করে আমাকে রাতের দাওয়াত দিল এবং বলল, ভাইয়াকেও আম্মা দাওয়াত দিবেন । আমি বললাম মুহাম্মদ আমিতো তোমাদের বাসা চিনি না, কিভাবে যাব ? সে বলল, আমি মাগরিব এসে আপনার সাথে পড়ব । তার পর নিয়ে যাব । আমি তার কথা শুনে ধন্যবাদ জানালাম । মুহাম্মদ বাড়ী চলে গেল ।

চব্বিশ

এক দিন ফজরের নামাজ সমাপণ করে নগ্নপায়ে শিশিরনাওয়া দুর্বা ঘাসের উপর দিয়ে পায়চারী করছিলাম । (ছাত্রজীবনে উস্তাদের মুখে শুনছিলাম, শিশিরভেজা ঘাসের উপর দিয়ে ভোর বেলায় নগ্নপায়ে হাটলে ব্রেইন ভাল থাকে)। তাই আমি প্রায় সময়ই এমনটি করে থাকতাম । আমি যখন আনমনে পায়চারী করছিলাম, তখনো কুহেলিকায় অন্তরীক্ষ ছিল আঁধারাচ্ছন্ন । শিশু রবির আগমন তখনো ঘটেনি । এমন সময় মাদ্রাসার নাজিম সাহেব সফেদা বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে হস্ত উত্তোলনপূর্বক ডাকলেন নতুন হুজুর ! এদিকে আসুন । প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি । দ্বিতীয়বার ডাকার পর নাজিম সাহেব আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন । আমার ডান হাত যে প্লাষ্টিকের লাগানো, তা সহজে কেউ ধরতে পারে না । তিনিও প্রথমে লক্ষ্য করেননি । তিনি এক পর্যায়ে বলে উঠলেন," ইস রে বরফের মত ঠান্ডা হাত । এত ঠান্ডা কেন ? উত্তরে বললাম,রক্ত কম,তাই ।

ঃ একে তো মুজাহিদ, আবার যুবক । এত ঠান্ডা হওয়ার কথা না ।

ঃ হুজুর ! ভাগ্য যদি খারাপ থাকে, তবে মুজাহিদ আর যুবকে কি হবে ? ঠান্ডা তো কাউকে খাতির করে না ।

ঃ আচ্ছা আমি এখনই গরম করে দিচ্ছি ।

এতটুকু বলে তিনি একটু জোরে জোরে করমর্দন করতে লাগলেন । এর মধ্যে হাতটি খসে উনার হাতে এসে গেল । তিনি এক চিৎকার দিয়ে সংজ্ঞা হারানোর উপক্রম । আমি বললাম, হুজুর ! হাত গেছে আমার , কাঁদলে আমি কাঁদব, আপনি কাঁদেন কোন যুক্তিতে ? অপরাধ ঢাকার ফন্দি করছেন, তাই না ?

ঃ আরে হুজুর ! কি হল, ঘটনা কি ? আমি বেচারার হাত থেকে আমার প্লাষ্টিকের হাতটি এনে সামনে ধরে বললাম, হুজুর ! এটা হাকিকি হাত নয়। এটা জার্মান থেকে লাগিয়ে এনেছি।

ঃ আপনার হাত কি জন্ম থেকেই নাই, ?

ঃ আল্লাহ হাত দিয়েছিলেন ঠিক, কিন্তু বলসেবিকরা তা কেড়ে নিয়েছে অর্থাৎ শহীদ করে দিয়েছে। তার পর পূর্ণ ঘটনা খুলে বললে তিনি খুব রোদন করলেন।

এর মধ্যে আমরা এক কিলোমিটার পথ কখন যে অতিক্রম করেছি, তা আমরা কেউই টের পাইনি। আদিত্য বিলাচ্ছে কাঁচা কাঁচা রোদ ধরণি বক্ষে। শীতলতার আমেজ অনেকটা দূরীভূত হয়ে আসছে। তিনি বিধূতকণ্ঠে আমার সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন " আহাঃ আপনার দুঃখ কষ্টের তো কোন সীমা নেই। হাত যে মানুষের কত বড় বন্ধু, তা বলে শেষ করার মত না। আপাদমস্তক অর্থাৎ সর্বাঙ্গকে হেফাজত করতে হাতই কাজে আসে বেশী। যেমন, যদি কেউ মস্তকে ওলোয়ারের আঘাত হানে, তা হলে হাত রিক্ত অবস্থায় প্রতিহত করতে চায়। আমরা যখন ছাত্রকে বেত্রাঘাত করি, তখন হাত দিয়ে তা ফিরানোর চেষ্টা করে যদিও হাতে ব্যথা পায়। শরীরের প্রধান হেফাজতকারী ও খেদমতগার একমাত্র হাত, আহাঃ আপনার পোশাক কে পরিয়ে দিবে ? গোসল কে করিয়ে দিবে ? জামা–কাপড় কে ধুয়ে দেবে ? এমন কি এক গ্লাস পানি পর্যন্ত নিজের ইচ্ছায় পান করার ক্ষমতা নেই। তিনি এধরনের সমবেদনা প্রকাশ করে বলেন –

হুজুর ! আপনার মত মহান ব্যক্তিকে আমাদের মাঝে পেয়ে ছাত্র-শিক্ষক ও এলাকাবাসী সবাই গর্বিত ও আনন্দিত। আল্লাহ পাক যত দিন হায়াত রাখেন, ততদিন আমাদের মাঝেই থাকবেন, যা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যরা করতে পারে না। সব খেদমত আপনার দরকার, যিনি আপনার সব ধরনের খেদমত করতে পারেন। এহিসাবে এইমাত্র আমার অন্তরে একটি কথা উদয় হয়েছে। এটা যদি করা যায়, তবে আপনার জন্য অনেক এহসান হবে। যদি কিছু মনে না করেন, তবে বলতে পারি।

ঃ আপনি যা বলতে চান, তা নির্ভয়ে মন খুলে বলতে পারেন। অতঃপর তিনি বললেন-

হুজুর ! আমার সন্ধানে এমন একজন পরমা সুন্দরী যুবতী আছেন, যিনি দ্বীনদার , খোদাভীরু ও পর্দানশীন। ছাবেরা (ছবরকারিনী) জামিলা (অপূর্ব সুন্দরী) শাকেরা (শুকরকারিনী) আবেদা (এবাদত কারিনী) তাছাড়া সুভাষিনীও বীরাঙ্গনা, , যার কোন তুলনা হয় না। উক্ত সুন্দরীকে যদি বিয়ে করেন, তবে উভয় জগতে সুখী হবেন বলে আশা রাখি।

তারপর তিনি আরো বললেন মেয়েটি বিবাহিতা। এক ছেলের মা। তার স্বামী হয়ত কোন যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন, না হয় স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মেয়েটি আমার পার্শ্বের বাসা খরীদ করে এখানেই থাকছেন। মেয়েটি আমার স্ত্রীর নিয়মিত ছাত্রী। আমার আহলিয়ার নিকট মাসআলা-মাসায়েলের কিতাবাদী অধ্যয়ন করছে। আহলিয়ার কাছ থেকে শোনলাম মেয়েটি খুবই বুদ্ধিমতি। উক্ত মহিলার ছেলেটি আপনারই ছাত্র। আমি চমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ছাত্রীর মা হন তিনি। উত্তরে বললেন, মুহাম্মদের।

হুজুরের কথা শোনার সাথে সাথে আমার সর্বাঙ্গে তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল। এমন একজন ছেলের মায়ের প্রস্তাব পেশ করলেন, যে ছেলেটি তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমার হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে বসে আছে। যে আমার অন্তর কেড়ে নিয়ে গেছে। যে আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে নিয়ে গেছে। এক দিকে উক্ত প্রস্তাবে আনন্দেরা ঢেউ খেলছিল, অপর দিকে দুঃখ আর পেরেশানিকে বুক ভরে গেল। এদিকে হুজুর আমার অভিপ্রায় জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। কিছু না বলাতে প্রশ্নই করে বসলেন।

আমি তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে বললাম, হুজুর ! আপনি যে প্রস্তাব পেশ করেছেন, তা অত্যন্ত মুবারক প্রস্তাব। তবে এখানে কথা হল,মহিলার স্বামী শহীদ হয়েছে, না সাধারণ মৃত্যু হয়েছে না কি এখনো জীবিত আছেন, তার কোন সঠিক প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় বিয়ে করা জায়েজ নয়। আর যদি এমন প্রমাণও থাকে, তবু আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। কারণ, আমার এ বয়সে আমি চারজন মেয়েকে বিয়ে করেছি। আমার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে করতে হয়েছে। এচারজন মেয়ের মধ্যে দুজনই আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণ করেছেন আর বাকি দুজন রয়েছেন নিখোঁজ। আমার জীবনে আর কোন নারীকে বিয়ে না করার প্রত্যয় নিয়ে বসে আছি। বিবাহ করে প্রত্যহ ঝামেলা বাড়াব না। তাদের

বিরহ যাতনা এখনো হৃদয় থেকে সরাতে পারিনি। এখনো ক্ষণে-ক্ষণে মুদিত লোচন থেকে রুধিরাক্ত অশ্রু ঝরে। শোকোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দূরে-বহু দূরে। কাজেই আর কোন মহিয়সীকে এনে ব্যথা দিতে চাই না আর আমিও ব্যথা পেতে রজি নই। তবে আমি মনে মনে ঠিক করেছি যে, যত দিন বেঁচে আছি ততদিন এতিম মুহাম্মদকে আদর-সোহাগ আর ভালবাসা দিয়ে পালাপুষি করব। নিজ সন্তানের মত লালন পারন করব। এমনকি একজন বিধবা বোন হিসাবে অন্য মুসলমানের নিকট যা পাওনা, আমি তা আদায় করার চেষ্টা করব। আমি আমার সাধ্যানুসারে এতিম আর বিধবার খেদমত করে যাব। আপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে মুহাম্মদ এবং তার মাকে বলে দিতে পারেন।

হুজুর আমার কথা ও চিন্তা-চেতনার কথা জানতে পেরে সামান্য সময় মৌনতা প্রদশর্ন করে বললেন, মাওলানা! আপনার নেক নিয়ত মুবারক হোক। তবে এখানে একটি বিষয় আপনাকে অবশ্যই নজরে রাখতে হবে, তা হল আপনি একজন স্বনামধন্য আলেম। সকল মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য বিশেষ করে আলেমদেরকে তুহমত থেকে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ মানুষ খারাপ ধারণা করতে পারে, এমন স্থানে না যাওয়া, এমন স্থানে না বসা, এমন কাজ না করা, এমন কথা না বলা ইত্যাদি। আপনি যখন একজন এতিমকে পালন করবেন এবং একজন সুন্দরী বিধবা যুবতী মেয়েকে কামিজ-সেলোয়ার-উড়না-পাদুকা দিতে থাকবেন, তখন মানুষের মুখে মুখেউঠে যাবে বদনামের ঢেউ। হাকিকত তালাশ না করে খারাপ মন্তব্য করতে থাকবে। এতে আলেমদেরও বদনাম হবে আর দ্বীনেরও চরম ক্ষতি হবে।

হুজুরের কথা শুনে আমি বললাম,আপনার কথা সত্যিই মহামূল্যবান। তবে আমি তো নিজে যাব না, দেখা-সাক্ষাত করব না, আলাপ-আলোচনা হবে না। যেহেতু আপনার বাসার সাথে বাসা এবং আপনার স্ত্রীর ছাত্রী, সেহেতু আপনার কাছে টাকা-পয়সা দিয়ে দেব, আপনি আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে তা পৌছাবেন।

ঃ, ভাল কথা! আমাকে বিপদে ফেলানোর যুক্তি।

ঃ আপনি বিপদে পড়বেন কেন?

ঃ আমি যদি এসব আমার স্ত্রীর মাধ্যমে পৌছাই, তা হলে সে বলবে,"বুঝছি গো বুঝছি। সে মহিলার সাথে পেটে-পেটে খাতির! যাও

তার বাসায় চলে যাও। এভাবে ঝগড়াটা ভালই জমে উঠবে। আর যদি আপনার কথা বলি, তা হলেও বড় ধরনের দুটি অসুবিধা আছে। একমানুষ তা জানতে পেরে সন্দেহ করবে এবং খারাপ মন্তব্য করবে। দুই মেয়েটি যখন আপনার উদারতা, বদান্যতা, দানশীলতা, পরদুঃখে কাতরতা ও সহমর্মিতার কথা জানতে পারবে, তখনই আপনার আশেক হয়ে যাবে। যে কোন প্রকারেই হোক সে আপনার সাথে কথা বলতে বা দেখা করতে চাইবে। এ থেকে বাঁচতে পারবেন না।

ঃ হুজুর! কি বলেন! আমি নিজে যদি না যাই এবং ওর ডাকে সাড়া না দেই, তা হলে কে কি বলবে?

ঃ আপনি না গিয়ে পারবেন, কিন্তু সে আসলে তাকে তো বাধা দিতে পারবেন না।

ঃ কেন পারব না? আমি কথাই বলব না।

ঃ সে যখন বোরকা পরে ছাত্র গার্জিয়ান সেজে আসবে, তখন কিছু জিজ্ঞাসা করলে তো কিছু না বলে পারবেন না। একবার চিনে যদি কথা না বলেন, তা হলে অন্য দিন অন্য সাজে আসবে। তখন তো চেনার কোন উপায় থাকবে না। কখনো মাদ্রাসায় আবার কখনো পথে-ঘাটে দেখা সাক্ষাত হয়ে যাবে। আর এর সামান্য নমুনা যদি কোন একটি মহিলা দেখতে পারে, তা হলে প্রচারের জন্য বেতার ভবনের প্রয়োজন নেই, ওরাই যথেষ্ট। কাজেই আমার প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার জন্য চিন্তা করুন।

ঃ তা হলে আজ যাওয়াও তো ঠিক হবে না।

ঃ কোথায় যেতে চাচ্ছিলেন?

ঃ মুহাম্মদ দাওয়াত দিয়েছিল আজ রাত্রের।

ঃ অ ---তা হলে লাইন ধরছে। বুঝলাম।

ঃ হুজুর! আজ প্রায় ৮/৯ বৎসর যাবৎ শুধু রণাঙ্গনেই কাটিয়েছি। সামাজিকতা তেমন কিছু বুঝি না। এমনই যদি হয়, তাহলে মুহাম্মদকে বলে দেব যে তোদের বাসায় যাব না। তোর আম্মাকে গিয়ে না করে দিবে।

ঃ দাওয়াত রেখে প্রত্যাখ্যান করবেন কোন যুক্তিতে? যেহেতু দাওয়াত রেখেই ফেলেছেন, সে হিসাবে যেতেই হয়। মানা করে দেয়া ঠিক হবে না।

ঃ তা হলে আপনাকে ছাড়া যাব না।

ঃ আমাকে তো দাওয়াত দেয়নি। আমি যাব কেন ? তবে আমার সাথে অবশ্যই সাক্ষাত হবে । কারণ, আমাদের বাসা পাশাপাশি। সে হিসাবে দেখা হবে। অগত্যা যেতে রাজি হয়ে গেলাম। এসব আলাপ- আলোচনার পর আমরা আবার মাদ্রাসায় ফিরে এলাম। লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে কেটে গেল সারা দিন। বিদায় লগনে মুহাম্মদ বলে গেল, হুজুর ! সন্ধ্যার সময় আমি আপনাকে নিতে আসব, আপনি তৈরী থাকবেন । আমি জিজ্ঞাস করলাম, আরো কাউকে দাওয়াত দিয়েছ ? উত্তরে সে বলল, নাজিম সাহেব হুজুর এবং ভাইয়্যাকে বলেছি। তার কথা শুনে আমি খুব খুশী হলাম এবং তাকে বলে দিলাম যে , তোমাকে আসতে হবে না। নাজিম সাহেবকে নিয়ে আমিই চলে যাব। মুহাম্মদ বাড়ী চলে গেল।

মাগরিবের নামাজ আদায় করে নাজিম সাহেব নিজেই বললেন " হুজুর "! মুহাম্মদ আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন, চলুন যাই। আমি বললাম, হুজুর ! মুহাম্মদ তো এতিম, তার এখানে খাওয়া ঠিক হবে না। চলুন আমরা কিছু হাটবাজার করে নেই। হুজুর বললেন, ছেলের সম্পদ আমরা নষ্ট করব কেন ? মহিলার তো সম্পদ আছে। তার পরও খানা-পিনার পর ফিরে আসার সময় কিছু হাদিয়া দিয়ে আসব। তবেই হবে।

আমরা রওয়ানা হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নাজেম সাহেবের বাড়ীতে এসে পৌছলাম। এলাকাটি আমার নিকট খুবই ভাল লাগছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী খুবই মনোরম। জোসনার আলোতে ঘুরে-ফিরে দেখছি। নেই শহরের কোলাহল, নেই শোরগোল। শান্ত পরিবেশ। হুজুর অঙ্গুলী নিদের্শে দেখালেন যে, ঐটাই মুহাম্দদের বাড়ি। মুহাম্মদের বাড়ীর আঙ্গিনা বেশ প্রশস্ত। ফলমুল ও ফুল বাগান শোভা পাচ্ছে বাড়ীর দক্ষিণে। বাড়ীটি একতলাবিশিষ্ট পাকা। হুজুর মুহাম্মদকে ডাক দিলে দৌড়িয়ে এসে গেইট খুলে আমাদেরকে নিয়ে গেল মেহমানখানায়। আমরা ঘরে ঢোকার সাথে-সাথে এক ব্যক্তি সালাম দিলে চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারেছ মিকাইলী (আমার শ্বশুর অর্থাৎ মাহমুদার আব্বা)। আমাদের চার চোখের মিলন হয়ে গেল। একে অপরের দিকে বিস্ফারিত নয়নে মূকের মত তাকিয়ে রইলাম। কেউ কাউকে চিনতে অসুবিধা হয়নি।

আমি বিনীত কণ্ঠে আরজ করলাম," আব্বাজান ! এখানে আপনার আগমন কিভাবে হল ? তিনি বললেন " বাবা ! তোমাদেরকে মিকাইলী থেকে বিদায় দিয়ে আমিও সাথে সাথে কাবুলে চলে আসার জন্য খুব

ফিকির করছিলাম। কারণ, আমার একমাত্র কন্যা মাহমুদাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত অবস্থায় দিন যাপন করছিলাম,তোমার শ্বাশুরী অনেকবারই হার্টফেল করেছিল। আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও জায়গাজমি গোছাতে সময় লেগে গেল প্রায় ৬ মাস। সব কিছু নামে মাত্র মুল্যে বিক্রি করে অতি গোপনে কাবুলে চলে আসি। ছওদাকে যার কাছে বিয়ে দেয়া হয়েছে, সেও ডাক্তার। ওরাও থাকত কাবুলে । ডাক্তার রাগেব মিকচিও কাবুল হাসপাতালেই চাকরী পেয়েছিলেন। কয়েক বৎসর কাবুলে থাকার পর ব্যবসায় তেমন সুবিধা করতে না পেরে পাকতিয়ায় চলে আসি। এখানে জায়গাজমি খরিদ করে বাড়ী-ঘর তৈরী করেছি। উমারাও পাকতিয়ায় বাড়ী করেছেন। এখানে এসে আমিও ভাল সুবিধা করেছি।

কাবুলে এসে কয়েক মাস পযর্ন্ত তোমাদেরকে খোঁজাখুঁজি করেছি। শেষ পর্যন্ত না পেয়ে ধৈর্য ধারণ করেছি। তোমার শ্বাশুরী মাহমুদার চিন্তায় একেবারে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। আমরা ধারণা করেছি ,তোমরা শহীদ হয়ে গিয়েছ। বল বাবা তোমার ইতিহাস, বল মাহমুদাকে কোথায় রেখে এসেছ। জলদি করে বল। আমাকে শান্ত্বনা দাও।

শ্বশুরের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমার কণ্ঠ চিরে কান্না বেরিয়ে এল। আমি আত্ন সংবরণ করতে ব্যর্থ হলাম। শ্বশুর এবং হুজুরের চোখ বেয়েও পানির ধারা প্রবাহিত হলে লাগল। আমি অতি কষ্টে কান্না থামিয়ে আঁখিযুগলের পানি মুছে বললাম " হুজুর ! মাহমুদাকে নিয়ে অতি কষ্টে শরণার্থী শিবিরে এসে হাজির হয়ে কিছু দিন কাটিয়ে কাবুলে এসে মাহমুদার জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করি। শরণার্থী শিবিরে অনেক গোয়েন্দা আসছিল। অনেক গোয়েন্দাকে ধরে হত্যাও করেছিলাম। মাহমুদার অনুরোধে একজন খৃষ্টান মেয়েকে মুসলমান করে বিয়ে করেছিলাম। উক্ত মহিলাও ছিল উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা নাম তার হেলেনা। মাহমুদার সাথে হেলেনার ছিল গলায় গলায় মিল। দুজনেই জিহাদ করে শহীদ হওয়ার জন্য ছিল উদগ্রীব। আমি তাদেরকে বাসায় রেখে কাবুলের জামে মসজিদে কিভাবে গেলাম ও গ্রেপ্তার হলাম, তারপর কিভাবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলাম। সাইবেরীয়ার নির্বাসনসহ সমস্ত ঘটনা শোনালাম। তার পর মুক্তি আবার কাবুল পর্যন্ত কিভাবে এলাম এসব মর্মান্তিক ঘটনা শোনালাম কিন্তু মাহমুদা আর হেলেনার কথা বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠ সংকুচিত হয়ে

আসল। অনেক কষ্টে বিধৃত কণ্ঠে বললাম, আব্বাজান ! আমি অনেক কষ্টে বহুদিন পর মুক্তি পেয়ে কাবুলে এসে দেখি আমার বাড়ীর উপর দিয়ে মহাসড়ক চলে গেছে। বাড়ীর কোন পাত্তাই পেলাম না। কেউ বলতেও পারেনি তাদের কথা। আমি পাগলের মত কয়েকটি মাস তালাশ করে কাবুল ত্যাগ করে পাকতিয়ায় চলে এসেছি। এখানে অনেক দিন ঘুরাফেরা করে মাদ্রাসার খেদমতে নিয়োজিত হয়েছি। ভাবলাম, আমি তো এখন মাজুর। আমার ডান হাতটি বলসেবিকরা কেটে ফেলেছে। রণাঙ্গনে যাওয়ার মত কোন সাথীও নেই। তাই মাদ্রাসার শিক্ষার সাথে সাথে যদি ছাত্রদেরকে জিহাদী হিসাবে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে জিহাদের কাজ জারি থাকবে। এ আশা নিয়েই তালিমের কাজে অংশ গ্রহণ করেছি। বর্তমানে ইজ্জতের সাথেই তালিমের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

এসব আলোচনার মধ্যে মুহাম্মদ এসে আমাকে বলল " হুজুর! আম্মু আপনাকে আমার সাথে বাড়ীর ভিতরে যেতে বলেছেন। তার কথা শুনে মনে মনে ভাবলাম, হায় ! এ আবার কোন ফেতনায় পড়ে গেলাম। দুজন মানুষকে এখানে বসিয়ে রেখে আমি আন্দর মহলে গিয়ে একজন গায়রে মাহরাম মহিলার সাথে আলাপ করব, এটা আবার কেমন কথা ? তাই আমি মুহাম্মদকে আদর করে বললাম,"বাবা ! তোমার আম্মুকে গিয়ে বুঝিয়ে বল, আমি বাড়ীর ভিতর যেতে পারব না। শরীয়ত এমনটির এজাজত দেয়নি। মুহাম্মদ বার্তা নিয়ে আন্দর বাড়ীতে চলে গেল।

অতঃপর শ্বশুর বললেন," মুহাম্মদ খুব চালাক ছেলে। রাস্তায় আসা-যাওয়ার পথে আমাকে ছালাম দিত। তার চেহারার সাথে আমার মাহমুদার চেহারার অনেকটা মিল রয়েছে। তাই তাকে খুব আদর করি আমি। সে আমাকে ভাইয়্যা বলে ডাকে। ছেলেটির ভাষা খুবই সুন্দর। তিলাওয়াত খুবই শ্রুতিমধুর। একজন উস্তাদের মাধ্যমে আমি তাকে লেখাপড়ার খরচ দেই। দু-এক দিন না দেখলে থাকতে পারি না। আমি বললাম, আব্বা ! ঠিকই বলেছেন। তার কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্যই আমি এখানে রয়ে গেলাম। তার উসিলায়ই আমার এখানে চাকরি হয়েছে। এসব আলাপের মধ্যে মুহাম্মদ ফিরে এসে বলল-

"হুজুর ! আম্মু আপনাকে যেতে বলছেন। আম্মু বলছেন গোনাহ হবে না। আপনাকে যেতেই হবে। না নিলে তিনি আমাকে মারবেন। চলুন। এবলে আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। এবারও আমি পূর্বের

কথা বলে ফিরিয়ে দিলাম। একটু পরে মুহাম্মদ একটি আংটি এনে বলল,এ আংটিখানা আম্মু দিয়েছেন। দেখেন তো চিনেন কি না ? আংটিখানা হাতে নিয়ে দেখি এটা মাহমুদার আংটি। হারেছ মিকাইলীও আংটিখানা দেখে চিনে ফেললেন। আমরা উভয়েই ভাবছিলাম মাহমুদাই এসংবাদ পাঠিয়েছে।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মুহাম্মদকে,কোলে তুলে নিয়ে অন্দর বাটিতে প্রবেশ করলাম। শ্বশুরজীও গেলেন আমার সাথে। এমন সময় হেলেনা বেরিয়ে এসে আমাকে সালাম করে উন্মাদিনীর মত জড়িয়ে ধরল। ভাবাবেগে সবাই কাঁদছিলাম। তার পর রুমে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, হেলেনা ! তোমার প্রাণপ্রিয় বান্ধবী (মাহমুদা)কোথায় ? দেখছি না যে ?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হেলেনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তার পর কান্না সংবরণ করে বলল, "স্বামী গো ! আপনি আমাদেরকে রেখে চলে যাওয়ার পর আপনাকে অনেক তালাশ করেছি, কিন্তু পাইনি। বহুদিন পর্যন্ত আমরা আপনার আগমনের পথপানে চেয়ে থাকিব। আপনি বিদায় লগনে বলেছিলেন, জায়গা দেখতে যাচ্ছেন। পছন্দমত জায়গা পেলে আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবেন। সে আশায় বুক বেঁধে অনেকদিন কাটিয়েছিলাম। আপনি যাওয়ার সময় তো মাহমুদা আপুকে অন্তঃসত্তা রেখে গিয়েছিলেন তা আপনি জানেন। সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল, আপুর অবস্থা ততই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। আপনার বিরহ যাতনায় খানাপিনা পর্যন্ত করতে পারেননি। শরীর কাষ্ঠের ন্যায় শুকিয়ে গিয়েছিল। সন্তান প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলে তাঁকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে তিনি চাঁদের মত ফুটফুটে এক সন্তান প্রসব করেন। ছেলে পেয়ে তিনি অনেকটা সুস্থ্য হয়ে উঠেন। তার পর তাঁকে বাসায় নিয়ে আসি। ছেলের নাম রাখি মুহাম্মদ।

তিনি বাসায় এসে মুহাম্মদের নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে বিলাপ করে বলতেন, হায়রে ভাগ্য ! আজ যদি খোবায়েব পাশে থাকত আর তার কোলে নবজাতককে তুলে দিতে পারতাম। এসব কথা বলে খুব রোদন করতেন। একদিন মুহাম্মদকে আপুর কোলে দিয়ে নামাজ পড়তে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, মুহাম্মদ হাতপা নেড়ে খেলা করছে। কিন্তু আপু আর দুনিয়াতে নেই। প্রসবের বিশ দিন পর তিনি পরলোকগমন করেন। তার পর পাশের বাসার মহিলাদের খবর দিয়ে নিজ হাতে গোসল করিয়ে,কাফন

পরিয়ে মহল্লাবাসীদের হাতে বুঝিয়ে দিলাম। তাঁরা তাকে কাবুলের সরকারী গোরস্তানে দাফন কর দিয়েছে।

তার পর মুহাম্মদকে আমার বুকে তুলে নিলাম। কিছু দিন পর বাড়ী ঘর একোয়ার হয়ে গেল রাস্তার কারণে তার পর টাকাপয়সা নিয়ে মুহাম্মদকে নিয়ে এখানে চলে আসি। তার লেখা-পড়ার জন্যই পাকতিয়াকে বেছে নিয়েছি। এপর্যন্ত মুহাম্মদকে বুঝতে দেইনি তার মা কে।

হেলেনার কথা শুনে আমরা খুব রোদন করলাম। মুহাম্মদ তখনো আমার কোলে বসে চোখের পানি মুছে দিচ্ছিল।

অতঃপর হেলেনা মুহাম্মদকে পরিচয় করিয়ে দিল যে, "তুমি যারকোলে বসে আছ, ইনিই তোমার আব্বু। মুজাহিদ কমান্ডার হাফেজ মাওলানা খোবায়েব জাম্বুলী। আর তুমি যাকে ভাইয়্যা বলে ডাকো,তিনি হলেন তোমার পরম শ্রদ্ধেয় নানাজান হারেছ মিকাইলী।

–ঃ আঁধার রাতের বন্দিনী সমাপ্ত ঃ-

এ যে এক করুণ কাহীনি, আমি আমার জীবনকে এভাবে ঢেলে সাজাবো ইনশাআল্লাহ

ঐতিহাসিক উপন্যাস আঁধার রাতের বন্দিনীর

পাঠক-পাঠিকাদের অভিমত

==========ঃঃ==========